প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান

ব্যবহারিক বিজ্ঞান

উৎপত্তি ও বিকাশ

Academia Publishing House Ltd.

CamScanner

চুনতি ডেপুটি বাড়ির কৃতি সন্তান
আল্লামা প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান-
এর রচিত অসাধারণ গ্রন্থ "ব্যবহারিক বিজ্ঞান
উৎপত্তি ও বিকাশ" সংগ্রহে

ব্যবহারিক বিজ্ঞান

উৎপত্তি ও বিকাশ

(Origin and Development of Experimental Science)

মূল

প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান

রিভিউ

প্রফেসর ড. এম শমশের আলী

সম্পাদনা

মেহেদী হাসান

Academia Publishing House Ltd.

CamScanner

Academia Publishing House Ltd.

ব্যবহারিক বিজ্ঞান: উৎপত্তি ও বিকাশ
প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান

গ্রন্থস্বত্ব © এপিএল ২০২১
ISBN 978-984-35-0770-9

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল), কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
২৫৩/২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল: চৈত্র ১৪২৭, শাবান ১৪৪২, এপ্রিল ২০২১

মূল্য: টাকা ২৫০.০০

Published by Academia Publishing House Limited (APL)
Concord Emporium Shopping Complex
253/254, Elephant Road, Kataban, Dhaka- 1205, Bangladesh

Contacts
Cell: +88 02 0183 296 9 280, +88 02 01766 073 321
E-mail: aplbooks2017@gmail.com

CS CamScanner

সূচিপত্র

প্রাক্কথন vii

প্রথম অধ্যায়

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ১১

বিজ্ঞানের বিচার বিবেচনা ১৩

ল্যাটিন শব্দ সায়েন্টিয়া (scientia) মূলের সমীক্ষা ১৭

একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ১৯

যুক্তশব্দ: এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স ২১

বাংলা বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ২৪

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-উলুম আত্-তাজরিবিয়ার পারিভাষিক বিশ্লেষণ ২৯

প্রথম যুগের মুসলমানদের জ্ঞান অন্বেষণের অনুপ্রেরণা ৩৪

আরবি পরিভাষা: আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া ৪০

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার ৪১

তৃতীয় অধ্যায়

বিজ্ঞানের পর্যায়ক্রমিক উত্থান-পতনের ইতিহাস ৪৫

মুদ্রার অপরপীঠ ৫৫

মধ্যযুগের তিনজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ৫৮

শেষ স্ফুলিঙ্গ ৬০

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার ৬১

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের স্থানান্তরকরণ ৬৫

র‍্যায়মন্ডের উদ্যোগ ৬৬

ইসলামি জ্ঞানের একটি প্রতিকূল দৃষ্টি ৭০

সার সংক্ষেপ ও উপসংহার ৭৫

CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন ৭৯

সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান ৭৯

পরিমাপের জ্ঞান ৮০

বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন ৮২

ধারণামূলক জ্ঞানের পরিসর বিবেচনা ৯২

কীসের - কী(?) প্রশ্নমালার আদলে জ্ঞানতত্ত্ব ৯৮

ইবনে সিনার মুনতেক বা যুক্তিতত্ত্ব ৯৯

সার সংক্ষেপ ১০৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ ১০৯

আল কুরআনের দিরাইয়া-র সমার্থবোধক শব্দ ১১২

সপ্তম অধ্যায়

তিন প্রস্তী বনাম চার প্রস্তী সংজ্ঞায়ন ১১৭

আল কুরআনের ক্ষুরধার, সুমধুর, প্রদীপ্ত, হৃদয়স্পর্শী আবেদন ১২১

ইসলামের স্বরূপ ১২৬

ইমান: আকিদা ১২৭

জ্যামিতিক সমীকরণের জ্ঞান ১২৯

জ্ঞানতত্ত্বের চতুর্বিভাজন ১৩০

সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান ১৩২

হুজ্জত বনাম বুরহানের পর্যালোচনা ১৩৪

হদ (হদ্দ) তথা পরিমাপক গুণাগুণ ১৩৯

হদ বা তাহদীদ এর চতুর্প্রস্তী পরিমাপগত পদ্ধতি ১৪১

সার সংক্ষেপ ১৪৩

CamScanner

অষ্টম অধ্যায়
ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বাস্তব প্রকৃতি ১৪৭

নবম অধ্যায়
আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামি উলুম আত-তাজরিবিয়ার সম্পর্কের ব্যাপারে ক্রিটিক্যাল বিশ্লেষণ ১৫৫

আল কুরআনের জোড়াসৃষ্ঠি তত্ত্ব ১৫৫
প্রথম প্রতিপাদ্য: পদার্থিক বস্তুর সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য ক্ষয়িষ্ণু ১৫৭
দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য: বস্তুসত্তার হাকীকত স্থিতিশীল ১৫৭
Knowledge-এর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধারণ ধারণা ১৬২
কুরআনে বার্ণিত বিশ্বজগতের নিখুঁত চলমান বিশ্বব্যবস্থা বনাম আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কল্পিত Uniformity of Nature ১৬৫

দশম অধ্যায়
উপসংহার ১৭৫

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ১৭৫
চার প্রস্তী আংকিকসূত্র ১৭৭
চতুর্প্রস্তী উচ্চ শিক্ষার ধারা ১৭৯
তারিফ বনাম হদদ ১৮৪
Scientiae vs. Science ১৮৭
Scientiae Experimentalis-এর জন্মদাতা ১৯২

পরিশিষ্ট: ১ ১৯৯
পরিশিষ্ট: ২ ২০৯
পরিশিষ্ট: ৩ ২২৯

CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম দয়ালু করুণাময় আল্লাহর নামে

প্রাক্‌কথন

অতিশয় বিনয়ের সাথে দয়াময় আল্লাহর অপার মেহেরবানীর স্বীকৃতিস্বরূপ নিজ জীবনের স্মৃতিচারণ করে বলছি, বিগত ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি শিক্ষা বিভাগ থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করার পর, প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, প্রাচ্যবিদ্যাকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত ৬০ বছর ধরে, আমি প্রতীচ্যের প্রতিটি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা কৌশল আয়ত্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে আসছি। আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রসূ না হলেও, গভীর অভিনিবেশ সহকারে শব্দতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব ও আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে, আমি প্রতীচ্যের সক্রেটিস থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল পর্যন্ত মহান চিন্তাবিদদের অন্তরাত্মা পরীক্ষা করে দেখেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই যে প্রাচ্যের 'ওরিয়েন্টাল উইস্‌ডম' বা প্রাচ্যের প্রজ্ঞা, দক্ষতার সাথে আহরণ করে প্রতীচ্যের দেশে দেশে বিতরণ করেছেন, তা আমার বিশ্লেষণে সম্যক ধরা পড়েছে -যা আমার গ্রন্থে* তথ্যগতভাবে যথাস্থানে বিধৃত হয়েছে।

তবে আমি এই দেখে বিস্মিত নাহয়ে পারি না যে, 'প্রাচ্যের প্রজ্ঞা' অকাতরে ধার করে, প্রতীচ্যের এ মহান পণ্ডিতবর্গের কেউই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে অথবা আভাস-ইঙ্গিতে তাঁদের ঋণ গ্রহণের কোনো প্রকার স্বীকারোক্তি বা উদ্ধৃতি প্রদান করেননি। পক্ষান্তরে সুদূর প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রাচ্যের লোকেরা প্রতীচ্যের পণ্ডিতদের নিকট থেকে যে সব জ্ঞান-বিজ্ঞান

---

* দ্রষ্টব্য: আমার রচিত "যুক্তিতত্ত্বের সরূপ সন্ধানে প্রাচ্য বনাম প্রতীচ্য," ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ২০১৩।

CS CamScanner

আহরণ করেছেন, অকুণ্ঠভাবে তা স্বীকার করেছেন এবং উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এক প্রকার বিপরীতমুখী চরিত্র ফুটে উঠে। প্রাচ্যের বিনয়ী ঐতিহ্য অনুসরণ করে, তাই আমি এ ব্যাপারে কটুক্তি বা সমালোচনায় ব্যাপৃত হবার পরিবর্তে, খোলা মন নিয়ে প্রতীচ্যের বর্তমান পণ্ডিতদের নিকট, দেরিতে হলেও, প্রাচ্যের প্রজ্ঞা বা 'ওরিয়েন্টাল উইসডম'-এর ঐতিহাসিক ঋণ স্বীকার করার আহবান জানাই।

অধিকন্তু ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, আমি তথ্য-প্রমাণের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি যে, বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের 'তাজরিবি' বা 'এক্সপেরিমেন্টাল' ভাবধারা, বিগত সপ্তম খ্রিষ্টিয় শতাব্দীতে আল কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে দুনিয়ার কোথাও বিদ্যমান ছিল না। কুরআন থেকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং মুসলমানের হাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যুক্তিবিদ্যা, পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার বিকাশ লাভ ঘটে এবং ৮০০ থেকে ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের লালন-পালন অব্যাহত থাকে। প্রণিধানযোগ্য যে, খ্রিষ্টিয় তের শতক থেকে প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ আরবি ভাষা শিক্ষা করে, আরবি থেকে স্পেনীয় ও ল্যাটিন ভাষায় পর্যায়ক্রমে অনুবাদ করে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যুক্তিবিদ্যা ব্যতিরেকে, বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়।

আমি ভবিষ্যতে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করবো যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিদ্যাবিহীন বিজ্ঞান, প্রতীচ্যের পণ্ডিতদের মস্তিস্কে যুক্তি বিগর্হিতভাবে ঘুরপাক খেয়ে, তাদের ব্যক্তিসত্ত্বার মধ্যে আত্মম্ভরিতার সৃষ্টি করেছে। যুক্তিবিদ্যাবিহীন বিজ্ঞান তাদের যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হচ্ছেনা বিধায়, বিজ্ঞানের জ্ঞান তাদেরকে বিনয়ী করছে না। একজন ডাক্তার বিষ তৈরি করতে জানে, কিন্তু নরহত্যার জন্য বিষ ব্যাপক পরিমাণে তৈরি করে না। পক্ষান্তরে, প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীরা গণহত্যার জন্য অথবা গণহত্যার ধম্‌কী সৃষ্টি করার জন্য, পরমাণু পদার্থবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করে, এটম বোমা তৈরি করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে

না। তাই মুসলমানদের আরবি গ্রন্থে সংরক্ষিত ব্যবহারিক বিজ্ঞানের 'যুক্তিবিদ্যা' উদঘাটন করে তা আমি বিজ্ঞানের অনুদান স্বরূপ উপস্থিত করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি, যাতে বিজ্ঞানের জ্ঞান তাদের মস্তিস্ক থেকে হৃদয়ে অঙ্গম হয়ে তাদেরকে বিনয়ী করতে সক্ষম হয়।

অন্যদিকে, আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওলামায়ে কেরাম এবং আধুনিক শিক্ষায় বিজ্ঞ মুসলিম জ্ঞানীগুণীদের নিকট এ গ্রন্থটির মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমি ঐকান্তিকভাবে আশা করি, মুসলিম বিজ্ঞজনেরা আমার এ গ্রন্থের মাধ্যমে সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, 'ব্যবহারিক বিজ্ঞানের' মূল জ্ঞানভান্ডারের আগাগোড়া মুসলিম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত অবদান। আর এর উৎস হল আল কুরআন এবং মহানবি সা.-এর প্রজ্ঞা।

অতএব, জ্ঞানের ক্ষেত্রে কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন মৌলিক তফাৎ নেই। যে সব পার্থক্য কুরআন আর বিজ্ঞানের মধ্যে আমাদের সচরাচর দৃষ্টিতে দেখা যায়, তা অংশতঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এবং অংশতঃ বিজাতীয়দের বিজ্ঞানের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যার ফলশ্রুতি মাত্র।

তবে আমাদের অব্যাহত গবেষণার ধারায় ক্রমান্বয়ে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যুক্তিবিদ্যার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে আল-কুরআনে '*বুরহান*' অর্থাৎ 'বাস্তব প্রমাণ' উপস্থিত করার দাবির মধ্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অঙ্কুর নিহিত ছিল। বুরহানের অনুসন্ধানেই মুসলিম বিজ্ঞানীরা 'তাজরিবা' পদ্ধতি প্রয়োগ করে 'হদ্‌দ ও বুরহান' যুক্তি বিদ্যার আদলে *তাজরিবী* বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেন।

এ গ্রন্থটির রচনা ১৪৩৯ হিজরি ১২ই রবিউল আউয়াল, রসুলুল্লাহ সা.-এর পবিত্র জন্মদিনে সমাপ্ত হয়।

মুঈনুদ্দীন আহমদ খান

CamScanner

প্রথম অধ্যায়

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আমাদের সচরাচর জীবনযাত্রায় 'বিজ্ঞান' একটি অতি পরিচিত শব্দ। বিজ্ঞানের ঘনিষ্ট দোসর হল 'প্রযুক্তি'। বিজ্ঞান হল আধুনিক জীবনের যাদুর কাঠি। জীবনের সুখ সমৃদ্ধির সমগ্র উপাদান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে উৎসারিত হয়। তবে প্রযুক্তি, বিজ্ঞানেরই উপজাত। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক রূপই প্রযুক্তিতে প্রতিফলিত হয়। বিজ্ঞান থেকেই প্রযুক্তি উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই প্রযুক্তির মূল। প্রযুক্তি, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে। আদতে আবহমান কাল থেকে মানুষের জীবন 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'র চারিধারে আবর্তিত হয়ে আসছে।

প্রাচ্যের একজন মহান চিন্তাবিদ আবু নছর আল-ফারাবীর দৃষ্টিতে, মানব জীবনের দু'টি সংযুক্ত অথচ সর্বাধিক প্রয়োজনীয় চাহিদা হলোঃ জীবন রক্ষা ও জীবন উন্নয়ন।[১] আজকের পরস্পর মুখোমুখি প্রতিযোগিতার বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানব জীবনের প্রধান অবলম্বনে পরিণত হয়েছে। মানব জীবনের এমন কোনো স্তর নেই যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি স্পর্শ করেনি- তা ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন অথবা কুটনৈতিক জীবন, যে স্তরেরই হোক না কেন?

কোনো ব্যক্তি বা জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছাড়া কিছুতেই পথ চলতে পারে না। অতএব, আজকের দিনে প্রত্যেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে পার্থিব জীবনের সর্বতোসার ও সার্বিক লক্ষ রূপে গ্রহণ করে।

পুরানো যুগের জ্ঞান বিলাসিতা ও মনন সাধনার মোহনীয় প্রবৃত্তির স্তর থেকে, বিজ্ঞান আজকাল, প্রকৃতিবাদের নামে নৈতিকতা ও ধর্মের প্রতি এক প্রকার হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে এক প্রকার বানোয়াট বা artificial স্ব-নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি করেছে। এক ধরনের বিজ্ঞানবাদিতা

CamScanner

মানুষকে ধর্মভাবের বন্ধন থেকে মুক্ত করার দিকে পরিচালিত করছে। বিজ্ঞান, আজকাল ধর্মের বন্ধন শিথিল করার প্রবণতা যোগাচ্ছে। বিজ্ঞান, ধর্মজ্ঞান ও নৈতিকতাকে বাস্তবতার দ্বারা রদবদল করার প্রয়াস পাচ্ছে।

ইহজগতে মানুষের জীবিকা অন্বেষণের ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী হওয়ার পরিবর্তে, অনেকে বিজ্ঞানমুখি হয়ে জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। এমনকি মানুষের সার্বিক জীবন ব্যবস্থায়, বিজ্ঞান, ধর্মের স্থান দখল করার প্রয়াস পাচ্ছে। তাতে পরকালের চিন্তা গৌণ হয়ে পড়ছে, ধর্মীয় ভাব শিথিল হচ্ছে এবং নৈতিকতা নিছক ভাব প্রবণতায় পর্যবসিত হচ্ছে। নৈতিকতা ও আদর্শিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা যথার্থই দুঃখজনক।

ফলত: এক প্রকারের গ্রিক ভাবাপন্ন সেক্যুলারিজম তথা পার্থিববাদী ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার বুলি আকাশে বাতাসে বিরাজ করছে; এবং বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে[২] গ্রিক সভ্যতার জমজ-মাহাত্ম্য রূপে কল্পনা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অধিকন্তু অর্থনৈতিক প্রগতিশীলতার শ্রেয় দিকদর্শকরূপে বিবেচনা করা হচ্ছে। এই সূত্রে জাতিগুলো মৌলিক বিজ্ঞান (Basic Science) ও উচ্চ প্রযুক্তি (High Technology)-র প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করতে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। আজকাল মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষাগার এবং উচ্চ ও নিম্ন প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রত্যেক জাতিই সর্বাধিক তৎপর হয়েছে।[৩]

তদুপরি আজকের অত্যাধুনিক পারমাণবিক যুগে প্রযুক্তি অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছে। উচ্চ প্রযুক্তি আজকের দ্রুত উন্নয়নশীল মানব সভ্যতার পদক্ষেপগুলোর পথ প্রদর্শন করছে, যাতে শিল্পোন্নত জাতিগুলো, যথা- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, জাপান, জার্মানি ও অন্যান্যরা পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার কঠোর প্রতিযোগিতার সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। নিত্যনব নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং অভিনব প্রযুক্তির উদ্ভাবন উন্নত জাতিগুলোর অগ্রগতি নিশ্চিত করছে।

CamScanner

প্রযুক্তির উন্নয়ন বিজ্ঞানের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল।[৪] জাতীয়তাবাদী ঈর্ষায় নিমজ্জিত, বর্তমান বিশ্বে জাতীয়তাবাদের মাহাত্ম্য ও দৌরাত্ম্য ছোট বড় জাতিগুলোকে মোহাচ্ছন্ন করে একে অন্যকে বাহুবলের দূরত্বে ঠেকিয়ে রাখছে। গলাগলি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভালোর জন্যেই হোক বা মন্দের জন্যেই হোক, কোনো জাতিই তার মৌলিক বিজ্ঞানের অর্জিত ফলাফল, অন্য জাতিকে দেখাতে প্রস্তুত নয়। কাজেই মৌলিক বিজ্ঞান ও উচ্চ প্রযুক্তিতে যে সব জাতি যতই উন্নত হচ্ছে, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার মাপকাঠিতেও তারা ততই অগ্রগামী হচ্ছে। এসব জাতি আজকাল অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে এবং জাতিসংঘকে পরিচালনা করার ব্যাপারে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এরূপ ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান প্রগতি, আধুনিকতা, অগ্রগামিতা সমৃদ্ধি অর্জনের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। তাই বিজ্ঞান নিয়ে আমরা অতি মাত্রায় মাতামাতি করছি। বিজ্ঞান বলতে আমরা ইংরেজি ভাষায় এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স (Experimental Science) এবং আরবি ভাষায় 'উলুম আত-তাজরিবিয়া' বুঝে থাকি। অতএব, বিজ্ঞান বলতে আমরা সুনিশ্চিতভাবে কি বুঝি তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের বিচার বিবেচনা

'বিজ্ঞান' শব্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমরা সচরাচর মনে করে থাকি যে, বিজ্ঞানের আসল শব্দ ইংরেজি ভাষার Science 'সায়েন্স'। আমরা আরো মনে করে থাকি যে, সায়েন্স (Science) একটি মৌলিক শব্দ। আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, বাংলা ভাষার বিজ্ঞানের মতই, আরবি ভাষার 'উলুম আত-তাজরিবিয়া'-ও সায়েন্স এর অনুবাদ। তবে একটু গভীরভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে বিষয়টি অন্যরূপ দেখায়। সুতরাং, এটা বিষদভাবে পরীক্ষা করার অপেক্ষা রাখে।

তাহলে আমরা কি জিজ্ঞেস করতে পারিঃ সায়েন্স কি? সায়েন্স শব্দের উৎপত্তি কোথায়?

CamScanner

Science 'সায়েন্স' শব্দটি ইংরেজি শব্দ। এটাকে ল্যাটিন ভিত্তিক শব্দ বলে মনে করা হয়। ল্যাটিন শব্দকোষ অনুসারে মূলত science বলে কোন শব্দ নেই। আছে 'সায়েনটিয়া (scientia)। শাব্দিক দিক থেকে যা 'sciens+entis' থেকে গঠিত। এটার অংকুর ছিল 'scire' ও 'scio'। তবে 'scientia' শব্দটি সচরাচরভাবে বহুবচনের চিহ্ন 'ae' যুক্ত হয়ে প্রচলিত ব্যবহারে 'scientiae' (সায়েনটে) রূপে উচ্চারিত হয়।[৫] ল্যাটিন অভিধানে বলা হয়- 'sciens' এর অর্থ জানা, আলামা (knowing) বা কোন বিষয়ে দক্ষতা (skilled in anything) অথবা জ্ঞান (knowledge), বা বিশেষজ্ঞতা (expertness) অর্থাৎ কিনা cagnitio, eruditio, *aut scire istarum rerum nihil, tantae scientiae.*[৬]

অতএব, বলা হয়ঃ 'science' শব্দটি এভাবে ব্যুৎপন্নঃ 'scientia> sciens+ entis> scio.' কিন্তু science-এর প্রান্তিক 'ce' ল্যাটিন ভাষা সম্মত নয় তাই উৎপত্তি মূলে শব্দটি ল্যাটিন হওয়া সন্দেহজনক।

ল্যাটিন অভিধানে, 'scio' মানে বলা হয়, কোনো বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানা বা শব্দের গুরুত্ব উপলব্ধি করা, যাকে ইংরেজি ভাষায় 'Understand' বা 'Perceive' শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়; কোন বিষয়ে জ্ঞান বা দক্ষতা থাকা, উদাহরণ স্বরূপ কোনো মহিলার ব্যাপারেঃ একজন পুরুষকে মজ্জাগতভাবে (carnally) জানা, যাকে 'cognitio' বলে ব্যাখ্যা করা হয়।[৭]

এমনও বলা হয় যে, 'scio' মানে হুকুম জারি করা, বিধি-বিধান চালু করা, কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় খবরাখবর জ্ঞাত হওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অতএব, *'sciens+entis'* মানে বিষদভাবে জ্ঞাত হওয়া (knowing)।[৮]

'Sciens' এর অন্য মূলটি হলো, 'scire' যার অর্থ- বুঝা ও জানা।[৯] *দ্য ওয়ার্লড্ ইউনিভার্সিটি এনসাইক্লোপিডিয়ার* মতে, সায়েন্স এর মূল হল 'scire' যার অর্থ -জানা, অতএব, যে কোনো প্রকার সংগঠিত জ্ঞান।[১০]

অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিঃ অধিকন্তু বলে যে, সায়েন্স শব্দটি ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়, যথা- স্পেনিশ-

CS CamScanner

ciencia, ইটালীয়ান -scienza, ফরাসী-scient-em, যা scire এর past partciple, সব গুলির অর্থ 'জানা'; আর ল্যাটিন scientia- র অর্থ জ্ঞান।[১১]

পর্তুগিজ ইংলিশ ডিকশনারি: এ বিষয়ে পর্তুগীজ ভাষার হদিস প্রদান করে 'sciencia' এবং 'scientifico' শব্দদ্বয় উদ্ধৃত করে, যার অর্থ হল বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক।[১২]

অক্সফোর্ড ডিকশনারি আরো বিশ্লেষণ করে বলে: It implies the state or facts of knowing or cognisance of something specified or implied, তবে আজকাল ধর্ম তত্ত্বের তুলনায় 'science' শব্দটি knowledge as opposed to belief or opinion অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৩]

ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক থেকে সায়েন্স শব্দের যুগে যুগে ব্যবহার সম্পর্কে *অক্সফোর্ড ডিকশনারি বলে:*[১৪]

১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে : For God of science is Lord.

১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দে : Scyence O the height and deepenes of the ryches of the wysdome and scyence of God.

১৬০১ খ্রিষ্টাব্দে : সেক্সপিয়ার বলেন: Had not in natures mysterie more science than I have in this ring?

১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে : Divines suppose three kinds of science in God; the first, science of mere knowledge; second, a science of vision; third, an intermediate science.

উপরিউক্ত উদাহরণগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সতেরো শতকে শেক্সপিয়ার সায়েন্স শব্দটি রহস্য জ্ঞান বা আল্লাহর নিদর্শন অর্থে ব্যবহার করেন। অধিকন্তু ধর্মযাজক বা ডিভাইনদের দ্বারা সায়েন্স এর তিন শ্রেণিতে বিন্যাস আল-কুরআন ও বাইবেলের দৃষ্টিতে জ্ঞানকে (ক) অনুভূতি ভিত্তিক (খ) আধ্যাত্মিক ও (গ) প্রত্যাদিষ্ট রূপে বিভক্তি সূচিত করে। অতএব, ১৩৪০ থেকে ১৭২৮ পর্যন্ত সায়েন্স শব্দটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা

CamScanner

'Experimental Science'-এর বদলে রহস্যজনক জ্ঞানের অর্থে- প্রকৃতির রহস্য বা আল্লাহর নিদর্শন এর সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং, সায়েন্স (Science) শব্দটির ব্যবহার, 'scio' থেকে উৎপন্ন হোক বা 'scirc' থেকে উৎপন্ন হোক, ল্যাটিন কথায় বা অন্য কোন প্রতীচ্য ভাষায় উচ্চারিত হোক না কেন (?) তা আধুনিক বিজ্ঞানের পরিসর থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের কাছে বাস্তব জ্ঞান নিয়ে উপস্থিত হয়, যা পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে লব্ধ, অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ (Objective)। পক্ষান্তরে এখানে যে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে, তা হলো সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি কেন্দ্রিক (Subjective) কাল্পনিক, চিন্তালব্ধ, মনন সঞ্জাত।

আরো ঘোলাটে করে, অক্সফোর্ড ডিকশনারি প্রাচীন গ্রিক ঐতিহ্যের সায়েন্স ও আর্ট (তথা বিজ্ঞান ও কলা) এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বলেঃ "আর্ট-এর বিপরীতে সায়েন্স (গ্রিক) সূত্রগত বা তাত্ত্বিক সত্য (Theoretical Truth) নিয়ে ব্যপৃত হয়; পক্ষান্তরে আর্ট (গ্রিক) কতেক ফলাফল উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপৃত হয়। তবে কোন কোন সময় সায়েন্সকে প্রয়োগিক কর্মের স্তরেও সম্প্রসারিত করা হয়, যা জ্ঞান এবং সচেতনভাবে সূত্রাদির প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে আর্ট বলতে অভ্যাসগত দক্ষতা ও ঐতিহ্যগত রীতি- জ্ঞানকেই বুঝিয়ে থাকে"।[১৫]

এতদ্‌সত্ত্বেও এখন স্বীকার করা হয় যে, সতেরো আঠারো শতকে বর্তমানে যাকে 'সায়েন্স' বলা হয়, তা সাধারণভাবে 'প্রাকৃতিক দর্শন' (Natural Philosophy) নামে প্রকাশ করা হতো।[১৬]

সরল কথায়, 'যদি গ্রিক ভাষায় সায়েন্স ও আর্টের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, তবুও বর্তমানে যাকে সায়েন্স বলা হয়, গ্রিক ভাষায় প্রচলিত প্রথায় তাকে সায়েন্স বলা হতো না। বরং আমরা যাকে সায়েন্স বলি, তা গ্রিক ঐতিহ্যে 'ফিলোসফি' বা দর্শন নামে পরিচিত ছিল। আদতে গ্রিক ভাষার কোন স্তরেই সায়েন্স শব্দের প্রচলন ছিল না।

CamScanner

অনুরূপভাবে, প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায়ও সায়েন্স শব্দের অস্তিত্ব ছিল না। এমনকি সচরাচর ল্যাটিন কথায় মধ্যযুগ অবধি সায়েন্স শব্দের প্রচলন ছিল না। কেবলমাত্র খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের ঐতিহ্যে সায়েন্স শব্দের ব্যবহার কিয়দ পরিমাণে দেখা যায়। এদের বেলায়ও এ শব্দটি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক জ্ঞানের অর্থে উনিশ শতকের পূর্বে ব্যবহৃত হতো না।

বিষয়টি আরো অধিক ঘোরালো করে এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফিলোসফি আমাদেরকে অবহিত করে যে, জন এফ হার্শেল (John F. Herschell) ছিলেন 'সায়েন্টিফিক এনালাইটিক্যাল মেথডলজি', তথা 'বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি'র উদ্ভাবক। কিন্তু তার লেখা যে গ্রন্থের ভিত্তিতে এ মন্তব্যটি করা হল, সে গ্রন্থের তিনি নামকরণ করেন: "Preliminary Discourse on the study of Natural Philosphy"। তিনি গ্রন্থটিকে এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স নামে অভিহিত করার কথা দূরে থাক, এটাকে 'ন্যাচারাল সায়েন্স'-ও বলেননি। এ গ্রন্থটি লন্ডন থেকে ১৮৩০ সনে প্রকাশিত হয়।[১৭] অতএব, স্পষ্টত: প্রতীয়মান হচ্ছে যে, খ্রিষ্টীয় ১৮৩০ সন অবধি গ্রিক, ল্যাটিন বা অন্য কোনো ইউরোপীয় ভাষায় বিজ্ঞান অর্থে সায়েন্স শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত হয়নি। বরং প্রতীচ্যে 'বিজ্ঞান', Natural Philosophy তথা 'প্রাকৃতিক দর্শন' নামে পরিচত ছিল।

ল্যাটিন শব্দ সায়েন্টিয়া (scientia) মূলের সমীক্ষা

অবশ্য ল্যাটিন ভাষায় আমরা সায়েন্স (Science)-এর তিনটি শব্দ মূলের পরিচয় পাই, যথা- scire, scio এবং sciens, যা থেকে সায়েন্স শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে এগুলোর সঙ্গতি নিরূপণ করার জন্যে এগুলোর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

উপরে যেমন আমরা দেখেছি 'scire' শব্দটি সচরাচর অর্থে 'knowing' বা জানার কর্মকাণ্ড বুঝবার জন্য প্রয়োগ করা হয়।[১৮] এ শব্দমূলটির শাব্দিক গঠন এবং অর্থ ও গুরুত্বের সরলতা দৃষ্টে, এটাকে গ্রিক Practical বা Natural Philosphy, তথা প্রায়োগিক দর্শন বা প্রকৃতির

CamScanner

দর্শনের সমপর্যায়ভূক্ত করে, আধুনিক বিজ্ঞানের সমকক্ষ রূপে দাঁড় করানো কঠিন বৈকি। অধিকন্তু, অতি সরল 'scire'-কে অর্থগত সম্প্রসারণের মাধ্যমে সায়েন্সের স্তরে উন্নীত করা ভাষাগতভাবে অযৌক্তিক ও অবান্তর।

অন্যদিকে, 'scio' শব্দটি অধিকতর তাৎপর্য বহন করে।[১৯] কিন্তু এতে সায়েন্সের বাস্তব ভিত্তিক ধারণার চাইতে অনুভূতি ও ভাবাবেগ অধিকতর প্রকট।

এমনকি ব্যাকরণের নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে, যদি এটা স্বীকারও করা হয় যে, বাকরীতির শব্দতাত্ত্বিক ধারায় 'scire' 'scio' কে প্রসারিত করে 'science' শব্দ গঠন করা যায়, তবুও 'entis' শব্দাংশের 'science'-এর সাথে যুক্ত হওয়ায় সমস্যাটি দুর্বোধ্য থেকে যায়। কেননা, scire, scio, sciens শব্দগুলো স্বতন্ত্রভাবে 'science' এর অর্থ বহন করার অনুপযুক্ত বিবেচনা করে sciens এর সাথে 'entis যুক্ত করে scientia গঠন করা হয়, যা ইংরেজি ভাষা ব্যতিরেকে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষাগুলোতে আধুনিক বিজ্ঞানের সমার্থবোধক শব্দ সরবরাহ করেছে। লক্ষনীয় যে, science-এর অনুরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ হয় না।

তবে ইংরেজি ভাষার 'science' বা 'scyence' একটি যুক্ত শব্দ নয় বিধায়, এটি প্রকৃতিগত বাক প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত, মৌল ধারণা সম্পন্ন, একক শব্দ বলেই প্রতীয়মান হয়। দৃশ্যতঃ মনে হয় ইংরেজি 'science' শব্দটি বিজ্ঞানের অর্থ প্রকাশ করার জন্য অথবা বিজ্ঞানের অর্থে ব্যবহার করার জন্য গঠন করা হয় নাই এবং আমরা যেরূপ উপরে দেখেছি, ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ শব্দটি বিজ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী কোন এক সময় ইংরেজি 'science' ল্যাটিন 'scientia' এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিজ্ঞানের সম-অর্থে ইংরেজি ভাষায় প্রচলিত হয়ে যায়।[২০]

এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়, কেন ও কখন ল্যাটিন ভাষায় 'scientia' শব্দটির উদ্ভাবন করা হয়? এটা কি একটি শিক্ষাপ্রদ ধারণার নামকরণে প্রকৃতিগত প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হয়েছিল? অথবা কোন বিদেশী ভাব-ধারণা অনুবাদ করার লক্ষে গঠন করা হয়েছিল?

CamScanner

একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য

"Fround's Latin Dictionary"[২১] নামক একটি সুপ্রাচীন ল্যাটিন অভিধানের উপর ভিত্তি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক (New York) থেকে ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দে যে, Latin Dictionary প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয়েছে যে, 'scientia শব্দটি 'বহুবচনের 'ae' চিহ্ন' যুক্ত হয়ে, সর্বদা 'scientiae' রূপে ব্যবহৃত হয়।[২২]

এ তথ্যটি কেবল 'scien+entis' থেকে 'scientia' সৃষ্টি হয়েছে বলে বুঝায় না; বরং তদুপরি এটাও সুচিত করে যে, সর্বদা বহুবচনে 'scientiae' রূপে এরূপ ব্যবহারের অন্য কারণ ছিল, সংশ্লিষ্ট সহগামী বহুবাচনিক 'experimentalis' শব্দের অবিচ্ছেদ্য জুড়ি হিসেবে এটা উদগত হয়ে থাকবে।

প্রতীচ্যের একটি মহাগৌরবান্বিত সংস্কারমূলক গ্রন্থ, মহাজ্ঞানী রজার ব্যাকন (১২১৪-১২৯২ খ্রি.) রচিত Opus Majus এ বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বিধৃত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় তের শতকের শেষার্ধে Roger Bacon সম্ভবত: তাঁর এই বিশ্বকোষ শ্রেণির শিক্ষাসংস্কারমূলক গ্রন্থে সর্বপ্রথম তৎকালীন প্রচলিত ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আরবি পারিভাষিক শব্দ 'আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া' এর ল্যাটিন অনুবাদ রূপে 'Scientiae Experimentalis' পরিশব্দটি উদ্ভাবন করেন।[২৩]

অতএব, 'Scientiae' বহুবচনে, 'উলুম' বহুবচনের অনুবাদ এবং বহুবচনে 'Experimentalis' 'তাজরিবিয়া'-এর অনুবাদ হিসেবে 'Scientiae Experimentalis' 'আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া'র স্থলাভিষিক্ত হয়। কেননা, আধুনিক বিজ্ঞান, শুধু বিজ্ঞান নয়, অথবা যেকোনো প্রকার বিজ্ঞান নয়; বরং 'তাজরিবা' ভিত্তিক, কার্যত: 'নিরীক্ষা' বিজ্ঞান। 'তাজরিবা' বা 'Experiment' ছাড়া কেবল 'scientia' আধুনিক বিজ্ঞানের ধারে কাছেও আসবে না।

CamScanner

আমরা এটাও দেখতে পাই যে, 'তাজরিবা' করে দেখা, অর্থাৎ প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার ভাবটি, রজার ব্যাকন এর 'Experimentalis' পরিশব্দ দ্বারা যেভাবে হুবহু 'তাজরিবিয়া' এর অর্থ বহন করে, বাংলা ভাষায় 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' বলতে সেরূপ পূর্ণাঙ্গ অর্থ পাওয়া যায় না। কলিকাতার বাঙ্গালি পণ্ডিতগণ ইংরেজি 'Experimental Science' এর অনুবাদ করার সময় বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে না পেরে, ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' করেছেন, যা শুদ্ধরূপে সংশোধন করার অপেক্ষা রাখে।

ইতিহাসের চত্বরে 'sciens+entis'-এর বিষয়ে আর এক প্রকার আকর্ষণীয় ব্যাপার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যাতে উপরোক্ত ল্যাটিন অভিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকেও অধিকতর স্পষ্টরূপে 'science' তথা 'scientiae' শব্দের উৎপত্তি সূচিত হয়। স্মর্তব্য যে, বাগদাদ নগরীতে আব্বাসীয় খিলাফতের উজ্জ্বল সমৃদ্ধির যুগে খ্রিষ্টিয় দশম শতকে মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, আবু নছর আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রি.) যাঁকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্ব ইতিহাসে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের পরবর্তীতে 'দ্বিতীয় শিক্ষক' বলা হয়, তিনি 'আল-ইহ্ছা আল-উলুম' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এর অর্থ হলো: বিজ্ঞানাদির গণনা বা তালিকা। এতে সে যুগে প্রচলিত যত জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। বারো শতকের মধ্যবর্তীকালে এই গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ ডমিনিকান গুন্ডিসালভী আংশিকভাবে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। আর বাকি অংশ ল্যাটিনে অনুবাদ ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন অন্য একজন প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ জেরার্ড অব ক্রিমোনা। তাদের উভয়েই অনূদিত গ্রন্থটির নামকরণ করেন 'De Scientiis' অর্থাৎ 'the sciences' মানে 'বিজ্ঞানসমূহের গ্রন্থ'।[২৪]

তাঁরা উভয়ই আরবি ভাষায় দক্ষ-জ্ঞানী, ছিলেন এবং খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই 'scientiis' শব্দটি আরবি 'উলুম' অর্থাৎ বিজ্ঞানাদি এর অনুবাদ স্বরূপ ল্যাটিন ভাষায় উদ্ভাবন করেন। আর স্পষ্টতঃ তাঁরা 'scientiis' শব্দটি 'sciens+entis' থেকে উদ্ভাবন করেন। অতএব,

CamScanner

'scientiae' শব্দের উৎপত্তি 'sciens+entis' থেকে ডাবল আই (i+i) যুক্ত করে বহুবচন আকারে 'scientiis' রূপে তৈরি হয়েছিল তা স্বতঃসিদ্ধ। অর্থাৎ শব্দটি ভাষাগতভাবে বাকরীতিতে ইংরেজি 'science' থেকে উৎপন্ন হয়নি; বরং বিদেশী শব্দের অনুবাদ করার জন্য বহুবচনে তৈরি করা হয়েছে। এর সরল অর্থ হলঃ আরবি 'ইলম' এর বহুবচন 'উলুম' এর অনুবাদ রূপেই বহুবচন 'scientiis' শব্দের উৎপত্তি।

যুক্তশব্দঃ এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স

অতএব, ল্যাটিন অভিধানের ভাষ্যঃ 'science' শব্দটি 'sciens+entis' থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তা গুন্ডিসালভী ও জেরার্ড এর উলুম এর অনুবাদ 'scientiis' থেকে স্বততই প্রতীয়মান হয় না। আরবি শব্দ 'উলুম', 'ইলম' এর বহুবচন, যা মূলত 'আলম' থেকে উৎপন্ন। 'আলম' মানে চিহ্ন, যাকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় symbol বা insignia. 'আলম' এমন একটি চিহ্নকে বলা হয়, যাদ্বারা কোনো বস্তুকে সনাক্ত করা যায়। আর 'ইলম' কোন জ্ঞানের বিষয়কে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ যা আলম, সনাক্তকারী চিহ্নের মাধ্যমে জানা যায়, তাই 'ইলম' বিজ্ঞান হল, এরূপ 'ইল্‌ম'। এরূপ জানার বিষয়বস্তুকেও 'ইল্‌ম' বলা হয়। অতএব, প্রচলিত কথায় 'ইল্‌ম' মানে জ্ঞান এবং 'আল-ইল্‌ম' মানে বিজ্ঞান বা 'science' কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে, আরবি ভাষায় 'বিজ্ঞান' বা 'science' এক বচনে 'আল-ইল্‌ম' রূপে ব্যবহৃত না হয়ে সচরাচরভাবে বহু বচনে 'আল উলুম' 'العلوم' রূপে ব্যবহৃত হয়।

কেননা, মুসলিম সভ্যতার প্রথম যুগে, যখন বাগদাদ, কায়রো ও কর্ডোভায় বিজ্ঞানাদির উদ্ভব হয়, তাতে একটি মাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল না। কয়েকটি বিজ্ঞান যুক্তভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়; যেমন- গণিত, এলজেব্রা, দর্শন, পর্দাথ, রসায়ন বা চিকিৎসা বিজ্ঞান। তাই বিজ্ঞানকে সচরাচরভাবে জোটীয় বা যুক্তভাবে দেখা হত। যেমন- বলা হয় 'আল-উলুম-আস-

CS CamScanner

সিয়াসিয়াত' (রাজনীতি বিজ্ঞানাদি), 'আল উলুম আত-তাবিয়িয়াত' (প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি) 'আল-উলুম আত-তাজরিবিয়াত' (তাজরিবী বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানাদি) ইত্যাদি।

সুতরাং এটা নির্ঘাত বোধগম্য যে, গুন্ডিসালভী 'scientiis' শব্দটি বহুবচনে আরবি 'উলুম' শব্দটির অনুবাদ করার জন্য উদ্ভাবন করেছিলেন। এ যুক্ত শব্দটি যদি 'sciens+entis' এর সমন্বয়ে হয়ে থাকে,তবে 'sciens' এর অর্থ হবে 'চিহ্ন' বা 'আলম', তথা সনাক্তকারী চিহ্ন বা নিদর্শন। তা হলে 'scientiis' এর ডবল (i+i) কি বহুবচনের চিহ্ন? সে ক্ষেত্রে রজার ব্যাকন এর 'scientiae'-র গঠন রূপ কিরূপ হবে? উভয় শব্দ বহুবচন রূপে ব্যবহৃত বিধায়, ল্যাটিন অভিধানের এ বিষয়ক বিশ্লেষণের যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়। এটা গ্রহণ যোগ্য হয় না।

এ ক্ষেত্রে যেকোনো বিজ্ঞ গবেষক এদিক সেদিক কাল্পনিক যুক্তিতর্কের অবতারণা করার পরিবর্তে, এরা যে বিজ্ঞান শব্দের মূল, ডালপালাসহ, আরবি ঐতিহ্য থেকে ধার করে নিয়েছে, তাই প্রথমে স্বীকার করে, ইনিয়ে বিনিয়ে এ নিরেট সত্যটি আড়াল করতে চেষ্টা না করেন, তবেই বিষয়টি যথাযথভাবে বোধগম্য হবে। অতএব, প্রতীচ্যের বিজ্ঞজনদের প্রতি আমরা স্বাভাবিকভাবে প্রাচ্যের নিকট তাদের ঋণ স্বীকার করার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আহ্বান জানাই।

অধিকন্তু 'sciens' বা 'science' শব্দ যদি আরবি 'ইলম'-এর অনুবাদ হয়ে থাকে এবং উভয়ের বৈশিষ্ট্য যদি 'সনাক্তকারী চিহ্নের' মধ্যে নিহিত থাকে, তবে সনাক্তকারী চিহ্নের বা নিদর্শনের মাধ্যমে যত প্রকার বিদ্যা বা জ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে, সবগুলোকে বিজ্ঞান বলা যাবে না। কেননা, গুন্ডিসালভী ও জেরার্ড যেজ্ঞান আহরণ করতে আরবি ভাষায় রচিত আল-ফারাবীর 'আল-ইহ্ছা আল-উলুম'-এর অনুবাদ করেছিলেন এবং রজার ব্যাকন 'Scientiae Experimentalis' নামে যে জ্ঞানকে আখ্যায়িত করেছেন, তা হল 'তাজরিবিয়া' বিজ্ঞান, যার যথার্থ শুদ্ধ অনুবাদ 'Experimental' বা 'Experimentalis. তবুও কেউ প্রশ্ন করতে পারেঃ

সরল, সুন্দর 'science' শব্দটি কি 'scientiis' বা 'scientiae' শব্দের পরিশোধিত রূপ? অথবা 'science' শব্দটি অন্য কোন সূত্রে উদ্ভূত?

সরল, সুন্দর 'science' শব্দটি আদতে কবি ও খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের সরল সহজ ভাষায় প্রচলিত কথা 'Science of God' অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন বা আল্লাহর কুদরত, যা আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের দিকে নির্দেশ করে, আরবি ভাষায় 'আলম' এর সনাক্তকারী নির্দেশিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। এদিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে ল্যাটিন 'scientiis' 'scientiae' যেমন- আরবি 'ইলম'-এর সমতুল্য বোধ হয়, তেমনি ইংরেজি 'science' ও 'scyence' আরবি ইলম এর বদলে চিহ্ন বা 'আলম্'-এর সমতুল্য মনে হয়। তবে 'Science of God' কথাটি আরবি-হিব্রু ধারণার 'আয়াত' অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন এর সমতুল্য বলেও গ্রহণ করা যায়।

অতএব, এরূপ মনে করার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, বাইবেলের হিব্রু ভাষা থেকে ল্যাটিনে ও ইংলিশে অনুবাদ করার সময়, ইংরেজি ভাষায় 'science' শব্দটি আয়াতেরই অনুবাদ হিসেবে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষার 'science' শব্দকে ল্যাটিন 'scientiis' ও 'scientiae' এর পরিশোধিত রূপ হিসাবে গ্রহণ অথবা এটাকে সরাসরি এক বাচনিক 'আয়াত' এর অনুবাদ হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

ইউরোপীয় মধ্যযুগের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দেখা যায় তৎকালীন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মযাজকমন্ডলি বিজ্ঞানকে ধর্মবিরোধী বিবেচনা করে বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান প্রচার করতে কপার্নিকাস, গ্যালিলিও, সার্বিটাস প্রমুখ বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের হাতে নাজেহাল হন। অনেকে বারংবার খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের কোপানলে পতিত হন, এমনকি রজার ব্যাকন কার্যত ১৪ বছর জেলে বা অন্তরীণ জীবন যাপন করেন। পরবর্তীকালে কপার্নিকাস, গ্যালিলিও, সার্বিটাস প্রমুখের চরম বিপত্তি নিরীক্ষণ করে, তারা বিজ্ঞানকে প্রতীচ্যের ধারায় 'Natural Philosophy' নামে পরিবর্তন করে, ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের দ্বারা বহুল প্রচারিত 'Science of God' এর 'science'

CamScanner

কথাটি বিজ্ঞানের জন্য চালু করেন। অতপর প্রতীচ্যে বিজ্ঞান 'Experimental Science' নামে অভিহিত হয়, যদিও 'science' মানে আয়াত বা চিহ্ন মাত্র, চিহ্নযুক্ত বিজ্ঞান নয়।

প্রণিধান যোগ্য যে, প্রাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান যাজকমণ্ডলি গ্রিক ঐতিহ্যগত 'Natural Philosophy' নামে বিজ্ঞানচর্চায় আপত্তি করলেন না, 'Scientiae Expermientalis' নামে বিজ্ঞান চর্চা করতে ক্রুদ্ধ হলেন কেন? তাঁরা কি অনুধাবন করেছিলেন যে, শেষোক্ত নামটি মুসলিম ঐতিহ্য থেকে আহরিত হয়েছিল এবং এরূপ কঠোর বিরোধিতার মাধ্যমে তারা কি প্রতীচ্যে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রভাব রোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন? এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করার অপেক্ষা রাখে।

এভাবে ধর্মভাবাপন্ন শব্দ 'science' শব্দটি 'secular' ধর্মহীন বা ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানের জন্য চালু করার পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাক না কেন, তখন 'science' বলতে 'experimental science' ই বুঝানো হত এবং 'experimental science' বলতে আদতে 'scientiae experimentalis'-ই অর্থ করা হল, যা আমরা উপরে দেখেছি যে, প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষায় 'আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া'র হুবহু অনুবাদ বই আর কিছুই নয়।

বাংলা বিজ্ঞান প্রসঙ্গ

বাংলা ভাষায় science-কে বিজ্ঞান বলা হয়। শব্দটি সংস্কৃত ভাষার 'বিজ্ঞানম' থেকে আহরিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় 'বিজ্ঞানম' বলতে সায়েন্স বুঝায় না। বরং 'বিজ্ঞানম' মানে - যে কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানকে বুঝায়, উদাহারণ স্বরূপঃ অংকন শাস্ত্র, ভাষার ব্যাকরণ ও বেদব্যাখ্য শাস্ত্রকে 'বিজ্ঞানম' বলা হয়।

আদতে সংস্কৃতে 'বিজ্ঞানম' বলতে যে ভাব ধারনা বুঝানো হয় তা আধুনিক বিজ্ঞানের ধারে কাছেও যায় না। সচরাচরভাবে প্রতীচ্যে যেসব বিষয়কে বিজ্ঞান বলা হয়, সংস্কৃতে ওসব বিষয়কে 'শাস্ত্র' বলা হয়। তদনুযায়ী প্রচলিত বাংলা ভাষায়ও বিজ্ঞানকে শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে।[২৫]

যেমন, অংক শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র ইত্যাদি সংস্কৃতের অনুকরণে বলা হয়ে থাকে। অতএব, বাংলা ভাষার বিজ্ঞান ও সংস্কৃত 'বিজ্ঞানম' কোনরূপেই এক নয়। দুই ভাষায় দুইটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আধুনিক বিজ্ঞানকে বুঝাবার জন্য বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার বাংলা ভাষায় সাম্প্রতিক। এটা উনিশ শতকের শেষাংশে প্রচলিত হয়। আধুনিক বাংলার অন্যতম স্থপতি বঙ্কিমচন্দ্র, এ বিষয়গত বিবর্তনের একজন বড় সাক্ষী। তিনি তার 'অনুশীলন' নামক গ্রন্থে বলেন: "আমি দেখিতেছি, তোমরা 'বিজ্ঞান'-কে সায়েন্সের অর্থে চালু করিতেছ"।[২৬] এটা ঐ সময়ের কথা, যখন ইংরেজি ভাষায় 'Natural Philosophy'-এর স্থলে 'Experimental Science' শব্দের প্রবর্তন করা হচ্ছিল।

আদতে কলিকাতার হিন্দু পণ্ডিতমন্ডলি, যাঁরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে 'Experimental Science'-এর অনুবাদ রূপে প্রচলন করেন, তাঁরা আরবি ভাষায় 'উলুম আত-তাজরিবিয়া' নামে বহুপূর্ব থেকে এর প্রচলন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তাই তাঁরা এ বিজ্ঞানকে 'তাজরিবী বিজ্ঞান' বা 'নিরীক্ষা বিজ্ঞান' না বলে 'Experimental' এর অতিসরল অর্থ গ্রহণ করে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' নামকরণ করেন, যার প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় 'Functional Science' এতে যা প্রতিভাত হয়, তা হল ব্যবহারিক, প্রচলিত, প্রয়োগিক ইত্যাদি; পক্ষান্তরে, এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা একটি বিশেষ পদ্ধতিগতভাবে লব্ধ জ্ঞানের প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিত বহন করে না।[২৭]

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

সারসংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, সায়েন্স শব্দটি গ্রিক জ্ঞান চর্চার উৎস থেকে উদগত হয়ে, ল্যাটিন ভাষায় রূপায়িত হয়েছে বলে বহুল প্রচলিত সাধারণ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীতে, আমাদের বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা মূলে দেখা যায় যে, সায়েন্সের ধারণাটি প্রতীচ্যে মধ্যযুগের 'scientiis' নামের সাথে বারো শতকে উদগত হয়ে, আরবি 'আল-উলুম'-এর ল্যাটিন অনুবাদ রূপে স্থিতি লাভ করে। এ শব্দটি ল্যাটিন ভাষার শব্দ মূল 'sciens + entis' দ্বারা

CamScanner

গঠিত হয়ে থাকবে। তবে আরো পরবর্তীতে তের শতকের শেষাংশে রজার ব্যাকন, দুই শব্দ বিশিষ্ট 'scientiae expirimentalis' পারিভাষিক শব্দ উদ্ভাবন করে, আরবি 'আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া'র অনুবাদ রূপে প্রচলন করেন। তাতে প্রতীচ্যে 'experimental scientiae'-এর ধারণার উন্মেষ ঘটে। কিন্তু সম্ভবত মুসলিম ঐতিহ্যের প্রভাবের ভয়ে প্রতীচ্যের খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা 'scientiae experimentalis' পরিশব্দটির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীরা এর পরিবর্তে গ্রিক ঐতিহ্যবাহী 'natural philosophy', তথা 'প্রাকৃতিক দর্শন' পরিশব্দ ব্যবহার করতে থাকে। অবশেষে ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীতে তাঁরা অন্যভাবে উদ্‌গত ধর্মযাজকদের ব্যবহার মূলে প্রচলিত 'Science of God' পরিভাষার 'science' শব্দ গ্রহণ করে 'experimental science' নামে বিজ্ঞানের নামকরণ করেন। উনিশ শতকের শেষাংশে 'experimental science'-এর বাংলা অনুবাদরূপে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' পরিভাষার উদ্ভব হয়ে বাংলা ভাষায় তা চালু হয়। সুতরাং ব্যবহারিক বিজ্ঞান যেমন 'Experimental Science' এর অনুবাদ, তেমনি 'Experimental science' তথা 'Scientiae Experimentalis' আরবি 'আল-উলুম অত-তাজরিবিয়া'র ল্যাটিন অনুবাদ।

CamScanner

নির্দেশিকা

১. *Journal of Islamic Administration*, Prof. Abdun Nur ed., Chittagong University, Dept. of Public Administration.Vol. 1. No 1, Winter 1995, pp. 37-48: Dr. Muin-ud-Din Ahmad Khan, "Al-Farabir Rastra Darshan" বাংলা ভাষায় গবেষণা প্রবন্ধ।

২. সেকিউলারিজম ও রিলিজিয়ন (secularism and religion) শব্দ দুটি ল্যাটিন ভাষায় পরস্পর বিরোধী অর্থসূচক। অর্থাৎ যা সেকিউলার তা রিলিজিয়ন নয় এবং যা রিলিজিয়ন তা সেকিউলার নয়। তাই বিশুদ্ধ ও খাঁটি অর্থে বলা হয়ঃ সেকিউলার মানে যা পার্থিব ও ইহকালীন পরকালীন নয় এবং রিলিজিয়ন মানে, যা পরকালীন, ইহকালীন নয়। তাই খ্রিষ্ট ধর্মে বলা হয়ঃ "ইহকালীন ব্যাপারে রোমান সম্রাটকে মান্য করতে ও পরকালীন ব্যাপারে আল্লাহকে মান্য করতে"। অতএব, সেকুউলারিজম মানে ইহকালীনতা ও ধর্মহীনতা। এতে প্রাচ্যদেশীয় সহনশীলতার মাধ্যমে যার যার ধর্ম তার তার পালনের কোন চিন্তা ভাবনা নাই। James Hastings (ed.) *Ency. Of Religion and Ethics,* N.Y. Vol. 11, pp. 347-50: 'secularism' দ্রষ্টব্য। আরো দেখুনঃ *Oxford English Dictionary* ও A. T. Dev এর *English to Bangla Dictionary*; যেখানে A. T. Dev ভুল করে secularism কে 'ধর্মনিরপেক্ষ' অনুবাদ করেছে। বিশ্ব জুড়ে আর কেউ 'ধর্মনিরপেক্ষ' অনুবাদ বা এ অর্থ করে নাই।

৩. Zafar Hasan & C.H. Lai ed. *Ideals and Realities. Selected Easays of Abdus Salam*, Singapore, 1984. Sec: "Science in Islamic Countries" pp. 231-298. Specially p. 262 ff.

৪. প্রাগুক্ত; এবং Abdus Salam: *Notes on Sciences, Technology and Science Education in the Development of the South,* New Delhi, 1989 pp. 17-23.

৫. Charlton T. Lewis *et al* ed.: *A Latin Dictionary* (Founded on Andrew's edn. Of Fround's Latin Dictionary) Oxford, N. Y., 1879, pp. 1642-43.

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪৪।

৮. প্রাগুক্ত।

CamScanner

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪২ এবং *The World University Encyclopedia*, **Vol. 13**, pp. 514-15.

১০. প্রাগুক্ত।

১১. *The Oxford English Dictionary*, Vol. ix, 1961, p. 221.

১২. *Dictionary of Portuguese and English Languages*, Anthony Vieyra, London 1812. See 'science'

১৩. *The Oxford English Dictionary*, প্রাগুক্ত।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. Paul Edwards ed.: *The Encyclopedia of Philosophy*, Collier and Macmillan, U.K., 1967. Vol. 7-8, p. 339.

১৮. উপরে দেখুন।

১৯. উপরে দেখুন।

২০. উপরে দেখুন।

২১. উপরে ১৭ নং টীকা দেখুন।

২২. Charlton: *Latin Dictionary*, *op. cit.* pp. 1642-43.

২৩. *Encyclopedia of Philosophy, op. cit.*, Vol. 3-4 pp. 391-92, and Vol. 1-2, pp. 240-42.

২৪. Ralph Lerner and Muhsin Mahdi ed.: *Medieval Political Thought, a source book*, Canada, 1963, p. 22.

২৫. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক: *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯৯২।

২৬. শ্রীচরণ বন্দোপাধ্যায়: *বাংলা শব্দকোষ*, কলিকাতা, ১৩৩৯ বাংলা সন, পৃ. ২০৮৭-৮৮।

২৭. আশুতোষ দেব: *Students Favourite Dictionary*, বাংলা-ইংরেজি, ১৯৭২, পৃ. ৮৩-৮৪।

CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-উলুম আত্-তাজরিবিয়ার পারিভাষিক বিশ্লেষণ

প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি যে, আধুনিক বিজ্ঞানের নামে প্রচলিত পরিভাষা 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজি ভাষাগত 'এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স'-এর অনুবাদ। আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইংরেজি 'এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স' মূলত: আরবি 'আল-উলুম আত্-তাজরিবিয়া'-এর হুবহু অনুবাদ হিসাবে ল্যাটিন ভাষার 'সায়েন্টে এক্সপেরিমেন্টালিস'-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। তাই এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই যে, মূল আরবি পরিভাষাটিই বাংলা, ইংরেজি, ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় প্রচলিত বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলোর মূল শব্দ।

ইল্‌ম শব্দটির উৎপত্তির মূলে ছিল 'আলম্' মানে চিহ্ন বা নিদর্শন; বিশেষত এমন কোন নিদর্শন যার মাধ্যমে বস্তুটির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। এরূপ নিদর্শনকে আরবি ভাষায় আয়াত এবং আলামতও বলা হয়। তাই নিদর্শন বা আলামত মূলে জানার নাম 'ইল্‌ম'। আয়াতের অর্থ অধিকতর সুদূর প্রসারী।

অতএব, নিদর্শন বা আলামতের মাধ্যমে কোনো বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাকে বৈজ্ঞানিক অর্থে 'ইল্‌ম' বলা হয়। তবে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোন বস্তুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাকেই পরিভাষার দিক দিয়ে 'ইল্‌ম' বলা হয়। তাই সব 'ইল্‌ম' বৈজ্ঞানিক 'ইল্‌ম' নয়; একমাত্র পদ্ধতিগতভাবে লাভ করা ইল্‌মকেই বৈজ্ঞানিক বা তাজরিবি ইল্‌ম বলা হয়। আবার ভাষাগত প্রচলনের দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক ইল্‌ম বা ইল্‌মে তাজরিবাকে সাধারণত বহুবচনে 'উলুম' রূপে আখ্যায়িত করা হয়। সুতারাং পরিভাষিকভাবে বলা হয়: আল-উলুম আল-ফলকিয়াত, আল-উলুম আস-সিয়াসিয়াত। কেননা, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবল একটি 'ইল্‌ম' রপ্ত করে বিজ্ঞানী হওয়া যায় না। বিজ্ঞানে সর্বক্ষেত্রে একাধিক ইল্‌ম রপ্ত করতে হয়।

CamScanner

সার কথা, বিজ্ঞান বহুত্বব্যঞ্জক বিষয়। বিজ্ঞানের জন্য অংক, এলজেবরা, জ্যামিতি এবং সাধারণভাবে পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যয়ন করার পরই যেকোনো একটি বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব। তবে প্রাণিধান যোগ্য যে, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে 'ইল্‌ম' শব্দটি জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি বুঝাবার জন্যে ব্যবহার হতো না। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে আরবি ভাষায় যে কোন বিদ্যা, কলা, দর্শন, জ্ঞান ইত্যাদি বুঝাবার জন্য 'ফিক্‌র্' শব্দটির ব্যবহার হতো। 'ইল্‌ম' শব্দটি কেবল ক্রিয়াগত অর্থে 'জানা' হিসাবে ব্যবহার হতো।[১]

'ইল্‌ম' শব্দটিকে সর্বপ্রথম আল্লাহর রসুল সা. বিজ্ঞানের অর্থে ব্যবহার করেন এবং তাতে বিজ্ঞানের প্রশস্ত তাৎপর্য আরোপ করেন। আসলে তা আল-কুরআনের ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের ভাবধারা থেকে আবির্ভূত হয়। কেননা, আদি পিতা হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করে প্রথমে আল্লাহ তাঁকে রূহানী জীবন দান করেন এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর জীবন রক্ষা ও জীবনোন্নয়নের জন্য তাঁকে 'ইল্‌ম' শিক্ষা দেন। আরবি ভাষায় যেমন, 'ক্বাদ্দারা' মানে কুদরত দান করা, তেমনি 'আল্লামা' মানে 'ইল্‌ম' দান করা। আল্লাহ আদম আ.-কে 'আল্লামা' করে বস্তুসমূহের নামকরণের ইল্‌ম বা বিজ্ঞান শিক্ষা দেন।[২] 'আল্লামাল্ আদামা আস্‌মায়া কুল্লাহা' (সুরা বাকারা, ২: ৩১)।

অনুরূপ ভাবধারায় রাসূলুল্লাহ সা. ঘোষণা করেনঃ প্রত্যেক মুসলিম (নরনারীর) উপর ইল্‌ম (জ্ঞান) অন্বেষণ করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।[৩] তিনি মুসলমানদের প্রতি "দোলনা থেকে কবরের গহ্বর পর্যন্ত" ইল্‌ম (জ্ঞান) অনুসন্ধান করার জন্য আহ্বান জনান।[৪] রসুল সা.-এর যুগে একমাত্র চিন দেশেই বিজ্ঞান চর্চার কার্যক্রম বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন সে যুগে খ্রিষ্টীয় ৬০০ থেকে ৬৫০ সন পর্যন্ত, ৫০ বছর সময় বিজ্ঞানী হুয়ান সাং (Hsuan Tsang)-এর নামে বরাদ্দ করেন, ৬৫০ থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের ৫০ বছর বিজ্ঞানী আই চিং (I-Ching)-এর নামে বরাদ্দ করেন এবং তাদের বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।[৫] আল্লাহর রসুল সা. তাঁর অনুসারীদেরকে "চীন দেশে গিয়ে হলেও ইল্‌ম (জ্ঞান) অন্বেষণের আদেশ দেন"।[৬]

CS CamScanner

আল্লাহর রসুল সা. ইরশাদ করেন: "জ্ঞানের (ইল্‌ম) অন্বেষণকারী আল্লাহর রাস্তায় (বিচরণশীল); তার বহির্গমন থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সে আল্লাহর নিরাপত্তায় অবস্থান করে; সে যদি পথিমধ্যে মারা যায়, সে শহিদ হয়ে যায়"।[৭] হযরত আনাস্ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসুল সা. ইরশাদ করেন: "এমন একটি কামরার মালিক হওয়া যাতে লোকজন শিক্ষা প্রাপ্ত হয় (ইল্‌ম হাছেল করে), তা এমন ব্যক্তির চেয়ে অবশ্যই উত্তম, যে এক পাহাড় স্বর্ণের মালিক হয় এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে"।[৮] আশ্চর্যের কিছু নাই যে, খলিফা হারুন আর-রশীদ ও খলিফা মামুন আর-রশীদ এর দরবারে পণ্ডিতদের পাণ্ডুলিপি সোনার ওজনে গ্রহণ করা হতো।

আমীর আল-জুহনী বর্ণনা করেন যে, রসুল সা. ইরশাদ করেন: "হাশরের বিচারে জ্ঞান (ইল্‌ম) অন্বেষণকারীর কালি এবং শহীদের রক্ত একই সাথে উপস্থিত করা হবে; এর একটি অন্যটির উপরে যেতে পারবে না।"[৯] আল্লাহর রসুল সা. জ্ঞানের (ইল্‌ম) আলোচনাকে আল্লাহর ইবাদতের উপর স্থান দিতেন।[১০] আদতে 'ইল্‌ম' এর জ্ঞানীয় ধারণা আল-কুরআনের মধ্যেই প্রোথিত ছিল। আল-কুরআনের প্রথমে নাযিলকৃত ৫টি আয়াতে বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানীয় পদ্ধতির স্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান, যার পদ্ধতিগত চত্বরে আল্লাহর বাণী মানুষকে সবিস্তারে বুঝানো হয়। এ ৫টি আয়াতে বলা হয়েছেঃ

পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালক প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন!

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে লটকে যাওয়া শুক্রাণু থেকে!

পাঠ করুন; এবং আপনার প্রতিপালক প্রভু মহাসম্মানী!

যিনি কলমের দ্বারা জ্ঞান (ইল্‌ম) শিক্ষা দিয়েছেন!

মানুষকে এমন জ্ঞান (ইল্‌ম) শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে কখনও জানতো না"![১১]

যে রসুল সা.-এর নিকট এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো, তিনি নিজে নিরক্ষর (উম্মী) ছিলেন। তাই অক্ষর জ্ঞানের পড়া এতে ধর্তব্য নয়। অধিকন্তু এতে বলা হয়েছে 'সৃষ্টিকারী' প্রতিপালক প্রভুর নামে পাঠ কর।

CamScanner

অতএব, এতে সৃষ্টিকৌশল পাঠ করার ইঙ্গিত রয়েছে এবং সাথে সাথে বলা হয়েছেঃ কী বিস্ময়করভাবে আল্লাহ বাচ্চাদানীতে লটকে যাওয়া একটি ভ্রুন শুক্রানু+ডিম্বানু= জাইগট থেকে এক দীপ্তিময়, বুদ্ধিমান, বাকশক্তিসম্পন্ন, ভালো-মন্দের পার্থক্যকারী বিচার ক্ষমতাসম্পন্ন, সুন্দর, সাবলীল, সুঠাম মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং প্রথম পাঠের আহ্বান, প্রকৃতি-পাঠ বা আল্লাহর সৃষ্টিকৌশলের পর্যবেক্ষণের আহ্বান ছিল। কেননা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টিকৌশলই সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিষয়বস্তু।

অন্যত্র, আল্লাহ মানুষকে আয়াত বা নিদর্শন পাঠ করতে বলেছেন- দিকচক্রবালে (ফিল-আফাক) এবং অন্তরের অন্তঃস্থলে (ফি আন্‌ফুসিকুম), যাতে সে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুধাবন করতে পারে এবং মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। 'আয়াত' কথাটি 'পর্যবেক্ষণ' সূচিত করে। কেননা, আয়াত মানে নিদর্শন, যা কোন সৃষ্টবস্তু বা পার্থিব বস্তুর মধ্যে দেখা যায়, যা পর্যায়ক্রমে স্রষ্টার দিকে নির্দেশ করে; যেমন, একটি চিত্রকর্ম একজন চিত্র শিল্পীকে নির্দেশ করে; একটি টেবিল কাঠ মিস্ত্রির দিকে নির্দেশ করে; অনুরূপভাবে বিশাল অরণ্যের মন মাতানো গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ এবং মহাসমুদ্রের গর্জনশীল পর্বত প্রমাণ ঢেউ, মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের নীরব সাক্ষ্য বহন করে। মুসলিম জ্ঞান সাধকদের ব্যবহারে 'ইল্‌ম' শব্দটি নিদর্শন ভিত্তিক আয়াতকেই সূচিত করত। তাই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞ পণ্ডিত রজার ব্যাকন যখন ইল্‌ম ও উলুম এর ল্যাটিন অনুবাদ করেন, তখন তিনি sciens (সায়েন্স) শব্দের অবতারণা করেন, যা নিদর্শন এবং আয়াতের দিকেই নির্দেশ করে।

ইক্বরা-এর প্রথম পাঠকে প্রকৃতি-পাঠ বা পর্যবেক্ষণ (observation) রূপে চিহ্নিত করলে (যা 'রাব্বিকা' আল্লাযী 'খালাক' অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন-কথাটি সূচিত করে), ইক্বরা-এর দ্বিতীয় পাঠটি আল্লাহর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিস্তারিত কৌশলের বিশ্লেষণ ও অনুধাবন কার্যকে নির্দেশ করে, যাতে আছে একটি লটকানো শুক্রকীট, মায়ের শরীর থেকে খাদ্য শোষণের প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে কিরূপে সাবলীল মানব শিশুতে পরিণত হয় তার বিশ্লেষণ!

CamScanner

এতে একটি তৃতীয় পাঠও নিহিত আছে, যা লিখন কর্ম এবং পর্যবেক্ষণ ও তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করে হিসাব-নিকাশ 'calculation' এর প্রক্রিয়ার প্রতি নির্দেশ করে। ফল স্বরূপ, চূড়ান্ত পর্যায়ে মহাসম্মানী প্রভু মানুষকে এ প্রক্রিয়ায় অজানাকে জানার জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে, সম্মানিত করেন।

এক কথায়, মহাসম্মানী প্রতিপালক প্রভু মানুষকে (ক) পর্যবেক্ষণ (খ) বিশ্লেষণ (গ) হিসাব নিকাশ ও (ঘ) প্রকৃত জ্ঞান প্রদান করে মর্যাদাবান ও সম্মানিত মানব সত্তায় পরিণত করেছেন।

আদতে জ্ঞান মানে 'অজানাকে জানা', যা হিসাব নিকাশের উপর নির্ভরশীল, হিসাব-নিকাশ বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। অতএব, উল্টা পরিক্রমায়, সরল থেকে ক্রমাগত জটিলের দিকে অগ্রসর হয়ে মুসলিম জ্ঞান সাধকেরা যথাক্রমেঃ পর্যবেক্ষণের 'রিওয়ায়াত', হিসাব-নিকাশের 'দিরায়াত', বিশ্লেষণাত্মক 'জারাহ' বা 'তাজরিবা' বা এক্সপেরিমেন্ট এবং অজানাকে জানার পথে 'তাদীল' বা সমন্বয় এর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জ্ঞান হয় চলমান ও বর্ধনশীল। প্রকৃতপক্ষে বর্ধনশীল। তাই বর্ধনশীলতা জ্ঞানের লক্ষণ এবং স্থবিরতা অজ্ঞানতার প্রতীক। আল কুরআনে মহান আল্লাহ প্রিয়নবী সা.-কে প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন "প্রভু! আমাকে জ্ঞানে বর্ধিত কর"! 'রাব্বী যিদনী ইলমা' (আল কুরআন)।[১২]

একজন কুরআনে নিহিত বিজ্ঞানের গবেষক, মালিক আকবর আলী বলেনঃ "আল-কুরআনে 'ইলম'-এর সাথে 'হিকমত' কে সংযোজন করা হয়েছে বিধায় এ দুটি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থাৎ সূত্রগত প্রজ্ঞার সাথে প্রায়োগিক প্রজ্ঞা।[১৩]

মহানবি সা. হিকমাহ্ বা হিকমতকে অর্থাৎ প্রযুক্তিকে মূল্যবান মুক্তার সাথে তুলনা করেছেন এবং বলেছেনঃ "হিকমাহ হলো বিশ্বাসীদের (হারানো) মুক্তা, যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, তা তার হারানো সম্পদ"।[১৪]

আকবর আলী বিশ্লেষণ করে বলেনঃ ইল্‌ম বা বিজ্ঞান আল-কুরআনে ৯২ টি আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে এবং হিকমাহ বা প্রযুক্তি ৩০ বার উদ্ধৃত হয়েছে। ইল্‌ম এর ৯২ আয়াতের মধ্যে ৩২টি আয়াত ইল্‌ম ধারী ও ইল্‌ম

CamScanner

বিহীন লোকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে, যথাক্রমে চাক্ষুষ্মান ও অন্ধ লোকের সাথে তুলনা করে।

ইল্‌মের ১৯টি আয়াত সমস্ত নবি ও রসুলকে ইল্‌মধারী বলে বর্ণনা করেছে। আর বাকি ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান আল্লাহরই অধিকারে, মানুষকে এর সামান্যই দেয়া হয়েছে। তবে আত্মা ও কাল সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই মানুষকে দেয়া হয়নি বললেও চলে, এ দুটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের চালিকা শক্তি ও গমনপথ এবং যে দুটির মধ্যে মানুষকে ভাসমান করে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে; অধিকন্তু বলা হয়েছে যে, কুরআনকে ইল্‌মে ভরে দেয়া হয়েছে এবং যারা ইল্‌ম অন্বেষণ করে ও ইল্‌ম ধারণ করে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। সত্যিকারভাবে তারাই কুরআনের দৃষ্টান্তগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে।[১৫]

একটি সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা 'দ্য সায়েন্টিফিক ইন্ডিকেশনস ইন দি হলি কুরআন'-এ বলা হয়েছে যে, পবিত্র গ্রন্থের প্রায় এক-অষ্টমাংশ আয়াত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে ব্যাপৃত।[১৬]

সম্প্রতি বাংলাবাজার মদিনা প্রেস থেকে মেজর কাযী জাহান মিয়া কর্তৃক রচিত 'আল-কুরআন দ্য চ্যালেঞ্জ: মহাকাশ পর্ব-এক' এবং 'মহাকাশ পর্ব-দুই' শিরোনামের দুই খণ্ড বিজ্ঞান মনস্ক কুরআন গবেষণার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করার প্রয়াস রয়েছে। আল-কুরআনে বিজ্ঞানের ভূমিকা অনুধাবন করতে গ্রন্থটি পড়ে দেখা যায়।

প্রথম যুগের মুসলমানদের জ্ঞান অন্বেষণের অনুপ্রেরণা

কুরআন থেকে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা ও রসুল সা.-এর উৎসাহ প্রদান, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরকে সাগ্রহে জ্ঞান অন্বেষণে জীবনপণ আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (র.) তাঁর শিষ্যদেরকে রসায়ন বিজ্ঞান বা আলকেমীর প্রথম সূত্র প্রদান করেন বলে প্রবাদ আছে। তাঁর প্রপৌত্র সুযোগ্য ইমাম জাফর সাদিক (র.)-এর শিষ্য জাবির ইবনে হাইয়্যানের প্রচেষ্টায় উক্ত আলকেমীর বৈজ্ঞানিক বিকাশ ফলপ্রসূ হয়।

CamScanner

জাবির ইবনে হাইয়্যান (৭২২-৭৭৭ খ্রি.) তৎকালে প্রচলিত 'ঐন্দ্রজালিক' আলকেমীকে 'তাজরিবা' মূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে একটি প্রকৃষ্ট বিজ্ঞানে পরিণত করেন। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দেন, তারা যেন নিজ হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোন কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ না করে।[১৭]

সম্ভবত: তিনিই সর্বপ্রথম 'তাজরিবা' বা এক্সপেরিমেন্ট পদ্ধতি জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। আরবি ভাষায় 'তাজরিবা' শব্দটি মূলত জারাবা, ইয়াজরিবু অথবা জার্‌রাবা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ দাড়ায় 'ইমতিহান', কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা এবং 'ইখতিবার', সংবাদ যাচাই করে নেয়া, যাকে ইংরেজি ভাষায় Testing ও Probing বলা হয়।[১৮] জাবির 'তাজরিবা'-কে একটি প্রায়োগিক পদ্ধতিতে উন্নিত করে 'এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স' বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সূচনা করেন। তিনি 'তাজরিবী' পদ্ধতি প্রয়োগ করে 'আলকেমি' বা রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রায় দুই হাজার প্রবন্ধ বা 'রিসার্চ পেপার' প্রণয়ন করেন। এগুলোর গুরুত্ব ও পরিসর অনুযায়ী এক-একটি চার থেকে দুইশত পৃষ্ঠা বিস্তৃত। এগুলোকে প্রচলিত আরবি কায়দায় তিনি কিতাব বা পেপার বলে আখ্যায়িত করেন। এগুলোর প্রত্যেকটি নিজ নিজ বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণা কর্ম।[১৯]

তিনি উপদেশ প্রদান করেন: "আলকেমিস্টের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রায়োগিক কাজে ন্যস্ত হওয়া এবং তাজরিবা বা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাওয়া। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ ছাড়া আলকেমিতে কিছুই অর্জন করা যায় না। বৎস্য! প্রত্যেক ক্ষেত্রে তোমার পক্ষে তাজরিবা চালিয়ে যাওয়া বিধেয়, যাতে তুমি বিষয়টি পূর্ণভাবে রপ্ত করতে সক্ষম হও"।[২০]

খ্রিষ্টীয় নয় শতকের প্রথমভাগে, আবু জাফর মুসা আল-খারিযমীর (৮০০-৮৪৭ খ্রি.) হাতে বৈজ্ঞনিক জ্ঞানচর্চা গভীরতর শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়। তাঁর রচিত বিশ্ব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ: 'আল-মুখ্‌তাছার ফি হিসাব আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা', যার অর্থ: হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এলজেবরা ও অংকের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এ গ্রন্থটি সাধারণভাবে 'আল-জাবর ওয়াল-

CamScanner

মুকাবালা' নামে জগত প্রসিদ্ধ এবং এর থেকেই 'এলজেবরা'র উৎপত্তি ও এলজেবরা আর অংকের যুক্ত প্রক্রিয়ার ব্যবহার প্রচলিত হয়, যা বিশ্লেষণাত্মক বিজ্ঞানাদির আংশিক ভিত্তি রচনা করে।[২১]

এলজেবরা ও অংকের যুক্ত প্রয়োগ ব্যতীত বিজ্ঞানের অস্তিত্বই অকল্পনীয়। এ যুক্ত প্রয়োগ পদ্ধতি বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তিমূলক বিপ্লবের জন্ম দেয়।

আরবি ভাষায় 'জাবর' মানে শক্তি, ক্ষমতা, বল, অদৃষ্ট, অর্থাৎ একই শব্দের মধ্যে বিস্তারিত অর্থে ক্ষমতা প্রদান করা অথবা অনুরূপভাবে একটি অক্ষরের মধ্যে প্রতীকীরূপে বিস্তারিত বা প্রশস্ত অর্থ ভরে দেয়া। ইংরেজি ভাষায় এর অর্থ করা হয় "reduction of fraction to integers" এ প্রক্রিয়ায় একটি অক্ষরে সংখ্যা আরোপ করা হয় বা একটি অক্ষরের মধ্যে বিরাট সংখ্যার প্রতীকী ক্ষমতা প্রদান করা হয়।[২২] এটা আল-কুরআনের 'হরফে তাহাজ্জী' থেকে উদ্ভূত।

এলজেবরার মতই-'মুকাবালা' মানে সম্মুখিন হওয়া, মুকাবিলা করা। ইমাম গায্যালী 'আল-মাকাসিদ আল-ফালাসিফা' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'এটা সর্বজন বিদিত যে, জ্যামিতি কোন একক বস্তুর পরিমাপ করে; পক্ষান্তরে অংক বা মুকাবালা একাধিক বস্তুর পরিমাপ করে"।[২৩] তাই অংক হল তুলনামূলক পরিমাপের মাধ্যম।

প্রণিধান যোগ্য যে, এলজেবরা ও মুকাবেলা বা অংক, শব্দদ্বয় খারিযমীর পূর্বসূরীদের নিকট পরিচিত ছিল না। এমনকি 'অংক' শব্দটি মুসলমানেরা বাংলাদেশে নূতনভাবে পত্তন করেছেন। ভারতীয় ভাষায় অংককে গণিত বা হিসাব বলে। আর অংক মানে 'কোল', অর্থাৎ একক, দশক, শতকের কোল ইত্যাদি, যা সংখ্যার স্থানীয় মান সূচিত করে। এটা ছিল মুসলমানদের মুকাবালা জনিত আবিস্কার। তাই এগুলোর মৌলিক আবিষ্কারক হিসাবে খারিযমীকে চিহ্নিত করতে হয়। এটা তৎপূর্ব শতকে জাবির ইবনে হাইয়্যানের প্রযুক্ত তাজরিবা ভাবধারা থেকে উদ্গত।

CamScanner

প্রণিধান যোগ্য যে পরিমাণগত পরিমাপের ক্ষেত্রে এবং বিশুদ্ধ সংখ্যাতত্ত্বের ক্ষেত্রে আল-জাবর ও মুকাবালার প্রয়োগ, যা মুসলমানদের উদ্ভাবিত 'হদদ' ও 'বুরহান' নামক কুরআনী যুক্তিবিদ্যা থেকে উদ্ভুত, তা ছাড়া তাজরিবি বিজ্ঞান বা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স কিছুতেই জন্মলাভ করতে পারতো না।

আল-জাবর ও মুকাবালা বা অংক আবিষ্কারের সুবাদে, মুসলমানরা রাজস্ব কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে এক দশমাংশের হিসাব আশারিয়া বা দশমিক (°), তথা Dccimal এর উদ্ভাবন এবং অনুরূপভাবে 'খিয়ালী নুকতা' বা আংকিক বিন্দু, Mathematical point ও বিয়োগান্ত সংখ্যা, Minus number এর উদ্ভাবন সম্ভব হয়। এগুলো সুনিশ্চিতভাবে মুসলমানদের আবিষ্কার।

খারিযমির সমসাময়িক এবং সহকর্মী আবু ইউসুফ ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী (৮০০-৮৭০ খ্রি.) অংক বিজ্ঞানকে ঔষধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, মানব দেহে ঔষধের দ্বারা সৃষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (stimulus and reaction)-এর একটি নিয়মিত পরিমাপ বের করতে সক্ষম হন। এরই ভিত্তিতে তিনি রোগের চরিত্র পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা পরবর্তী যুগে 'ওয়েভার-ফেকনার ল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২৪] আল-কিন্দি বিজ্ঞান ও দর্শন এর ক্ষেত্রে অংকের প্রয়োগ অপরিহার্য বলে বিবেচনা করেন।[২৫]

আল-কিন্দী 'প্রথম আরব দার্শনিক' নামে পরিচিত। তিনি গ্রিক দর্শনের অনেক গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবি ছাড়াও তিনি গ্রিকভাষা, ফার্সিভাষা এবং কোনো কোনো ভারতীয় ভাষা জানতেন। তিনি মৌলিক গবেষণা ভিত্তিক বিপুল সংখ্যাক গ্রন্থ রচনা করেন।[২৬] ইউরোপীয় মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ রোবার্ট গ্রসেটেস্ট (Robert Grosseteste) এবং রজার ব্যাকন (Roger Bacon) আল-কিন্দীকে অপটিক্স বা আলোক বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ বা অথরিটি রূপে স্বীকার করেন। তাঁর প্রায় পঁয়ত্রিশটির মত গ্রন্থ মূল আরবি ভাষায় বিলুপ্ত হলেও এগুলোর ল্যাটিন অনুবাদ পাওয়া গেছে। তাঁর রচিত পুস্তকের সংখ্যা ২৫০ বলে ধারণা করা হয়।[২৭]

CamScanner

আবু নছর আল-ফারাবি (৮৭০-৯৫০ খ্রি.) ছিলেন আল-কিন্দির সুযোগ্য উত্তরসূরী। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, অংকবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ, ও ভাষাবিদ। অংকের ক্ষেত্রে তিনি 'লগারিদম'-এর হিসাব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।[২৮]

পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রফেসর আবদুস সালাম, আল-কিন্দীকে উদ্ধৃত করে বলেন: "আল-কিন্দির মতে, অতএব, এটা সমুচিত যে, সত্য গ্রহণ করতে কখনো লজ্জাবোধ করতে নাই এবং যে কোনো দিক থেকেই আসুক না কেন, সত্যকে সর্বাবস্থায় গ্রহণ করা চাই। কেননা, যে ব্যক্তি সত্যে আরোহন করে, তার জন্য সত্যের উর্ধে অন্য কোন মূল্যবোধ হতে পারে না। সত্য কখনো সত্যের অনুসন্ধানীকে তুচ্ছ বা হেয় প্রতিপন্ন করে না"।

আবদুস সালাম বলেন: "তবে খ্রিষ্টীয় চৌদ্দ শতক নাগদ, 'সত্য যেখানেই পাও অর্জন কর' জনিত আল-কিন্দির ঐতিহ্য মুসলিম পণ্ডিতগণ ভুলে বসেছিল এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের সাথে কোন প্রকার সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী ছিলনা, যদিও তখন পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানচর্চা সৃজনশীল হয়ে উঠেছিল। অনীহা তাদেরকে একঘরে করে বসায় ও বিচ্ছিন্নতা তাদের মধ্যে বিজ্ঞানের মৃত্যু ডেকে আনে"।[২৯]

আদতে, আল-কুরআন মুসলমানদের মনোভাবে পর্যবেক্ষণের অনুপ্রেরণা প্রোথিত করে। তাদেরকে গভীরতর চিন্তা ও অনুধাবনের পথ প্রদর্শন করে। আল-কুরআনের ভাষায় স্রষ্টা, প্রতিপালক প্রভু, আল্লাহ বলেন: "আমি তোমাদেরকে দিকচক্রবালে ও অন্তরের অন্তঃস্থলে আমার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করব, যাতে তোমরা সত্য উপলব্ধি করতে পার"।[৩০]

অতএব, বহির্জগতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং অন্তর জগতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যখানে সত্যকে উদঘাটন করার জন্যে মানব বুদ্ধির সচেতন পদচারণা এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে যতটুকু জ্ঞান মানুষ আহরণ করতে সক্ষম ততটুকু পূর্ণ উদ্যমে আহরণ করার জন্য আত্মনিবেদিত হতে আল-কুরআন মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।

CamScanner

খ্রিষ্টীয় নবম শতকে মুসলমানদের জ্ঞানীয় তৎপরতার বিবরণ দিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফারায বলেন: "এ জ্ঞান সন্ধানীগণ তাদের অভিষ্ট লক্ষার্জন থেকে অজানার পথে অগ্রসর হয়ে পর্যায়ক্রমে প্রকৃতির গোপন তত্ত্ব উদ্ঘাটন করার প্রতি আত্ম-নিবেদিত ছিলেন। তাদের কেহই তাজরিবার (এক্সপেরিমেন্টের) বহির্ভূত কোন জ্ঞানকে বিশ্বাস বা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।[৩১] "

আল-কিন্দি ঐ যুগের গবেষক, যিনি ঘোষণা করেন যে, অংকের প্রয়োগ ছাড়া দর্শন বা বিজ্ঞান কোনটিই সফলতা অর্জন করতে পারে না। তিনি বিজ্ঞানের শ্রেণি বিভাগের উপর 'কিতাব ফি মাইয়াতুল ইলম ওয়া আকসামুহা', অর্থাৎ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্য একটি গ্রন্থের নাম হল 'কিতাবু আকসামিল ইলমুল ইনসী' অর্থাৎ মানবিক বিজ্ঞানের শ্রেণি বিভাগ।[৩২]

এরপরে আল-ফারাবি (৮৭০-৯৫০ খ্রি.) রচনা করেন: 'আল-ইহছা-উল-উলুম', অর্থাৎ বিজ্ঞানাদির পরিগণনা। অতপর তাঁর উত্তরসুরী ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) 'কিতাব ফি আকসাম উল-উলুম আল-আকলিয়া' অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানসমূহের শ্রেণি বিভাগ-বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে সিনাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতারূপে বিশ্বজনীনভাবে সবাই স্বীকার করে থাকে।[৩৩]

এ সময় তাজরিবা বা এক্সপেরিমেন্টাল পদ্ধতি এতই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ইরানের যুগ-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-দার্শনিক-নীতিশাস্ত্রবিদ ইবনে মিসকাওয়াই (৯৩২-১০৩২ খ্রি.) তাজারিব-উল-উমাম (অর্থাৎ 'জাতিসমূহের জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতা বা তাজরিবাসমূহ)' নামের বৃহৎ দুইখণ্ডে একটি বিশ্বজনীন ইতিহাস রচনা করেন। এতে তিনি নানা জাতির বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সংযোজন করেন এবং বিষয় ও ঘটনাবলিকে এমনভাবে সাজিয়ে দেন, যাতে কার্য-কারণের তুলনা করে, সাদৃশ্য পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বিগত দিনের মত সুফল-কুফলের ঘটনা বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও ঘটবে বলে অনুমান করা যায়।[৩৪]

CamScanner

খ্রিষ্টীয় দশ-এগারো শতকের যুগ সম্বন্ধে মন্তব্য করে প্রফেসর আবদুস সালাম বলেন, "নিঃসন্দেহে ১০০০ সনের আগে-পরের যুগটিই ইসলামের ইতিহাসে বিজ্ঞান চর্চার সোনালী যুগ ছিল। এটা ছিল ইবনে সিনার যুগ, যাকে পাশ্চাত্যের লোকেরা Avicenna নামে পরিচয় দিত এবং যিনি ছিলেন মধ্যযুগের প্রান্তিক বিজ্ঞানী ও তাঁর সমসাময়িক ইবনে হায়ছম ও আল-বিরুনী থেকে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।[৩৫]

আরবি পরিভাষা: আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া

সুতরাং আরবি পরিভাষায় আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া খ্রিষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' রূপে পরিচিতি লাভ করে এবং এ সুবাদে ইউরোপীয় অনুসন্ধানীদেরকে তা ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করার সুযোগ করে দেয়। রজার ব্যাকন খ্রিষ্টীয় ১৩ের শতকে এর ল্যাটিন অনুবাদ করেন 'Scientiae Experimentalis' এবং তা থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজি অনুবাদ হয় 'Experimental Sciences' অতপর যেমন আমরা উপরে দেখেছি ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ হয় 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান'। অতএব, নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আরবি ভাষায় ইল্‌ম ও উলুম, তথা বিজ্ঞান এর পরিশব্দটি চয়ন করার অনুপ্রেরণা সপ্তম শতকে রসুলুল্লাহ সা. কর্তৃক মুসলমানদের অন্তরে জাগরুক করা হয়েছিল এবং উৎসমূলে তা আল-কুরআন থেকে সংগৃহীত হয়েছিল।

মালিক আকবর আলী বলেন, "আল-কুরআন মানুষকে পর্যবেক্ষণ করতে, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে, আকল বা যুক্তির আশ্রয় নিতে এবং অনুধাবন করে সত্য উপলব্ধি করতে বারংবার আহবান করে"।[৩৬] এর পরিপ্রেক্ষিতে আল-কুরআন, সৃষ্টিজগতে আল্লাহর সৃষ্টিকৌশল বা আয়াতের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আয়াত এর অর্থ চিহ্ন, আলামত, প্রতীক, সূচিতকরণ বা গুরুত্বের ভিত্তিভূমি, যা চূড়ান্তভাবে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর দিকে নির্দেশ করে। আয়াতের উপর গবেষণা করতে ও গভীর অবিনিভেশে অধ্যয়ন করার আহবান মানে, জড় জগতের বিভিন্ন বস্তুর

CamScanner

গুণাগুণ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ এবং যে সব প্রাকৃতিক নিয়ম এগুলোকে পরিচালিত করছে এগুলো আবিষ্কার করা, যাতে করে তারা এগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে এবং এগুলোর পর্যাপ্ত জ্ঞান আহরণ করে সৃষ্টির নিদর্শন মূলে স্রষ্টাকে জানতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ আরো বলেন যে, তিনি পৃথিবীর সমস্ত কিছু কেবল মানুষের জানার জন্য নয়, বরং তদুপরি মানুষের ব্যবহারের ও উপকারের জন্য এবং মানুষের আদেশ পালনকারীরূপে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, জ্ঞান অন্বেষণ করা মানুষের জন্য কেবল প্রতিযোগিতামূলক নয়, বরং তাদের কল্যাণে মৌলিক চাহিদা পূরণের অপরিহার্যতাও তাতে বিদ্যমান, যা পরস্পর সহযোগিতামূলক অবিরত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে।

মালিক আকবর আলী এ মতের পক্ষে ৪২টি কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেন, যেগুলোতে মানুষকে ইতিহাসের নানা ঘটনার আদ্য-অন্তের বিষয়ে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে বলা হয়েছে এবং তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজেদের মনোভাব ও কর্মধারাকে সংশোধন করতে আহবান করা হয়েছে।[৩৭]

সার সংক্ষেপ ও উপসংহার

সংক্ষেপে বলা যায়, সায়েন্স বা বিজ্ঞান হল একটি পারিভাষিক শব্দ যা ল্যাটিন ভাষার 'Scientiae Experimentalis' এবং ইংরেজি 'Experimental Science' এর অনুবাদ ও প্রতীক হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। মূলত এ শব্দটি আরবি 'আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া'র অনুবাদ এবং বাংলা পরিশব্দটি হল 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান।'

'ইল্‌ম' শব্দটি 'উলুম' শব্দের একবচন, যা ইসলামের অভ্যুদ্বয়ের পূর্বে আরবি ভাষার একটি ক্রিয়াবাচক শব্দ ছিল এবং সরলভাবে কেবল 'জানা' (know) বুঝাতো। কুরআন এ শব্দটিকে সর্বপ্রথম 'জ্ঞান' অর্থে ব্যবহার করে এবং রসূলুল্লাহ সা. ইল্‌ম এর এই নূতন জ্ঞানীয় অর্থটিকে চিরস্থায়ী রূপ

প্রদান করেন। ফলে 'ইল্ম' শব্দটি ক্রমশ: 'বিজ্ঞান' এর অর্থবহ রূপ ধারণ করে।

অধিকন্তু চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর রা. প্রজ্ঞামূলে, তার প্রপৌত্র ইমাম জাফর সাদিক (র.)-এর অনুপ্রেরণা মূলে, তাঁর শিষ্য জাবির ইবনে হাইয়্যানের হাতে 'ইল্ম' শব্দটি তাজরিবার সাথে যুক্ত হয়ে, বহুবচনে 'আল-উলুম আত-তাজরিবিয়া' রূপে প্রতিভাত হয় এবং তা ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের মৌল পরিশব্দে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, জাবির এর উত্তরসূরী খারিযমী এলজেবরা ও অংক আবিষ্কার করে, উভয়ের যুক্ত ব্যবহারের দ্বারা তাজরিবী বিজ্ঞানের বিপ্লবাত্মক উন্নতি সাধন করেন। আল-কিন্দী, তদুপরি ঔষধি, জ্যোর্তির্বিদ ও পদার্থ বিদ্যার উপর অংকের প্রয়োগ করে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের পরিসর বর্ধিত করেন এবং বিজ্ঞানকে মানব জীবনের উন্নয়নের পথে চলমান উপকরণে পরিণত করেন।

অবশেষে আল-ফারাবী, ইবনে মিস্কাওয়াই, ইবনে সিনা, ইবনে হায়সম ও আলবিরুনী প্রমুখের হাতে দশম ও একাদশ শতকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সোনালী শিখরে উন্নীত হয়। খ্রিষ্টীয় তের শতকে আরবি ভাষা ও আরবি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উক্ত অভাবনীয় উন্নয়নের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে ক্রমশ: আরবি থেকে ল্যাটিনে অনুবাদের মাধ্যমে তাজরিবী বিজ্ঞান আয়ত্ত করেন।

সুতরাং সায়েন্স বা বিজ্ঞান গ্রিক দর্শনের দ্বারা অথবা রোমান চিন্তা-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি; এতে পাশ্চাত্যের গ্রিক সভ্যতার লেশমাত্র প্রভাবও নাই। বরং এটা একটি কুরআনের অমূল্য উপহার, রসুল সা.-এর অনুশীলন এবং মুসলিম জ্ঞান অনুসন্ধানীদের আত্ম-নিবেদিত অবদান।

CS CamScanner

নির্দেশিকা

১. Edward William Lane: An Arabic-English Lexicon, Beirut, 1968. p. 2140.

২. সামনে বিশ্লেষণ দ্রঃ।

৩. মিশকাত আল-মছাবিহ, 'কিতাব আল-ইলম' হাদিস নং ২০৭।

৪. ঐ, হাদিস নং ১৯৩, ২০২, ২০৩, ২১১।

৫. Zafar Hasan & C. H. Lai ed.: Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus Salam, Singapore. 1984. P. 139; George Sarton: Introduction to the History of Science. Baltimore, U.S.A. 1962, Vol. I. pp. 640 ff. and 188.ff.

৬. It may be noted that the authenticity of this Hadith could not be traced to the written authentic compendia of Hadith literature: yet it is a most widely publicised traditon, even quoted by Al-Ghazzali, see Mauricc Bucaille: The Bible, the Quran and Science. P.106. Nevertheless it is confirmed by dirayah.

৭. মিশকাত, ঐ হাদিস নং ২০২, ২০৩, ২০৯।

৮. ইমাম ফখরউদ্দীন রাযীঃ তাফসীর আল কবীর, ২য় খং, পৃ. ১৭০।

৯. ঐ।

১০. মিশকাত, ঐ, হাদিস নং ২৩৮: ইবাদতের উপরে জ্ঞান অন্বেষণের মাহাত্ম্য।

১১. সুরা আলাক, ৯৬: ১-৫।

১২. সুরা ত্বহা,২০: ১১৪।

১৩. M. Akbar Ali: "The Quran as a Source of Science" Lecture delivered at Baitush Sharaf Islamic Research Institute, Chittagong on 26 Sept. 1985. pp. 11-12: and his 'Science in the Qur'an' Dhaka, 1976, pp. 1-17.

১৪. মিশকাত, ঐ, হাদিস নং ২০৫।

১৫. উপরে ১৩নং টীকা দ্র.।

১৬. Scientific Indications in the Holy Quran, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1990, p. xi.

১৭. মালিক আকবর আলীঃ জাবির ইবনে হাইয়ান, ইসলামিক ফাউন্ডেশেন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ২০ এবং আব্দুল মওদুদঃ মুসলিম মনীষা, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৩।

১৮. Edward William Lane: Arabic English Lexicon, Beirut, 1964, Book 1, p. 403. এবং আল-মুনজাদ, বৈরূত, ১৯৪১, পৃ. ৮২।

১৯. উপরের টীকা নং ১৭, পৃ. ৩০ ও ৪৫।

CS CamScanner

২০. ঐ, পৃ. ৪৫।

২১. ইসলামি বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, Vol. 9, pp. 429-32; এবং এম. আকবর আলী: বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, Vol. 1, Calcutta, 1943, pp. 43-76.

২২. J. Richardson: Dictionary: Persian, Arabic and English, London, 1806, p.101: AL-Jabr = Algebra, p. 335: jabr-power, force, violence. The reduction of fractions to integers in arithrnatic, hence al-jabr = algebra.

২৩. Al-Ghazzali: Maqasid al-Falasifa, preface.

২৪. ড. রশীদুল আলমঃ *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, বগুড়া, ১৯৮৪ খ্রি., পৃ. ৩১৫; এবং ইসলামি বিশ্বকোষ, Vol. 8, 1990, p. 66.

২৫. ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

২৬. ঐ, পৃ. ৬৬।

২৭. এম. আকবর আলীঃ *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, প্রাগুক্ত, দেখুন: আল-কিন্দী।

২৮. লগারিথম (Logarithm) একটি আরবি শব্দ, মূল শব্দ ‘লগউন’ থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ হল ‘superfluous’ বা বাহুল্য; ‘ইফ্য়াল’ এর ‘ওজনে’। যখন এটাকে ‘ইল্গা’ করা হয়, এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ বাহুল্যতা দূরীভূত করে, মৌলিক বস্তুকে সংরক্ষণ করা; এর থেকে - বিয়োগ + যোগ প্রক্রিয়া, যথা ‘log-antilog’, যার হিসাব-নিকাশকে নামকরণ করা হল: لغارثم, logarithm.

২৯. Zafar Hasan and C.H. Lai ed. Ideals and Realities: Selected Easays of Albus Solam, Singapore, 1984, chap, V: Science in Islamic countries, pp. 244-45; এবং ইসলামি বিশ্বকোষ, Vol. 8, p.66.

৩০. সুরা নজম, ৫৩: ২৮।

৩১. আবদুল মওদুদ: মুসলিম মনীষা, প্রগুক্ত পৃ. ১৩।

৩২. George N. Atiyeh: Al Kindi, The Philosopher of the Arabs, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, 1966, p. 153, No. 3, and p. 154, No. 5.

৩৩. Ralph Lerner and Muhsin Mahdi ed. Medival Political Thought: a source book, Canada, 1963, p. 22ff.

৩৪. Ibn Miskawlyh: Tajarib al-Umam, A. Enami ed, Tehran, 1987, 2 Vols. See preface.

৩৫. Ideals and Realities, op. cit, pp. 264-65.

৩৬. M. Akbar Ali: Science in the Quran, Dhaka, 1979, Preface p. xix; and Mourice Boucaille: the Bible, The Quran and Science, p.136 ff.

৩৭. Ibid, p. 53.

CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়

বিজ্ঞানের পর্যায়ক্রমিক উত্থান-পতনের ইতিহাস

প্রকৃতির নিয়মে, ইতিহাসে উন্নতি-অবনতির পালাবদল হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসেও একই নিয়ম দেখা যায়। আধুনিক যুগের একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ সার্টন, এক-একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের নামে ৫০ বছর বরাদ্দ করে, বিজ্ঞানের ইতিহাসকে পর্যায়ক্রমে বিভক্ত করেন এবং বৃহৎ পাঁচ খণ্ডে একটি অনন্য ইতিহাস রচনা করেছেন। তাঁর তথ্য-উপাত্তের বিস্তারিত বিবরণের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে, নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী প্রফেসর আবদুস সালাম বলেন: সার্টন খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০-৪০০ বছরের পঞ্চাশ বছরী যুগটি প্লেটোর যুগ নামে অভিহিত করেন, ৪০০-৩৫০ বছরের যুগ এ্যারিস্টটলের নামে, ৩৫০-৩০০ বছরের যুগ ইউক্লিডের নামে এবং ৩০০-২৫০ বছরের যুগ আর্কিমিডিস এর নামে বরাদ্দ করেন এবং এরূপে অগ্রসর হয়ে খ্রিষ্টিয় ৭৫০ থেকে ১১০০ পর্যন্ত বছরী যুগগুলো অবিচ্ছিন্নভাবে একালের যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীবৃন্দ: জাবির, খারিযমী, রাযী, মাসউদী, আবুল ওয়াফা, আলবেরুনী ও ওমর খৈয়াম এর নামে বরাদ্দ করেন। এর অবিচ্ছিন্ন ৩৫০ বছরের ৭টি ৫০ বছরী যুগে, আরব, তুর্কি, আফগান, ইরানী রসায়ন বিজ্ঞানী, এলজেবরাবিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী (ক্লিনিসিয়ান্স্), ভূগোলবিদ, অংকবিদ, পদার্থ বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদবৃন্দ, ওরা সবাই ইসলামি বিশ্বসমাজভুক্ত জ্ঞানতাপস, বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ বিশ্বমঞ্চে সমাসীন ছিলেন।[১]

বিজ্ঞানের ইতিহাসে উপরে উদ্ধৃত উন্নত যুগগুলোর বিপরীতে দুটি প্রলম্ব অবনতির যুগও পরিলক্ষিত হয়। এ দুটি অবনতির যুগকে কালোযুগ রূপে আখ্যায়িত করা যায়। এর একটি ছিল খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং অন্যটি ছিল খ্রিষ্টিয় তেরো শতক থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

CamScanner

সার্টনের মাপকাঠিতে উক্ত প্রথম কালোযুগের সূচনা হয় গ্রিক গবেষক আর্কিমিডিসের মৃত্যুর সময় থেকে (খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০) বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে প্রথম নিরেট কালোযুগ প্রায় ৫০০ বছর স্থায়ী হয়। অতঃপর চিনদেশীয় বিজ্ঞানী, হোয়ান সাং (Hayan Tsang) এর ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে উত্থান ঘটে।[২]

দ্বিতীয় কালোযুগের জন্য বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানের ইতিহাস গবেষক, মালিক আকবর আলী উপরোক্ত মুসলিম বিজ্ঞানীদের যুগোত্তর কালে, অর্থাৎ ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীতে, মুসলিম জ্ঞানীসমাজের বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা খ্রিষ্টান জগতের বিরাগভাজনতাকেই দায়ি করেন। তিনি বলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জ্ঞানীগুনীদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি অনুরাগহীনতা ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে বিজ্ঞানের এই দ্বিতীয় অন্ধকার যুগ ১১০০ থেকে ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ শত বছর ধরে বিরাজমান থাকে। এক্ষেত্রে মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন বা ব্লাড সার্কুলেশন এর সূত্রের পটভূমি বিশ্লেষণ করে তিনি একটি মনোজ্ঞ দৃষ্টান্তমূলক বিবরণ প্রদান করেন।

তিনি আল-কুরআনের ১৬ নং সুরা নাহল এর ৬৬ নং আয়াত উদ্ধৃত করে দেখান যে, এতে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে। এতে বলা হয়:

> "অবশ্যই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু" (সুরা আন নাহল, ১৬: ৬৬)।

তিনি বলেন, "এ আয়াতটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, আমাদের জানতে হবে, কিরূপ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া অন্ত্রের মধ্যে সংঘটিত হয় এবং তাতে কিরূপে খাদ্য থেকে আহরিত দ্রব্যগুলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে এবং কিরূপে শরীরে প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্তধারা তা সঞ্চালিত করে; এর মধ্যে মুখ্য স্থান দখল করে রয়েছে দুগ্ধ প্রস্তুতকারী মাম্মারী গ্লান্ড। তাতে রক্ত সঞ্চালনের জটিল ব্যাপারটি একটি নেহাত ক্ষুদ্র বিষয়। প্রশ্ন হলো: শরীরে রক্ত কিভাবে সঞ্চারিত হয়"?

CamScanner

"খ্রিষ্টিয় তেরো শতকে মুসলিম চিকিৎসাবিদ ইবনে নাফিস সর্বপ্রথম রক্ত সঞ্চালনের (Blood Circulation) বিষয় আবিষ্কার করেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীরা গ্রহণ বা অনুসরণ করেন নি"।

"তখনকার যুগের মুসলিম ধর্মবিদ আলেমগণ বিজ্ঞানের বিষয়ের সাথে অথবা বিজ্ঞানীদের সাথে সামান্যই জড়িত ছিলেন। তাঁরা খ্রিষ্টান পাদুরীদের (ধর্মবিদ) মত এ বিষয়ের বৈধতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে আল-কুরআনের সাথে এর সংগতি পরীক্ষা করে দেখার প্রতিও উৎসাহ বোধ করেন নি"।

"তিনশত বছর পরে ইবনে নাফিসের এই ধারণাটি মাইকেল সার্ভেটাস (Michael Servetus) কর্তৃক পুনরুত্থাপন করার ফলে, সে যুগের খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা তাঁকে ধর্মদ্রোহী বা heretic ঘোষণা করে এবং স্টেকের ফাঁসির খুঁটিতে লটকায়ে জীবন্ত দগ্ধ করে"।

"তবে খ্রিষ্টিয় সতেরো শতকে চিকিৎসা বিজ্ঞানী, উইলিয়াম হার্ভে (William Harvey) বিষয়টি পুনরায় উপস্থাপন করেন। যেহেতু এটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রমাণিত ছিল, এটা তাঁর সমসাময়িক চিকিৎসাবিদগণ গ্রহণ করেন। তাতে বুদ্ধিবৃত্তিক জগত রক্ত সঞ্চালনের বিষয়টি হৃদয়ংগম করতে সমর্থ হয়"।

তিনি অতঃপর মন্তব্য করেনঃ "আমরা আল-কুরআনে দুগ্ধের উপাদানের উৎসের বিবরণ পাঠ করি এবং মাম্মারী গ্রেন্ডের দিকে এটার সঞ্চালণের পদ্ধতি সম্বন্ধেও অবহিত হই, যাতে রক্ত সঞ্চালনের কথা আপনিতেই এসে যায়। কিন্তু মুসলমানেরা তা বুঝে উঠতে অপারগ হয়। এটা অমুসলিম বিজ্ঞানীরা আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ৯০০ বছর পরে প্রমাণিত করে"।[৩]

অনুরূপভাবে কপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রি.), কেপলার (১৫৭১-১৬৩০ খ্রি.) এবং গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রি.)- কে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে শাস্তি ও অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছিল –তাঁদের বৈজ্ঞানিক থিওরি বা সূত্রগুলো পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের নিকট গ্রহণ করার ওকালতি করার জন্যে, যেগুলোর কোনো কোনোটি খ্রিষ্টান জগতে

CamScanner

প্রচলিত ধর্মীয় ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। একটি দৃষ্টান্তমূলক আহবানে গ্যালিলিও তাঁর সমসাময়িক লোকদের নিকট অনুনয় করে বলেন:

> "আমাদের চোখের সামনে সদা-বিদ্যমান মহা-বিশ্বের মহাগ্রন্থ অঙ্কের ভাষায় লিখা, যাকে আমরা দর্শন (তথা বিজ্ঞান) বলি। কিন্তু এ মহাগ্রন্থ, প্রথমে এটার নিজস্ব ভাষা বুঝতে চেষ্টা না করলে এবং তার নিজস্ব অক্ষর জ্ঞান অর্জন না করলে, তা অধ্যয়ন করা যাবে না। এর বর্ণমালা ত্রিভূজ, বৃত্ত ও অন্যান্য জ্যামিতিক আকার-আকৃতি, যেগুলো আয়ত্ব করা ছাড়া এর একটি শব্দও বোধগম্য হবে না। এই আংকিক ভাষা আয়ত্ব করা ছাড়া, এ মহাবিশ্বের মহাগ্রন্থ অধ্যয়নের চিন্তা অলীক অন্ধকারে পদচারণা করার সমতুল্য"।[৪]

তবুও তিনি একথা বলার সাহস করেননি যে, আরবি গণনা ও মুসলমানদের অংক-এলজেবরা আয়ত্ব করা ছাড়া বিজ্ঞানের দিকে পা বাড়ানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ কথাগুলো তিনি বলেন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের রোষ প্রশমিত করার লক্ষে, যাতে তাঁরা অঙ্ক শিক্ষার অনুমতি দিতে রাজি হয়; কেননা,তখন তা আরবি গণনা পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত ছিল। পাশ্চাত্যে এক-দুই-তিন-চার ইত্যাদি গণনা আরবি থেকে আহরিত বলে এ গণনা পদ্ধতিকে 'এ্যারাবিক নিউমার‍্যাল' বলা হয়। তখনকার দিনে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের মনে এলজেবরা, অঙ্ক, আরবি সংখ্যা আতংকের সৃষ্টি করত এই ভেবে যে, পাছে এসব শিখে খ্রিষ্টানেরা ইসলামের সংস্কৃতির দ্বারা কলুষিত হয়ে না পড়ে!

খ্রিষ্টিয় আঠারো শতকের মুসলিম বিশ্বে, বিজ্ঞানচর্চার যৎসামান্য স্ফুলিংগ তখনও বিদ্যমান ছিল, তা আঁচ করে প্রফেসর আবদুস সালাম বলেন:

> "সাতশত পঞ্চাশ বছর পূর্বে, একজন স্কটল্যান্ডের যুবক তার নিজ পাড়া গাঁ ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে স্পেনের

টলেডোতে গিয়ে উপনীত হয়। তার নাম ছিল মাইকেল (Michael)। তার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা ছিল সে যুগের টলেডো ও কর্ডোভাস্থ আরব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা, যেখানে মধ্যযুগের যুগশ্রেষ্ঠ ইহুদি অধ্যাপক মুসা বেন মায়মুন এক প্রজন্ম পূর্বে অধ্যাপনা করেন"।

"টলেডো পৌঁছে ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে, টলেডোতে অবস্থানকালে মাইকেল ল্যাটিন ইউরোপের নিকট এ্যারিস্টটলকে উপস্থাপন করার পরিকল্পনা করে। তবে, মৌল গ্রিক ভাষা থেকে নয়, তা সে জানতোনা: বরং আরবি ভাষা থেকে, যা তখন স্পেনে শিক্ষা দেয়া হতো। টলেডো থেকে মাইকেল সিসিলীতে গিয়ে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের দরবারে উপস্থিত হয়"।

"সেখানে স্যালার্নো চিকিৎসা বিদ্যালয় পরিদর্শন করলে, তাকে সিসিলীয় সম্রাট ফ্রেডারিক ১২৩১ সালে একটি রাজকীয় চার্টার প্রদান করেন। তথায় তিনি ডেনিস চিকিৎসাবিদ হেনরিক হার্পেস্ট্র্যাং এর (Henrik Harpestraeg)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এই হেনরিক পরবর্তীতে রাজা এ্যারিক চতুর্থ ওয়াল্ডেম্যাসন (King Arik iv Waldemasson)-এর রাজকীয় চিকিৎসক নিযুক্ত হন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে হেনরিকের জ্ঞানের উৎস ছিল ইসলামের বড় বড় চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের 'কানুন' (Canon), যথা- আল-রাযী ও ইবনে সিনা কর্তৃক রচিত কানুনাদি, যেগুলো একমাত্র মাইকেল স্কটই তাঁর জন্য অনুবাদ করতে সক্ষম ছিল"।

"টলেডো ও স্যালার্নো বিদ্যায়তনদ্বয়ে, যেহেতু প্রথম স্তরের আরবি, গ্রিক, ল্যাটিন ও হিব্রু জ্ঞানভান্ডারের সমন্বয় ছিল, তাই এগুলো আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানচর্চার স্মরণীয় যোগাযোগ ও সহযোগিতার কেন্দ্র ছিল। টলেডো ও স্যালার্নোতে জ্ঞান আহরণের জন্য কেবল সে যুগের পূর্বাঞ্চলের ধনাঢ্য দেশসমূহ, যথা- সিরিয়া, মিসর, ইরান ও আফগানিস্তান থেকে শিক্ষার্থীর আগমন হতো না, বরং সে যুগের উন্নয়নশীল পাশ্চাত্যের দেশসমূহ, যেমন স্কটল্যান্ড ও স্কান্ডিনোভিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা এগিয়ে আসতো"।

CS CamScanner

"সে যুগে এ যুগের মতো বিজ্ঞানচর্চার এসব আন্তর্জাতিক স্রোতধারায় জ্ঞান আহরণের তৎপরতা চালিয়ে যাবার পথে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বুদ্ধিগত পশ্চাৎপদতা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত। মাইকেলের মতো স্কটল্যান্ডবাসী বা হেনরিক হার্পেস্ট্র্যাং এর মতো ডেনিস ছাত্র কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। তারা তাদের দেশের কোন সমৃদ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করত না। সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তাদের শিক্ষকেরা টলেডো বা স্যালার্নোতে তাদেরকে উন্নত বিজ্ঞান গবেষণায় শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেয়ার যৌক্তিকতা ও যথার্থতার মূল্যমানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করত। অন্ততঃ যুবক মাইকেল স্কটের একজন শিক্ষক তাকে দেশে ফিরে গিয়ে মেষের লোম সংগ্রহ করে উলের কাপড় বুননের পরামর্শ দেন"।[৫]

অতঃপর মুসলিম বিজ্ঞানীদের উজ্জ্বল বিজ্ঞানচর্চার ৭৫০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণচক্র বিবেচনা করে এবং তাদের পর্যায়ক্রমিক অবনতি ও শেষ পর্যন্ত ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীতে তাদের বিজ্ঞানচর্চার স্তিমিত অবস্থা অনুধাবন করে, প্রফেসর আবদুস সালাম বিংশ শতকের পাশ্চাত্যের দোরগোড়ায় উপনীত হন এবং বলেন:

"এ পর্যায়ে আমরা বর্তমান শতাব্দীতে (বিংশ শতাব্দীতে) এসে উপনীত হই, যখন মাইকেল স্কট যে চক্রের সূচনা করেছিল তা পূর্ণচক্র ঘুরে আসলো এবং এখন আমরা ইসলামি বিশ্বে ও আরব দুনিয়াতে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতার পথে পা পাড়াবার চেষ্টা করছি"।

তিনি বলেন, "এগারো শত বছর পূর্বে আল-কিন্দী লিখেছেন: অতএব, আমাদের উচিত সত্যকে স্বীকৃতি দিতে লজ্জিত না হওয়া এবং যে কোনো উৎস থেকেই আসুক না কেন, সত্যকে গ্রহণ ও আত্মস্থ করতে ইতস্তত না করা। যে ব্যক্তি সত্য নিরূপণ করে, তার নিকট সত্যের উর্ধ্বে কোন মূল্যবোধ নাই। সত্য যারা অন্বেষণ করে, সত্য তাদেরকে কখনও অবমূল্যায়ন করে না অথবা হেয় প্রতিপন্ন করে না"।

তিনি বলেন, "আল-কিন্দী যথার্থই বলেছেন- 'সত্য সত্যই', যেখানেই তা আবিষ্কৃত হোক না কেন!" তিনি আবেগ প্রবন হয়ে বলেন: "আমি কী

CS CamScanner

করে আপনাদেরকে বুঝবো যে, আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের পরিকল্পনা আবিস্কার করার যে প্রেরণা প্রদান করেছেন,তার সাথে আল্লাহর ইবাদতের কোনো পার্থক্য নাই"।

তিনি অন্য একজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীর জ্ঞানানন্দের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে হ্যান্স বেথে (Hans Bethe), যিনি পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যেদিন তিনি তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান 'কার্বন চক্র' আবিষ্কার করেন, সেদিন বেথে ও তাঁর স্ত্রী নিউমেক্সিকোর এক মরু প্রান্তরের কোন রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। এখানে তিনি 'কার্বন চক্র' আবিস্কার করেন, যা তারকাপুঞ্জের অপরিমেয় এনার্জি (শক্তি, বল) উৎপাদনের ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করে, যার জন্য তিনি পুরস্কৃত হন। সেখানে এক পর্যায়ে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে লক্ষ করে বলেন: "আকাশের তারকাগুলো, আহা, কতই উজ্জ্বল। তিনি উত্তর করেন: "তুমি কি বুঝতে পার যে এখন তুমি যার পাশে দাড়িয়ে আছ, মানব কুলে সেই একমাত্র জানে কেন তারকাগুলো উজ্জ্বল হয়!"

মুসলমানদের বিজ্ঞানে অবনতি সম্পর্কে প্রফেসর আবদুস সালাম বলেন: "কিন্তু ইসলামি বিশ্বে কেন আমরা বিজ্ঞান হারা হয়ে গেলাম? নিশ্চিতরূপে কেউ এর উত্তর জানে না। অবশ্যই তার বাহ্যিক কারণ ছিল, যেমন মোঙ্গলদের ধ্বংস কীর্তি। তবে দুঃখজনক হয়ে থাকলেও সম্ভবত: এটা একটি সাময়িক বিপত্তিকর কারণ ছিল। কেননা, চেঙ্গিজের ষাট বছর পরে, তার নাতি হালাকু খান, মারাঘায় একটি মানমন্দির (Observatory) প্রতিষ্ঠা করে। আমার বিনীত মতে, ইসলামি কমনওয়েলথে জীবন্ত বিজ্ঞানের অপমৃত্যু অধিকতর জোরালো অভ্যন্তরীণ কারণেই ঘটেছিল"।

তিনি বলেন, আমি এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই যে, কত প্রবলভাবে বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা মুসলমানদেরকে পেয়ে বসেছিল। ইবনে খালদুন ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক ইতিহাসবিদ এবং সর্বযুগের সর্ব্বোচ্চ বুদ্ধিজীবী, যিনি মাইকেল স্কট ও হেনরিক দি ডেইন এর পরিভ্রমণের একশত সত্তর বছর পরে লিখনী ধারণ করেন। এ সময়ের পূর্বে

যুবকদ্বয় ইসলামের জগত থেকে জ্ঞান আহরণ করতে ভ্রমণ করেছিল। আর এ সময়ের পরে ইবনে খালদুন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মুকাদ্দমায় লিপিবদ্ধ করেন যে, "আমরা ইদানিং শ্রবণ করেছি যে, ফ্রেংকদের দেশে এবং ভূমধ্যসাগরের উত্তর কূলে, দার্শনিক বিজ্ঞানাদির বিস্তর চর্চা হচ্ছে। সেখানে এসব নাকি পুনরায় গঠিত হচ্ছে এবং বিদ্যমান শ্রেণি বিভাগে এগুলো শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। পদ্ধতিগতভাবে এগুলোর উত্তর, বক্তৃতা, বক্তব্য প্রদান নাকি বিস্তারিত হচ্ছে; যারা এগুলো সম্বন্ধে অবহিত তাদের সংখ্যা বহু এবং তাদের ছাত্র-শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রচুর। আল্লাহই ভালো জানেন, সেখানে কি ঘটছে। তবে আমাদের নিকট পরিস্কার যে, পদার্থ বিজ্ঞানের সমস্যাবলি আমাদের ধর্মের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব রাখে না। সুতরাং তাদেরকে আমরা বাদ দিতে পারি"।

আবদুস সালাম বলেন: "ইবনে খালদুন কোন প্রকার উৎসুক্য বা ইচ্ছা প্রকাশ করেননি; দেখিয়েছেন অনীহা- যা বিরুদ্ধাচারণের কাছাকাছি। এই অনিহা মুসলিম জ্ঞান চর্চার এক ঘরে হওয়ার কারণ হয়। আল-কিন্দীর ঐতিহ্য-জ্ঞান যেখানেই পাও আহরণ কর, ভুলে যাওয়া হয়েছিল; মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞানের গবেষকরা পাশ্চাত্যের সাথে কোনো প্রকার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্যোগী ছিল না, যেখানে তখন বিজ্ঞান সৃজনশীল হতে আরম্ভ করেছিল"।

"পাঁচশত বছর পূর্বে মুসলমানেরা সাগ্রহে জ্ঞান অন্বেষণ করেছে, প্রথমে জুনদেশপুর ও হাররানে (ইরানের) অবস্থিত হেলেনীয় (গ্রিক) ও নেস্টোরিয়ান (খ্রিষ্টান দার্শনিক) উপনিবেশের পণ্ডিতদের নিকট থেকে, যেখানে গ্রিক ও সিরিয়াক ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়"।

"তারা বাগদাদ, কায়রো ও অন্যান্য স্থানে 'বায়তুল হিকমাহ' নামের আন্তর্জাতিক উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিল এবং অনুরূপ 'শামসিয়াহ' নামক আন্তর্জাতিক মানমন্দির বা অবজারভেটোরী প্রতিষ্ঠা করেছিল। এগুলোতে সকল দেশ থেকে (দৃষ্টান্তমূলক সম্মান ও সম্পদ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে) বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল"।

CamScanner

এগুলোর অনুকরণে পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান গবেষণায় আন্তর্জাতিক স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু হয় সর্বপ্রথমে সাগ্রিস (Sagres)-এ, যেখানে পর্তুগালের রাজা প্রিন্স হেনরী দ্য নেভিগেটার, ১৪১৯ খ্রিষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক তৎপরতার আন্তর্জাতিক প্রবাহকে একত্রিত করে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নয়নকর্ম জোরদার করতে একটি বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন।

তবে আমাদের পতনযুগে যখন আমরা ইউরোপের নব উদ্যমের মুখাপেক্ষী হই এবং তাদের প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নতির প্রতি বিমোহিত হয়ে তাদের প্রযুক্তি অর্জন করার জন্য তৎপর হই, তখন প্রফেসর আবদুস সালামের মতে, "আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে ভুল করে বসি"।

তিনি উদাহারণ টেনে বলেন, "১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে যখন (তুরস্কের উসমানীয় সম্রাজ্যের) সুলতান তৃতীয় সেলিম, তুরস্কের (শিক্ষা ব্যবস্থায়) এলজেবরা, ত্রিকোণমিতি, মেকানিক্স, ব্যলিস্কিক্স্ ও মেটালার্জী শিক্ষার আধুনিক কার্যক্রমের প্রবর্তন করেন- ফরাসি ও সুইডিস শিক্ষক আমদানী করে, যাতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় বন্দুক-কামান নির্মাণ শিল্পের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, তিনি এখানে এই পাঠ্য বিষয়ের পাঠক্রমে 'মৌলিক বিজ্ঞান' (Basic Science) গবেষণার উপর জোর না দিয়ে ভুল করেন; ফলে তুরস্ক কখনও ইউরোপের সাথে সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ত্রিশ বছর পরে (খেদিব) মুহাম্মদ আলী মিশরে তাঁর লোকজনকে 'আর্ট অব সার্ভেইং' এবং কয়লা ও স্বর্ণ অনুসন্ধানের শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাঁর নিজের অথবা তাঁর উত্তরসূরীদের কারো মনে মিশরীয়দেরকে দীর্ঘকালীন ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান (science of geology)-এ প্রশিক্ষিত করার চিন্তা উদিত হয়নি"।

"এমনকি আজকের দিনে যদিও আমরা স্বীকার করি যে, ক্ষমতার আসল ভিত্ হল প্রযুক্তি, আমরা এটা উপলব্ধি করি না যে, এর কোনো কাটছাট বেঁটে রাস্তা নাই। মৌলিক বিজ্ঞান এবং এর সৃষ্টি আমাদের সভ্যতার অংশ হওয়া অপরিহার্য, যা হল বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের বা প্রযুক্তির পূর্বশর্ত"।

CamScanner

অর্থাৎ প্রযুক্তি বা টেকনোলজি ছাড়া যদি আজকের মানুষের জীবন অচল হয়ে পড়ে, তবে আধুনিক যুগের সভ্যতায় বিচরণ করার জন্য কেবল প্রযুক্তি শিক্ষার দিকে ধাবিত হলে চলবে না, তা যথার্থ পরিমাণে অর্জন করাও যাবে না। প্রযুক্তি শিখতে হলে 'মৌলিক বিজ্ঞান' (basic science) অবশ্যই শিক্ষা করতে হবে। 'মৌলিক বিজ্ঞান' হল প্রযুক্তির পূর্বশর্ত। তাই 'মৌলিক বিজ্ঞান' ছাড়া প্রযুক্তি শিখতে যাওয়া বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

তিনি বলেন, 'বিজ্ঞান ছাড়া প্রযুক্তি' (Technology without science) গ্রহণের উপদেশ প্রদান সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। তিনি বিষয়টি আমাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্য লন্ডন ইকনমিস্ট পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি প্রদান করে বলেন: ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ সংখ্যায় সৌরশক্তির নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে বলা হয়: "বিশ্বের জ্বালানী সংকট প্রশমনের জন্য সৌরশক্তি যদি সমাধান দিতে পারে, সে সমাধান নিম্ন-প্রযুক্তি ছাদ-উপরি রেডিয়েটার থেকে সৃষ্টি হবে না, যা উনিশ শতকের বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এর জন্য চলত শক্তি (Break through) কোয়ান্টাম ফিজিক্স, পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানের, বায়োকেমিস্ট্রি অথবা বিংশ শতকের অন্যান্য বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। আজকের প্রযুক্তিভিত্তিক সব শিল্প গুলো নুতন বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল"।[৬]

"অতএব, ভালো হোক বা মন্দ হোক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথা 'ইল্‌ম ও হিকমাহ' বহু যুগ ধরে আমাদের হাতে টটর-মটর করছিল এবং শেষমেষ, পাশ্চাত্যের হাতে রদবদল হয়ে গেছে। এর চারা-কলম জাপানে, চায়নায়, ভারতে এবং অন্যান্য অনেক অমুসলিম দেশে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করছে"।

"আল্লাহর কসম! আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন কিরূপে আমরা আমাদের হারানো ধন তাদের নিকট থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি! আমাদেরকে 'মন্ত্রের সাধন অথবা শরীরের পতন' অঙ্গীকার করে এর চারা-কলম আহরণ করতেই হবে এবং শতযত্ন করে আমাদের মাঝে তা প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে!"

মুদ্রার অপরপীঠ

সে যাই হোক! ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রথম দিকে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় সংগ্রাম, জীবন-মরণ পণ করে বিশ্বচরাচরে জ্ঞানের স্বতৃষ্ণ অন্বেষণ, জ্ঞান আহরণে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক তাজরিবী জ্ঞানীয় পদ্ধতি, জ্ঞানের সুবিস্তারিত সত্য সন্ধিৎসু অনুসন্ধান, আত্ম-নিবেদিত প্রাণ, বিরামহীন প্রচেষ্টা, যা আল-কুরআনের বাণী থেকে উৎসারিত হয়ে এবং মহানবি সা.-এর দৃষ্টান্তমূলে সে যুগের মুসলমানদের মনের মণিকোঠায় প্রবেশ করে, তাদেরকে বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ছুটিয়ে নিয়ে গেছিল, তা মুসলিম সমাজকে বহু বহু দূর এগিয়ে নিয়ে যায় এবং মুসলমানদেরকে সামাজিক ও বুদ্ধিগত প্রগতির শিখরে উন্নীত করে।

আমাদের যুগের একজন খ্রিষ্টান বিজ্ঞানী ও তুলনামূলক ধর্মের বিজ্ঞ গবেষক, ফরাসি দেশের অধিবাসী, মরিস বুকাইলি (Mourice Boucaille) দুইটি একত্ববাদী বা Monotheistic মহান ধর্ম, ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবাধিনে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

"যেকোনো স্থানে বা সময়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক একই প্রকার হয় না। তথ্যগতভাবে একত্ববাদী ধর্মে, বিজ্ঞানকে ধিক্কার দিয়ে বিরুদ্ধবাদী কিছুই লেখাজোখা নেই। তবে কার্যত স্বীকার না করে উপায় নাই যে, বিজ্ঞানীরা কতেক ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের হাতে অনেক অসুবিধা ভোগ করেছে। অনেক শতাব্দী ধরে, খ্রিষ্টান বিশ্বে, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন খ্রিষ্ট ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল, তা অবশ্যই তাঁদের নিজেদের উদ্যোগের ভিত্তিতে, পবিত্র গ্রন্থের কোন প্রমাণসই উদ্ধৃতি মূলে নয়"।

তিনি বলেন: "আমরা অবহিত আছি, বিজ্ঞানকে সম্প্রসারিত করতে যারা চেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হয়, যা প্রায়শ: বিজ্ঞানীদেরকে ফাঁসির স্টেইকে জীবন্ত দগ্ধ হওয়া থেকে বাঁচার জন্য দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে। তাই, তাদের শাস্তি ছিল যদি না তারা অনুতাপ

CS CamScanner

করে তাদের মতামত পরিবর্তন করে ক্ষমা ভিক্ষা না করে, তাদেরকে স্টেইক নামক একপ্রকার ফাঁসির মঞ্চে বা শূলে ঝুলিয়ে দিয়ে নিচে আগুন জেলে তাদেরকে জীবন্ত দগ্ধ করা হত"।[৭]

এর প্রেক্ষিতে গ্যালিলিওর উদাহারণ স্বভাবতই উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে: তাঁর বিচার হয়েছিল-পৃথিবীর ঘূর্ণন (Rotation of the earth) সম্পর্কিত কপার্নিকাসের আবিষ্কার পুনঃগ্রহণ করার কারণে। গ্যালিলিওকে বাইবেলের ভুল ব্যাখ্যা মূলে ধিক্কার দেয়া হয়েছিল, যদিও তাঁর বিরুদ্ধে পবিত্র গ্রন্থের কোনও বাণী যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপন করা যায়নি"।

"বিজ্ঞানের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু ভিন্নতর ছিল। এ বিষয়ে যা থেকে অধিকতর পরিস্কার ধারণা আর হতে পারে না, তা হল প্রসিদ্ধ হাদিস, যাতে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর অবশ্য কর্তব্য। আর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল যে, আল কুরআন আমাদেরকে বিজ্ঞানচর্চার দিকে আহ্বান করার সাথে সাথে এমন অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করেছে, যেগুলো সম্পূর্ণরূপে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত-ড্যাটার সাথে হুবহু মিলে যায়। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রত্যাদিষ্ট পবিত্র গ্রন্থে-এর কোন সমকক্ষ যুক্তি প্রমাণ নাই"।

"তবে, এতদ্‌সত্ত্বেও এরূপ কল্পনা করা সঠিক হবে না যে, ইসলামের ইতিহাসে কোনো কোনো লোক বিজ্ঞানের প্রতি কখনও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ্বেষ পোষণ করে নাই! তথ্যগতভাবে দেখা যায়, কোনো কোনো যুগে নিজেকে ও অপরকে শিক্ষিত করার কর্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা হয়েছে। এটাও সত্য যে, মধ্যযুগের খ্রিষ্টিয় ইউরোপের মতো মুসলিম বিশ্বেও সময়াসময়ে বিজ্ঞানের উন্নয়ন বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে"।

"তাহলেও, এটা স্মরণ করা হবে যে, ইসলামের সুউচ্চ যুগে, আট থেকে বারো খ্রিষ্টিয় শতকের চত্বরে, অর্থাৎ ঐ সময়ে যখন খ্রিষ্টান জগতে বিজ্ঞানের উন্নয়নের বাধা-বন্ধক প্রবর্তিত ছিল, তখন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরাট সংখ্যক গবেষণা কার্য ও আবিষ্কার সম্পন্ন হয়। তখন সেখানেই চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক সম্পদাবলি বিদ্যমান ছিল"।

"কর্ডোভায় খলিফার গ্রন্থাগারে ৪,০০,০০০ গ্রন্থ মওজুদ ছিল"। আদতে কেউ কেউ ছয়লক্ষও হিসেব করেছে এবং এসবগুলো ছিল হস্তলিপি। তাতে বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফা মামুনুর রশীদের সাথে জ্ঞান-গরিমায় সমতূল্য ছিলেন স্পেনের উমাইয়া বংশের খলিফা দ্বিতীয় হাকাম। তিনিই এ গ্রন্থাগার বিপুল আকারে সম্প্রসারণ করেন। তিনি ভীষণ পড়ুয়া নরপতি ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থে অধ্যয়ন করার সময় পাশে ব্যাখ্যাজনিত টীকা লিখতেন এবং তাঁর টীকাগুলো এতই বিজ্ঞোচিত ছিল যে, আগ্রহশীল পাঠকদের নিকট এগুলোর গুরুত্ব ও চাহিদা ছিল সর্বাধিক।

মরিস বুকাইলি বলেন, "এককালে ইবনে রুশদ সেখানে অধ্যাপনা করেন; যেখানে গ্রিক, ভারতীয় ও ইরানী বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেয়া হতো। এ কারণে ইউরোপের সর্বস্থান থেকে শিক্ষার্থীরা কর্ডোভায় গমন করত, যেমন আজকের দিনে লোকজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করে, বিশেষতঃ তাদের শিক্ষাকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে"।

"সংস্কৃতিশীল আরবদের সৌজন্যে অনেক প্রাচীন যুগের পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে এসেছে, কেননা, তারা বিজিত দেশের ঐতিহ্য সংরক্ষণে যত্নবান ছিল"।

"আমরা আরবি সংস্কৃতির নিকট বিপুলভাবে ঋণী অংকের জন্যে। এলজেবরা আরবদের আবিষ্কার। জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, বিশেষতঃ অপটিক্স বা আলোকবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, যা ইবনে সিনার কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে ইত্যাদির জন্য আমরা আরবি সংস্কৃতির নিকট ঋণী"।

"মানব ইতিহাসে মধ্যযুগের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। ঐ সময় মানুষের আজকের তুলনায় অতি মাত্রায় ধর্মীয় মনোভাব তাকে একই সাথে ধর্মপ্রাণ ও বিজ্ঞানী হতে অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। বিজ্ঞান ছিল ধর্মের জমজ"।[৮]

CamScanner

মধ্যযুগের তিনজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

প্রফেসর আবদুস সালাম মধ্যযুগে বিজ্ঞান উন্নয়নের ইতিহাসে তিনজন মহান ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন।[৯] তাঁদের মধ্যে সন্দেহাতীতভাবে ইবনে সিনা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) গোটা মানব ইতিহাসের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে একজন অনন্য জ্যোতিষ্ক ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বিস্ময়কর, হৃদয়গ্রাহী ও আশ্চর্যজনক।

বলা হয়ে থাকে, যখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন অস্থিত্ব ছিল না, তখন গ্রিকদেশীয় হিপোক্রেইট্স্ তা অস্তিত্বে আনয়ন করেন। বিক্ষিপ্ত-তর্বতর্ অবস্থায় নিপতীত চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ইরানী মুসলিম যাকারিয়া আল-রাযী এটাকে যখন পুনর্গঠন ও একাত্মীকরণ করেন এটা তখনও অপরিপক্ক ও অসম্পূর্ণ ছিল, ইবনে সিনা এটাকে সামগ্রিকতা ও পরিপূর্ণতা দান করেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করেন এবং অন্যান্য অবদান দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতিচ্যকে অর্ধসহস্র বৎসরাধিকাল মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। উদাহারণ স্বরূপ, তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান, আল-কানুন (ল্যাটিন অনুবাদ Canon) গ্যালেন, রাযী ও আলী ইবনে আব্বাসের গ্রন্থরাজীকে রহিত করে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে একক পাঠ্য হিসেবে পরবর্তী ছয়শত বছর ধরে তেরো থেকে সতেরো খ্রিষ্টিয় শতাব্দী অবধি একাধারে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় সমভাবে ব্যবহার করা হয়।[১০]

যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন সমগ্র মানব জাতির সহস্র বছরের দিগ্‌দর্শী (Millennial trend-setter)।

এতদসত্ত্বেও তাঁর ভাবধারা সরাসরি বিপ্লবাত্মক বা অভিনব হবার চেয়ে অধিকতর ক্রমবিকাশমান, একাত্মীকরণ ও সমন্বয়ধর্মী ছিল। তাঁর মধ্যে প্রাচীন গ্রিক, ভারতীয় ও ইরানী সৃজনশীল চিন্তা সমভাবে সাম্প্রসারিত হয়ে পূর্ণত্ব লাভ করে। বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে, তিনি গ্রিক দার্শনিক চিন্তার মননশীলতাকে, চিন দেশীয় ও মুসলিম তথা তাজরিবী পদ্ধতির সাথে যুক্ত করতে চেষ্টিত হন। এভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমগ্র মানবিক সৃজনশীল মেধা, তাঁর মধ্যে পূর্ণ প্রতিফলিত হয়।

CamScanner

দ্বিতীয় জন, ইবনে হায়ছম (Al-Haytham) (৯৫০-১০৩৫ খ্রি.) ছিলেন, প্রফেসর আবদুস সালমের ভাষায়: "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানী। তিনি আলোক বিজ্ঞানে (Optics) সর্বোচ্চ মানের তাজরিবী অবদান বা 'experimental contribution' রেখেছেন"।

"তিনি বিধান প্রদান করেন যে, এক পস্‌লা আলোক রশ্মি (passing through a media) একটি 'মাধ্যম স্তর অতিক্রম করতে', সহজতর ও দ্রুততর পথ অবলম্বন করে"। প্রফেসর আবদুস সালাম বলেন, "এটি তিনি Fermat's Principle of Least Time (ফরম্যাট এর ক্ষুদ্রতম সময়নীতি)-এর বহু শতাব্দী পূর্বে অনুমান করেন"।[১১]

পুনরায় প্রফেসর আবদুস সালামের মতে, "তিনি Law of Inertia (জড়ত্বের নিয়ম) এর বিধি প্রদান করেন, যা পরবর্তীতে ইংরেজ মহা-বৈজ্ঞানিক নিউটনের First Law of Motion (গতির প্রথম নিয়ম)-এ পরিণত হয়"।

প্রফেসর আবদুস সালাম আরো বলেন, "He described the forces of Refraction in mechanical terms by considering the movement of particles of light as they passed through the surface of separation of two media, in accordance with the rectangle law of forces, an approach later rediscovered and elaborated by Newton."

পাশ্চাত্যের এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের অঙ্গনে তাঁর প্রভাব ছিল সর্বাত্মক (pervading)। রজার ব্যাকন এর স্মরণীয় গ্রন্থ *Opus Majus*-এর ৪র্থ খণ্ড, কার্যতঃ ইবনে হায়ছমের *Optics*-এর হুবহু নকল।[১২]

ইবনে হায়ছাম তাঁর সমসাময়িক আলবেরুনীর সাথে যুক্তভাবে আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞান (modern experimental science)-এর ক্ষেত্রে, বিশেষত পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দিগদর্শী ছিলেন।

তৃতীয়জন আবু রায়হান আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রি.) ভারতে ও আফগানিস্তানে গবেষণা করেন। তিনি ছিলেন ইবনে হায়ছমের মতই একজন তাজরিবী বিজ্ঞানী (empirical scientist)। উভয়েই সালামের মতে

"দৃষ্টিভঙ্গিতে ছয়শত বছর পরবর্তী গ্যালিলিওর মত অমধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাবধারার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি (আলবেরুনী) গ্যালিলিওর সাথে তথাকথিত গ্যালিলিও অপরিবর্তিত প্রাকৃতিক নিয়ম (Galilean Invariance of the Laws of Nature)-এর পূর্বতন সহ-আবিষ্কারক, যে মতে "পদার্থ জগতের একই নিয়ম এখানে, পৃথিবীতে যেরূপ প্রযোজ্য, সেরূপে মহাকাশের তারকার জগতেও সমভাবে প্রযোজ্য"।[১৩]

অতএব আমরা মুসলিম বিজ্ঞানীদের মেধা ও কৃতিত্বের মূল্যায়নে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? তারা কি শিষ্যত্ব সূলভ, দ্বিতীয় স্তরের, অনুকরণশীল মেধার অধিকারী ছিলেন অথবা গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্র ছিলেন? যা পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা আমাদের বিগত দু'শত বছর ধরে গভীর অভিনিবেশ সহকারে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন! নাকি তাঁরা ছিলেন তাজরিবী বিজ্ঞান বা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চমকপ্রদ বিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা? তাজরিবী বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের আকর্ষণীয় অবদান, মধ্যযুগের ইসলামের জ্যোতির্ময় সভ্যতা-সংস্কৃতির দীপ্তি এবং আধুনিক যুগের চোখ-ধাঁধানো বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিকাশ সম্ভবপর করছে। সুতরাং মহাজ্ঞানী আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক মানুষ সৃষ্টি, মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদান এবং শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর আল কুরআন অবতীর্ণ করে একটি অফুরন্ত কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে মানুষকে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ও পথ-প্রদর্শনের জন্য, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও আল্লাহর মহান রসুল সা.-এর প্রতি শোকরিয়া আদায় এবং জ্ঞান-তাপস মুসলিম মনিষীদের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করা বিধেয়। আমি প্রফেসর আবদুস সালামকে চতুর্থ বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে এঁদের সাথে যুক্ত করতে আগ্রহী।

শেষ স্ফুলিঙ্গ

জর্জ সার্টনের পঞ্চাশ বছরী যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাসের চত্তরে, ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তীতে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের নাম আসতে আরম্ভ

CamScanner

করে, যেমন জেরার্ড অব ক্রিমোনা, রজার ব্যাকন ইত্যাদি। তবে প্রফেসর আবদুস সালাম বলেন, এতে লক্ষণীয় যে, তাদের কৃতিত্ব পরবর্তী ২৫০ বছর ধরে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সাথে শেয়ার বা ভাগাভাগি করা হয়, যেমন ইবনে রুশদ, নাছির-উদ-দীন তূসী এবং ইবনে নফিস এর সাথে। এ শেষোক্ত জন ইবনে নফীস হার্ভীর রক্তসঞ্চালণ থিওরির পূর্বাবিষ্কারক ছিলেন।

১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের চত্বরে এসে প্রফেসর আবদুস সালাম বলেন, "অবশ্যই তখন থেকে ইসলামি বিশ্ব খুঁট হারাতে আরম্ভ করে। মাঝে মধ্যে দু'একটি চমকপ্রদ দীপ্তিময় অগ্নিশিখার মত, যেমন তৈমুর লঙ্গের নাতি উলুগ বেগের রাজসভায়, ধপ করে জ্বলে উঠা অবিস্মরণীয় বিজ্ঞান গবেষণা, যেখানে আমীর উলুগ বেগ নিজেও তাঁর অন্যান্য জ্যোতির্বিদদের সাথে বিজ্ঞানের বিতর্কে এবং তাজরিবী বা এক্সপেরিমেন্টাল বিজ্ঞান আবিষ্কারের মধ্যে সমভাবে অংশগ্রহণ করেন"।

"এবং পরিশেষে, দিল্লীর মোঘল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের দরবারে ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে 'যিজ্ মুহাম্মদ শাহী' নামক জ্যোতির্বিদীয় তালিকা সম্পাদন করা হয়েছিল, যা সে যুগের ইউরোপীয় তালিকা বা টেবলগুলোকে (Tables) সংশোধন করেছিল- by as much as six minutes of arc."

"কিন্তু এ ক্ষণকালীন অবদানের স্ফুলিঙ্গের উদ্গীরণ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে, মুসলিম বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের মূল-স্রোতধারা তখন আর জীবন্ত অথবা উদ্যমশীল ছিল না; অনেক পূর্বে এটা অন্তরমুখী হয়ে ক্ষত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়"।[১৪]

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার

জর্জ সার্টনের পঞ্চাশ বছরী যুগ-ভিত্তিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ৭৫০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিশ্ব-মঞ্চ, বিরতিহীন ক্রমধারায় একক হস্তে অধিকার করে রাখে। মালিক আকবর আলীর দৃষ্টিতে, খ্রিষ্টিয় তেরো শতক থেকে মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞানের অধঃপতনের কারণ বা

হেতু ছিল, বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহের প্রতি মুসলমানদের অনিহা, যেমন ইবনে নফীসের রক্ত সঞ্চালনের ধারা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

প্রফেসর আবদুস সালামের মতে, ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর মোঘল দরবারে 'মুহাম্মদ শাহী যিজ্' বা তালিকা প্রস্তুত করার পর মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা ঝিমিয়ে পড়ে অনীহা তাদেরকে একঘরে করে বসে, যার পরিণতিতে তা ক্ষত প্রাপ্ত হয় বা মৃত্যুবরণ করে।

প্রফেসর আবদুস সালাম বিজ্ঞান অধ্যয়নের যুগীয় ইতিহাসের চত্বরে একটি চক্রাকার কর্মতৎপরতা জাতিসমূহের মধ্যে লক্ষ্য করেন। তদানুসারে প্রথম যুগীয় মুসিলমগণ, খ্রিষ্টিয় অষ্টম শতকে গ্রিক ও ভারতীয়দের ঐতিহ্য থেকে বিজ্ঞান আহরণ করে যাত্রা শুরু করে এবং ১১, ১২ ও ১৩ শতকে বিজ্ঞান উন্নয়নের উচ্চ শিখরে আরোহন করে। অনুরূপভাবে, পাশ্চাত্যের শিক্ষার্থীরা যথা- মাইকেল স্কট ও হেনরি দ্য ডেইন, খ্রিষ্টিয় ১৩ শতকে মুসলিমদের নিকট থেকে বিজ্ঞান আহরণ করে। তাঁরা বিজ্ঞান অধ্যয়ন মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই আরম্ভ করে। তাদের ক্রমঃঅগ্রগতির ধারায় বর্তমানযুগে একটি পূর্ণ চক্র ঘুরে এসেছে। তিনি বলেন যে, মুসলমানেরা পুনরায় নব উদ্যমে ফের বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ করতে পারে। বিগত কয়েকশ' বছরের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা ব্যতিরেকে কেবল প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বা Technology গ্রহণ করার প্রবণতা পরিত্যাগ করে, সংযুক্তভাবে তাদের মৌলিক বিজ্ঞান ও উচ্চ-প্রযুক্তি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া উচিত, সত্যিকারভাবে যদি তারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে আগ্রহী হয়।

CamScanner

নির্দেশিকা

১. Zafar Hasan & C. H. Lai ed.: *Ideals and Realities: Selected Essays of Abdus Salam*, Singapore.1981. pp. 243 and 263.

২. cf. George Sarton: *Introduction to the History of Science*. Baltirnore. U.S.A: 1962. Vol. 1. p. 38 et seq.

৩. M. Akbar Ali: 'The Quran as a source of science", Lecture delivered at Baitush Sharaf, Chittagong. On 26 sept. 1985. p. 12. এবং *Bignane Musalmaner Daan* (in Bengali) Vol. 7. Dhaka, 1974, pp. 258-59.

৪. Richard H. Popkin: *The Philosophy of 16th and 17th Centuries*, 1966, p. 65.

৫. ***Ideals and Realities***. Op. cit., pp. 138-39.

৬. Ibid. pp. 244-46.

৭. 'Burning on the stake' was a medieval Christian Clerical device of punishing dangerous heretics under the sentence of the Church wherein, person so condemned, was hung on a pole and then burnt alive by putting fire and wood and all his belongings beneath. Hundreds and thousandas of dissidents were killed during the middle ages by this cruel means.

৮. Maurice Boucaille: ***The Bible, the*** *Quran and Science*. Pp. 106-107.

৯. *Ideals and Realities*, op. cit. pp. 26.264-65.

১০. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ খণ্ড। পৃ. ১৯৫-২০৫।

১১. ঐ।

১২. ঐ।

১৩. ঐ।

১৪. ঐ, পৃ. ২৪৩-৪৪।

CS CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের স্থানান্তরকরণ

দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ক্রমাগতভাবে একটি মিথ্যা ধারণা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন যে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন গ্রিকদের হাতে সম্পন্ন হয়েছে এবং এরই ভাবগতি পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। তাঁদের বিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রন্থাদিতে, তাঁরা এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা থেকে সচরাচরভাবে একটি দীর্ঘ লম্ফের মাধ্যমে রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপীয় সভ্যতায় উপনীত হন। তাঁরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে আরবীয় সভ্যতায় 'উলুম আত্-তাজরিবিয়া'-এর উন্মেষ ও মধ্যযুগের ল্যাটিন সভ্যতায় 'সাইনটে এক্সপেরিমেন্টালিস' (Scientiae Experimentalis) নামে এর অনুবাদ প্রক্রিয়ার, ৭৫০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৫০ বছরের ইতিহাসকে এক লাফে অতিপটুতার সাথে অতিক্রম করে যান। আদতে ৩৫০ বছরের উপরোক্ত যুগটিই ছিল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্মেষলগ্ন এবং বিকাশকাল, যখন মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিশ্বব্যাপী সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগামী ছিল। এই শ্রেণির অযৌক্তিক এই মিথ্যাচারটি পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞজনেরা জোটবদ্ধ হয়ে সমস্বরে বলে আসছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম তাদের মধ্যকার প্রাজ্ঞ বিজ্ঞান গবেষক ও প্রসিদ্ধ আমেরিকান বিজ্ঞান ইতিহাসবিদ জর্জ সার্টন, যিনি ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানের ইতিহাস ৭৫০ থেকে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৫০ বছরের পরিসরে ৮ জন মুসলিম বিজ্ঞানীর নামে এক-একটি ৫০ বছরী যুগ রূপে-আমরা পূর্বের অধ্যায়ে যেমন দেখেছি, আখ্যায়িত করেন।[১] উল্লিখিত সময়ের ইউরোপের একজন অনুপ্রাণিত আত্মা ছিলেন এ্যাভাক র‍্যায়মন্ড (Evak Raymond) যিনি মুসলিম ব্যবহারিক বিজ্ঞান, তথা 'উলুম আত-তাজরিবিয়া' কে খ্রিষ্টান ইউরোপে সম্প্রচার করতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অধিকন্তু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ কোথায়ও এ তথ্যটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেননি যে, গ্রিক পণ্ডিতগণ দার্শনিক (Philosopher) ছিলেন এবং

CamScanner

তুলনামূলক ধারণা (Inferential) ভিত্তিক জ্ঞানের চর্চা করতেন, অথচ তাঁদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান (Experimental Science) সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না, যেমন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গবেষণার জনক রজার ব্যাকন খ্রিষ্টিয় তের শতকে বর্ণনা করেছেন।[২]

আদতে কতেক পাশ্চাত্যের পণ্ডিত ব্যক্তি মধ্য যুগীয় পাশ্চাত্যের অন্ধকার স্কলাস্টিক আবরণ ভেদ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং চেষ্টা করেছেন তা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে।

র‍্যায়মন্ডের উদ্যোগ

১১৩০ থেকে ১১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এভাক র‍্যায়মন্ড, যিনি স্পেনের অধিবাসী ছিলেন, আরবি ভাষা থেকে স্পেনের ক্যাস্টিলীয় ভাষায় ইবনে সিনার গ্রন্থাবলি অনুবাদ করতে উদ্যোগী হন এবং এ উদ্দেশ্যে একটি অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অনুবাদের কাজ একবার শুরু হলে, তাতে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাদির অনুবাদ তের শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রথম প্রথম আরবি থেকে ক্যাস্টিলীয় স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদ হচ্ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো ল্যাটিন ভাষায় পুনঃ অনুবাদ হতে লাগল, যাতে জোহান্স হিসপানেলসিস (Johannes Hespalensis) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩]

প্রায় একই সময়ে ডমিনিকান মংক্ বা সাধু গোন্ডাসালভী এবং ক্রেমোনার সাধু জেরার্ডকে দেখা যায় যে, তাঁরা মুসলিম জাহানের অনন্য চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত দার্শনিক আবু নছর আল-ফারাবীর রচিত 'ইহ্‌সা আল-উলুম' (বিজ্ঞানাদির সমষ্টি) গ্রন্থটির ল্যাটিন অনুবাদে ব্যস্ত। তাঁরা এ ল্যাটিন অনুবাদের নামকরণ করেন 'ডে সাইন্‌টীস' (De Scientiis)।[৪]

পাশ্চাত্যের দর্শনের একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, ফ্রাঙ্ক থিলী (Frank Thilly) মন্তব্য করেন, সে যুগে এক নব বিশ্ব পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান জগতের সম্মুখে উন্মোচিত হচ্ছিল; কেননা এ সময়ে আরবি থেকে ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে অংক, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রিক গ্রন্থাদি,

এ্যারিস্টটলের ইতোপুর্বেকার আটশত বছর ধরে নিষিদ্ধ গ্রন্থাদি এবং আলেকজান্ডার অব এ্যাফ্রেডিসিয়াস কর্তৃক রচিত এগুলোর ভাষ্য, অনুরূপভাবে থেমিস্‌টিয়াসের রচনাবলি ও অন্যান্য সুবিখ্যাত আরব ও ইহুদি দার্শনিকদের রচনা ও এ্যারিস্টটলের অন্যান্য ভাষ্যকারদের রচনাবলী তাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছিল।[৫]

থিলী আরো বলেনঃ খ্রিষ্টিয় ১১৫০ সনের দিকে জন এ্যাভেন্‌ডীথ (John Avendeath) এবং ডমিনিকান গোন্ডাসালভী, এ্যারিস্টটলের প্রধান গ্রন্থগুলো এবং ইহুদিদের ও আরবদের রচিত গ্রন্থাদি, আরবি ভাষা থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। ১২১০ থেকে ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এ্যারিস্টটলের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাবলী এরূপ অনুবাদের মাধ্যমে জানা হয়ে যায়।[৬]

"এ গ্রন্থগুলো সাগ্রহে পঠিত হচ্ছিল এবং প্রথমতঃ এগুলো আরবি দুই ধাঁচের নব-প্লেটোবাদের ভাবধারায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল"।[৭]

"মহান পেরিপ্যাতেটিক দার্শনিক, তথা এ্যারিস্টটলের প্রধান গ্রন্থগুলো মূল গ্রিক ভাষা থেকে পরবর্তীতে তের শতকের শেষের দিকে অনুদিত হলে, তখন আরবীয় নব-প্লেটোবাদী মেকি ধারণা থেকে এ্যারিস্টটলের খাঁটি পরিচয় পাওয়া যায়"।[৮]

সার্টনের বিচারের দাঁড়িপাল্লায় বিজ্ঞানের পাশ্চাত্য মঞ্চে বারো শতকের গোড়া থেকে ক্রেমোনার জেরার্ড, রজার ব্যাকন ও জ্যাকব অব এ্যানাতোলির আবির্ভাব ঘটে।[৯]

তবে জেরার্ড ছিলেন আল-ফারাবীর দ্বারা প্রভাবিত; কিন্তু রজারের সময়ে ইউরোপের উপর ইবনে সিনার (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.) আধিপত্য বলবৎ ছিল। এক্ষেত্রে মাইকেল স্কট (Micheal Scott) ইবনে সিনার কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। "বারো শতকের শেষাংশ থেকে ইবনে সিনার চিন্তাধারা পাশ্চাত্যে খোলাখুলিভাবে গৃহীত হচ্ছিল এবং তেরো শতকে তাঁর প্রভাব সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়"। তাছাড়া ইসলামি বিশ্বকোষের মতে, "এ সময়ে

বিভিন্ন শাস্ত্রের গ্রন্থাদির মধ্যে বেশির ভাগ ইবনে সিনার দর্শনের ভিত্তিতে রচিত হয়"।[১০]

এমনকি রজার ব্যাকনের রচনাগুলোও প্রায় সর্বেতোভাবে ইবনে সিনার নমুনায় রচিত হয় এবং যারা তাঁর সমালোচনা করে তারাও তাঁর কিছু মতবাদের ভিত্তিতেই তা করতে থাকে। সবাই তাঁর বিস্তীর্ণ ধী শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানের ও চিন্তার প্রশাংসায় পঞ্চমুখ ছিল।[১১]

তবে রজারের পূর্বে রবার্ট গ্রসেটেস্ট (Robert Grosseteste) এর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর জীবনকাল ১১৬৮ থেকে ১২৫৩ খ্রি. পর্যন্ত ছিল। তাঁর সম্বন্ধে দর্শনের বিশ্বকোষের বক্তব্য নিম্নরূপ:

"গ্রসেটেস্ট বুদ্ধিগত ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে জীবন যাপন করেন। ল্যাটিন ইউরোপ মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থাবলি সম্বন্ধে সবেমাত্র জ্ঞাত হচ্ছিল এবং হেলেনিক লেখকদের ও সদ্য পুনরাবিষ্কৃত এ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলি অনুদিত ও প্রচারিত হচ্ছিল। আর এ গুলোর উপর বক্তৃতা হচ্ছিল। তিনি অবশ্যই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ইংলিশ বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের জনক ছিলেন; অক্সফোর্ড ফ্রাসিসকানের একজন চ্যান্সেলর ছিলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম লেকচারার ছিলেন এবং ইংল্যান্ডের বৃহত্তম গির্জার বিশপ ছিলেন। "শিক্ষক হিসেবে, ভাষ্যকার হিসেবে এবং অনুবাদকারী হিসেবে তিনি এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন"।

"মূলত অগাস্টাইনিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি হলেও এবং মানসম্পন্ন গ্রন্থাকারদের উপর নির্ভরশীল হলেও তিনি মুসলিম শিক্ষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন; বিশেষত: ইবনে সিনার দ্বারা, জ্যোতির্বিদদের দ্বারা, ইহুদি এ্যাভিসুব্রনের দ্বারা এবং নব প্রাপ্ত এ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলি দ্বারা"।

"ইবনে সিনার দ্বারা প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়ে, তিনি মনে করতেন যে, অনুভূতির সাহায্য ব্যতিরেকেও মানুষ কেবল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম"।[১২]

CamScanner

"তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এ্যারিস্টটল ও অন্যান্যরা যারা পার্থক্যকারী যুক্তির (Discursive Reasoning) দ্বারা নিশ্চিতরূপে অবগত ছিলেন যে, চিরকাল হল সরল; কিন্তু তা পার্থিব অস্তিত্বের ছায়াবরনে দেখতেন বলে তাঁরা অনেক অযথার্থ বস্তুর অস্তিত্ব নির্দেশ করেছেন, যেমন সময় ও গতির চিরস্থায়ীত্ব এবং পরিণতিতে বিশ্ব জগতের চিরস্থায়ীত্ব"।[১৩]

"প্রণিধানযোগ্য যে, এই শেষোক্ত বিষয়টি প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক, বস্তুত মুসলিম দর্শনের ও বিজ্ঞানের প্রথম উদ্‌গাতা, আবু ইয়াকুব বিন ইসহাক আল-কিন্দির (৮০০-৮৭৫ খ্রি.) প্রাথমিক দর্শন (First Philosophy) থেকে আহরিত। আল-কিন্দির মতে: "কোন বস্তু নিজে নিজের কারণ হতে পারে না, অথবা এটা অসীম হতে পারে না, কিংবা একক হতে পারে না"। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, যদি এ তিনটি প্রতিপাদ্য স্বীকৃত হয়, তবে প্রমাণিত হল যে আল্লাহ্ হলেন বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা এবং তিনি একাই চিরজীবী। এরূপে তিনি গ্রিক দর্শনের 'বিশ্বজগতের চিরস্থায়ীত্বের' মতবাদ খণ্ডন করতে চেষ্টিত হন।[১৪]

যাই হোক, পাশ্চাত্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রবর্তনের প্রধান হোতা ছিলেন, যেমন আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, রজার ব্যাকন (১২১৪-১২৯২ খ্রি.)। ফ্রাঙ্ক থিলীর বর্ণনা মতে, "তিনি ছিলেন মধ্যযুগীয় ও আধুনিক পাণ্ডিত্যের এক আকস্মিক সংমিশ্রণ" এবং "ইংল্যান্ডে খ্রিষ্টিয় তের শতকে যারা অংক ও পদার্থিক বিজ্ঞানাদির চর্চায় লিপ্ত হন, তাদের মধ্যকার সর্বাধিক মৌলিক ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্ব"।[১৫]

থিলী বলেন, "রজার ছিলেন একজন ফ্রান্সিসকান সাধু , যিনি অক্সফোর্ড ও প্যারিসে প্রশিক্ষণ লাভ করেন এবং যিনি বিশেষ করে অংক চর্চায় নিবেদিত হন, যা তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তি ছিল ও যাতে তিনি অংক, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যা শামিল করেন এবং পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যা (Perspective), আইনশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা (Operative Astronomy), আলকেমী, কৃষি বিদ্যা (উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা), চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষী ও যাদুবিদ্যা (Magic) ইত্যাদি তাঁর দৃষ্টিতে পদার্থিক বিজ্ঞানের

CS CamScanner

মধ্যে পরিগণিত ছিল। তদুপরি গ্রিক, হিব্রু, আরবি ও কলদীয় ভাষা চর্চাকেও তিনি ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়নের জন্য অপরিহার্য মনে করেন। পদার্থ-অতীত দর্শন হল বিজ্ঞানের প্রথম নীতিমালা (First Principles)। রজারের ভাবধারা, তিনি একটি বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, যার শিরোনাম: *অপাস ম্যাজুস*"।[১৬]

অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে, তিনি এ সময়ে 'ডক্টর মিরাবিলিস্' নামে প্রখ্যাত হন এবং ১২৩৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে তাঁকে 'রিজেন্ট মাস্টার' নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন ইটালীর মধ্যযুগীয় পণ্ডিত-দার্শনিক বোনাভেঞ্চুরা, ফ্রান্সিস্কান প্রতিষ্ঠানের, Order-এর প্রধান বা জেনারেল নিযুক্ত হন, তখন ব্যাকনকে অক্সফোর্ড থেকে বহিস্কার করা হয় এবং দশ বছর ধরে তাকে প্যারিসের এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অন্তরীণ রেখে লেখার সামগ্রী, বইপত্র ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে পোপ ফাউলকেস (Foulques) তাঁকে অব্যাহতি দেন।[১৭] যদিও আমরা যেমন অন্যত্র লক্ষ করেছি, তিনি চৌদ্দ বছর অন্তরীণ ছিলেন।[১৮]

ইসলামি জ্ঞানের একটি প্রতিকূল দৃষ্টি

বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য যে, পাশ্চাত্যবাসীদের জ্ঞান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে খ্রিষ্টিয় তেরো শতকে মুসলিম প্রভাবের ঢল নামে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, এলবার্ট অব বোলাস্টাড্ (Albert of Bollstadt) নামে এক ব্যক্তি (১২৯৩-১৩৮০ খ্রি.) দর্শন, অংক, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বলগ্না বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার পর ১৩২২ খ্রিষ্টাব্দে ডমিনিকান অর্ডার-এ দাখিল হন। প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত দুটি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যারাবিয়ান নমুনায় ইউরোপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি 'দর্শনের শিক্ষক' নামে প্যারিস ও কলঞ্জ-এ সুপরিচিত হন এবং কালক্রমে মহান এলবার্ট (Albert the Great) নামে পরিচিতি লাভ করেন। এ্যারিস্টটলের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থ ছাড়াও তিনি দুটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, একটি আল-গায্যালীর ও অপরটি ইবনে রুশদের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের উপর।

CamScanner

এগুলোর নাম যথাক্রমে- *সুম্মা থিওলজিকা এবং ইউনিটেইট ইনটেলেক্টাস কন্ট্রা এ্যাবেরোয়েন*, যাতে তিনি ইমাম গায্‌যালি ও ইবনে রুশদের দর্শনের পারস্পরিক তুলনা করেন।[১৯] এ বিষয়ে থিলি বর্ণনা করেন: "এলবার্ট ছিলেন প্রথম চার্চের ডক্টর, যিনি এ্যারিস্টটলের দর্শনের ভিত্তিতে একটি শিক্ষাব্যবস্থা প্রদান করেন। আরবীয় প্রভাব অবশ্য তাঁর রচনার মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয়"।

"ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্যাদির আলোচনায় তিনি মোজেস মায়মনাইড-এর রচিত '*গাইড ফর দি এরান্ট*' গ্রন্থের অনুসরণ করেন।[২০]

মোজেস্ বা মুসা বেন মায়মুন (১১৩৫-১২০৪ খ্রি.) মধ্য যুগে ইহুদিদের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন, যিনি স্পেনের টলেডো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করতেন।

"এলবার্ট প্রাকৃতিক দর্শন (তথা বিজ্ঞান) চর্চায় গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে এক্ষেত্রে রজার ব্যাকনের পূর্বসূরী বলে প্রায়শঃ বিবেচনা করা হয়"।

"এলবার্টকে তাঁর জ্ঞানের গভীরতার চেয়ে জ্ঞানের প্রশস্ততার জন্যে অধিক স্মরণ করা হয়। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর মহান শিষ্য টমাস অব এ্যাকুইন (টেমাস এ্যাকুইনাস) এর চেয়ে সমালোচনার বিচক্ষণতায় ও মনন ক্ষেত্রের পরিধিতে খাট ছিলেন"।[২১]

তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক আলেকজান্ডার অব হ্যালেস (Alexander of Hales) যিনি ১২৪৫ খ্রি. মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁরই মতো আরবীয় দর্শন ও বিজ্ঞান এর সাথে যথেষ্ট পরিচিতি প্রদর্শন করেন। তিনি তাঁর "*সুম্মা ইউনিভার্সো থিওলজি*" গ্রন্থে প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের সাথে আল-ফারাবি, ইবনে সিনা ও আল-গায্‌যালিকে অন্তর্ভুক্ত করেন।[২২] টমাস এ্যাকুইনাস, আল- গায্‌যালির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন, বিশেষত ধর্ম ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে।

টমাস এ্যাকুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খ্রি.) মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ খ্রিষ্টান ধর্মীয় চিন্তাবিদ্‌দের ন্যাপল্‌স্ এর সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্যারিস ও

CamScanner

কলঞ্জে অধ্যয়ন কালে তিনি মহান এলবার্টের শিষ্য হন। তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম ক্যাথলিক ধর্মচিন্তা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতারূপে খ্যাত হন। সমসাময়িক লোকেরা তাকে 'ডক্টর এ্যাঞ্জেলিকাস' তথা 'মহাজ্ঞানী ফেরেশতা' নামে ডাকেন। পোপ জন (২২ তম) ১৩২৩ খ্রি. তাঁকে সেইন্ট উপাধিতে ভূষিত করেন।[২৩]

তাঁর শিক্ষক এলবার্ট মনে করতেন যে, দার্শনিক বিষয়াদি সম্মতভাবে বিবেচ্য এবং ধর্মীয় বিষয়াদি ধর্মীয়ভাবে বিবেচ্য।[২৪] তাঁর শিক্ষকের এই দ্বিতাত্ত্বিক মনোভাব তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল বলে মনে হয়। টমাস সুনিপুণভাবে এ্যারিস্টটলের দর্শন, সেইন্ট আগাস্টাইনের ধর্মতত্ত্ব ও আল-গায্যালীর ধর্ম দর্শনের মধ্যে দর্শন ও ধর্মের উভয় দিককে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রেখেই সমন্বয় সাধন করেন। যদিও পুঝিও ফাইডি (Pugio Fidei) এর রচয়িতা র‍্যামন মার্টিনকে ইউরোপে আল-গায্যালীর ভাবধারার প্রথম আমদানীকারক রূপে বিবেচনা করা হয়। এটা টমাস এ্যাকুইনাসের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে।[২৫]

যুক্তি ও ধর্ম বিশ্বাস এর পার্থক্য নিরূপণের ব্যাপারে তাঁর শিক্ষক এলবার্টকে অনুসরণ করে টমাস বলেন, "দর্শন তথ্য থেকে আল্লাহ্‌তে উপনীত হয় এবং ধর্ম আল্লাহ্‌ থেকে তথ্যে উপনীত হয়।[২৬]

তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "*সুম্মা থিয়লজিকায়*" টমাস আল-গায্যালীর "*ইয়াহ্‌য়া উলুম আল-দ্বীন*" (ধর্মীয় বিজ্ঞানাদির পুনরুজ্জীবন) গ্রন্থকে এমনিভাবে অনুসরণ করেন যে, কোন কোন প্রাচ্যবিদ মন্তব্য করেন যে, সুম্মার প্রকাশলগ্নে ইয়াহ্‌য়া অনুদিত হলে, লোকেরা 'প্লেজিয়ারিজম' (অর্থাৎ নকল) বলে আওয়াজ তুলতো।

একটি আকর্ষণীয় বিষয়, টমাস বিজ্ঞানকে 'সায়েন্স' (Science) কথাটির স্থলে 'সায়েনটিয়া' (Scientia) কথাটি ব্যবহার করেন এবং বলেন, "খাটি জ্ঞান বা সায়েনটিয়ার ভিত্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যেও অভিজ্ঞতায় নিহিত অতএব, আমরা শুধু যা অভিজ্ঞতা করি তাই জানতে পারি"।[২৭]

CamScanner

এতে বুঝা যায় যে, তাঁর সময়ে "সায়েন্স' শব্দটি বিজ্ঞানী বা দার্শনিকদের ব্যবহারে আসেনি অথবা 'সায়েনটিয়া' শব্দটির সাথে তখনও এক্সপেরিমেন্টালিস (Experimentalis) কথাটি যুক্ত হয়নি, যা তাঁর সমসাময়িক রজার ব্যাকন যুক্তভাবে ব্যবহার করেন।

পরবর্তীতে আল-গায্যালীর প্রভাব ব্ল্যাইজ প্যাস্ক্যালকে (Blaise Pascal) যিনি ১৬২৩-১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, প্রায় সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করেছিল। তিনি একজন সুদক্ষ অংকবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি বলেন, "যুক্তি সন্দেহের মধ্যে সমাপ্ত হয় এবং এটা আমাদেরকে কিংকর্তব্যবিমুঢ় অবস্থায় পরিত্যাগ করে। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতিতে আমরা সরাসরি আল্লাহকে অনুভব করি এবং শান্তিপ্রাপ্ত হই। অতএব, "হৃদয়ের নিজস্ব যুক্তি বিদ্যমান, যা যুক্তি আঁচ করতে পারে না।[২৮]

ইবনে রুশদ (১১২৬-১১৯৬ খ্রি.) ছিলেন অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ এ্যারিস্টটলের ভাষ্যকার। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যুক্তিবাদী দার্শনিক হিসেবেও তেমনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার ছিলেন। তাঁর বহুসংখ্যক গ্রন্থ উভয় ক্ষেত্রে সমভাবে বিভক্ত। মূলত তিনি ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী, প্রাণী বিজ্ঞানী, চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যদিও তিনি জনপ্রিয়ভাবে আইনবিদ, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক হিসেবে অধিক পরিচিত হন।[২৯]

পাশ্চাত্য জগতে, তিনি এ্যাভেরোস (Averroes) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এ্যারিস্টটলের ভাষ্যকার হিসেবে এত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন যে, এ্যারিস্টটল পন্থীরা দুইদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, একদল ইবনে রুশদ এর অনুসরণে ও অন্যদল আলেকজান্ডার অব এ্যাফ্রেডিসিয়াস এর অনুসরণে, এ্যারিস্টটলের পেরিপ্যাতেটিক দর্শনকে দু'দল দুইভাবে ব্যাখ্যা করে।

"উত্তর ইটালির প্যাডুয়াকে কেন্দ্র করে বহু সংখ্যক চিকিৎসাবিদ ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে একটি এ্যাভেরোয়িস্ট স্কুল বা ভাবধারা বিদ্যমান ছিল, যা এ্যারিস্টটলকে ইবনে রুশদ এর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে"।[৩০]

CamScanner

রেনান ও সার্টন, তাঁর ৬৭টি গ্রন্থের তালিকা নির্দেশ করেন-যাতে ২৮টি দর্শনের উপর, ২০টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর, ৮টি আইনের উপর, ৫টি ধর্মের উপর, ৪টি জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর, ২টি ব্যাকরণের উপর, ২টি পদার্থ বিজ্ঞানের উপর রচিত। তদুপরি, তিনি প্রাণীবিজ্ঞানের উপরও গ্রন্থ রচনা করেন। সুতরাং তাঁর বিজ্ঞানাদির বিষয়ে রচনা, তাঁর দর্শনের বিষয়ে রচনার থেকে সংখ্যার দিক দিয়ে কম নয়। এতদসত্ত্বেও যেহেতু তাঁর যুগটি দর্শনের যুগ ছিল, তিনি দার্শনিক রূপেই সুপরিচিত হন।

যাই হোক, তাঁর অনেকগুলো গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় ও হিব্রু ভাষায় অনুদিত হয়। এ্যারিস্টটলের উপর তাঁর ভাষ্য ল্যাটিন ভাষায় প্রথমবারের মতো অনুদিত হয় ১২১০ খ্রি., অতঃপর নব নব অনুবাদ বের হয় ১২২০, ১২৪০ খ্রিষ্টাব্দে। এর হিব্রু অনুবাদ প্রকাশ হয় ১২৩২, ১২৪০, ১২৬০, ১৩১৪ খ্রিষ্টাব্দে। ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের বিশপ এটাকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে, এতে ২৯১টি ভুল নির্দেশ করেন।

'কুল্লিয়াত' নামক তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার বিস্তারিত ও বিশ্বকোষ জাতীয় লেখা ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্যাডুয়ায় বোনা কোসা কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়। এটার অন্য একটি ল্যাটিন অনুবাদ ১৪৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এর আরো অনুবাদ, তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদের সাথে ১৪৯০, ১৪৯৬, ১৪৯৭, ১৫১৪, ১৫৩০, ১৫৩১, এবং ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইবনে রুশদ, ইবনে সিনার "উরজুযা" নামক রোগের ও ওষুধের বিবরণ সম্বলিত একটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত কাব্যিক সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন, যা ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীর হারম্যান ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। এটির আরও একটি ল্যাটিন অনুবাদ ১২৬২ খ্রিষ্টাব্দে রেজিয়ার্স থেকে প্রকাশ করা হয় এবং আরেকটি অনুবাদ ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাদি মাইকেল স্কট, উইলিয়াম ডে লুনিসি, এ্যানড্রিয়াস এ্যালপেগাস ও এ্যালফন্‌সো অব টলেডো কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়।[৩১]

CamScanner

অতএব, পাশ্চাত্য জগত মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উন্নতির পূর্ণজোয়ার পুরাদমে অনুভব করে এবং আল-কিন্দির সময় থেকে ইবনে রুশদ এর সময়কাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ সাগ্রহে মুসলিম বিজ্ঞানাদির উপাদেয় শিক্ষা আহরণ করে। বিশেষত: এরূপ শিক্ষা গ্রহণের কর্মকান্ড খ্রিষ্টিয় তের শতক এবং পরবর্তী যুগে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। মুসলিম বিজ্ঞানাদির ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমে সম্প্রচার এরূপে সে সময়ের সর্বাধিক উপযুক্ত, দক্ষ ও জ্ঞানী পণ্ডিতবর্গের দ্বারা সচরাচরভাবে, স্বাভাবিকভাবে এবং মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়, যা পাশ্চাত্যের লোকেরা সানন্দে ও সাগ্রহে গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার চত্ত্বরে সংযুক্ত ও একীভূত করে নেয়।

সার সংক্ষেপ ও উপসংহার

সার কথা, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণকে ১১৩০ থেকে ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইউরোপীয় স্কলাস্টিসিজম এর অন্ধকার ভেদ করার জন্য অহরহ চেষ্টা করতে দেখা যায়। তাঁরা প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি আরবি ভাষা থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করার মাধ্যমে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হন। এ প্রক্রিয়ায়, পাশ্চাত্যের লোকজন মুসলিম বিজ্ঞানীদের লেখার সাথে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হন।

আল-খারিযমী, আল-কিন্দি, আল-ফারাবী, ইবনে সিনা, আল-রাযী ও ইবনে রুশদ তাদেরকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেন এবং ক্রমান্বয়ে তারা মুসলমানদের *'উলুম আত-তাজরিবিয়া'* বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান তথা Experimental Science শিক্ষা করতে সক্ষম হন।

এদিক থেকে এভাক র‍্যায়মন্ড, জোহান্‌স্ হিস্প্যালেনসিস, গোন্ডাসলভী, জেরার্ড, জন এ্যাভেনডীথ (১২ শতকের), রোবার্ট গ্রসেটেস্ট, রজার ব্যাকন, যেকব এ্যানাটোলী, মাইকেল স্কট (১৩ শতকের) এবং এ্যালবাট দি গ্রেট, টমাস এ্যাকুইনাস, আলেকডান্ডার হালিস, র‍্যামন মার্টিন, ব্লাইস প্যাসকেল ও অন্যান্য অনেকেই অনুবাদক, উৎসাহদাতা ও সংগৃহীতা

CamScanner

হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন যার মাধ্যমে তাঁরা মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে স্থানান্তর করতে সক্ষম হন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এটা একটি একপক্ষীয় কর্মকান্ড ছিল। কেননা, এতে মুসলমানদের কেবল দেয়ার ছিল ও এর বদলে নেয়ার কিছুই ছিল না।

সুতারাং আধুনিক পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, মুসলমানদের মূল্যবিহীন প্রদত্ত উপহার বই আর কিছুই ছিল না, যা মুসলিম গবেষকদের যুগ যুগান্তরের নিবেদিত প্রাণ, জ্ঞান অন্বেষণের অমূল্য ফসল, যার জন্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ইতিহাসে কৃতজ্ঞতা সুলভ স্বীকৃতি তাদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য। ইতিহাস এটা মঞ্জুর করে, বিবেক এটা দাবি করে এবং ন্যায় বিচার সন্দেহাতীতভাবে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

CamScanner

নির্দেশিকা

১. George Sarton: *Introduction to the History of Science*, Baltimore, 1962, Vol. 1, p. 38.

২. Frank Thilly: *A History of Philosophy*, Allahabad, 1949. pp. 230-38.

৩. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩।

৪. Ralph Lerner & Mushin Mahdi ed.: *Medieval Political Thought, a source book*, Canada, 1963. p. 22.

৫. Frank Thilly: *A History of Philosophy*, Allahabad, 1949. pp. 162-63.

৬. Ibid.

৭. Ibid. The Observation: after the Arabic fashion in the spirit of neoplatonism, is cryptic, simpleton and ignoramus, which will be analysed at the eighth chapter.

৮. Ibid.

৯. Prof. Abdus Salam: *Ideals and Realities, op. cit.,* p. 139 and Sarton, op. cit. Vol. II.

১০. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৩।

১১. ঐ।

১২. This has been expounded by Ibn Sina in his *Hayy Ibn Yaqzan.*

১৩. *Ency. Of Philosophy*, Paul Edwards ed.: Vol. 3-4, p-391.

১৪. George N. Atiyeh: *Al-Kindi, The Philosopher of the Arabs*, Islamabad, p. 56.

১৫. Frank Thilly: *A History of Philosophy*, p. 185.

১৬. Ibid.

১৭. *Encyclopedia of Philosophy, op. cit*. Vol. 1-2, p. 240, para 1-2, and bibliography; and Joseph Laffan Morse ed.: *Standard Reference Ency*. New York, 1959. Vol. 3, pp. 896-97.

১৮. *The Oxford English Dictonary*, Vol. IX, p. 221.

১৯. Thilly: *A History of Philosophy*, op. cit, p. 171.

CamScanner

২০. Ibid.

২১. Ibid. pp. 171-72.

২২. Ibid. p. 172.

২৩. Ibid.

২৪. Ibid.

২৫. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, দশম খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

২৬. Thilly: *A history of philosophy, op. city*. p. 173.

২৭. Ibid. p. 263, and *Islami Bishvakosh, op. cit*. p. 174.

২৮. Ibid. p. 263, and *Islami Bishvakosh, op. cit*. Vol. 10.p. 361.

২৯. Ibid. Vol. 4, pp. 164-163.

৩০. Thilly: *A History, op. cit*. p. 209.

৩১. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৯-৫০।

CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন

সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান

আমরা সচরাচর কোনো বস্তুকে নাম দ্বারা চিনি। আর কোনো বস্তুকে ভালোরূপে জানতে পারি বস্তুটির সংজ্ঞার দ্বারা। তবে মানব জাতি অকস্মাৎ এ জ্ঞানে উপনীত হয়নি। তা অর্জন করতে মানুষকে 'প্রচেষ্টা ও ভুল-সংশোধন' (Trial and error) এর মাধ্যমে হাজার হাজার বছর ধরে অধ্যবসায় করতে হয়েছে। তাদেরকে প্রচেষ্টার ভুল-সংশোধন, চিন্তা-পুনঃচিন্তা, সার্বক্ষণিক ভাবনা, পুনঃপুনঃ অভিজ্ঞতা ইত্যাদির মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে 'সরল' ডাকনাম থেকে 'জটিল' সংজ্ঞায়ন প্রক্রিয়ায় উপনীত হতে হয়েছে।

যে যাই বলুক না কেন মানব জাতির প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক নিদর্শন, যথা ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থগুলোর মধ্যেই, নাম ধরে ডাকা ও নামকরণের প্রক্রিয়ার বিষয়টি সরাসরি বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়। এগুলোর মধ্যে ভারতীয় আর্যদের **বেদ**, **উপনিষদ**, ইরানিদের **আবেস্তা**, খ্রিষ্টান ইহুদিদের **বাইবেল**, **গস্‌পেল** ও বৌদ্ধদের **জাতক** এবং মুসলমানদের **কুরআন** মুখ্য। এই উৎসগুলো সাধারণভাবে একমত পোষণ করে যে, মানবজাতি সর্বপ্রথম যা শিক্ষা লাভ করে তা হল নামকরণের বিদ্যা।[১]

এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখে ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন। আল কুরআন বলেঃ মহান স্রষ্টা প্রতিপালক প্রভু, যিনি বিশ্বজগত ও মানবজাতি উভয়কে সৃষ্টি করেন, তিনি আদি মানব, আদমকে, সর্বপ্রথম বস্তুর নামকরণের বিদ্যা (ইল্‌ম) শিক্ষা দেন (আল্লামা আল-আসমা কুল্লাহা)।[২] প্রথম মানব দম্পতি, আদম আ. ও হাওয়া আ. এই আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাথমিক নামকরণের বিদ্যার মাধ্যমে সমস্ত বস্তুকে একে একে নাম প্রদান করতে পারতো এবং নাম ধরে ডাকতে পারতো। আদম আ. ইল্‌ম বা বিদ্যা দ্বারা সব বস্তুকে সনাক্ত করতে পারতো, যা তাঁকে মহান আল্লাহ নিজেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু

CamScanner

ফেরেশতারা, (মালাক, বহুবচনে 'মলায়েকা' যার ইংরেজি 'এনজেল') তা করতে সমর্থ ছিল না। পরিণতিতে, মুখোমুখি নামকরণের প্রতিযোগিতায়, ফেরেশতারা হেরে গেল এবং আদম জয়যুক্ত হলো।[৩]

এর বাস্তব নিদর্শন স্বরূপ, আমরা দেখতে পাই যে, সমস্ত আদম-হাওয়ার উত্তর-সূরী জাত-পাত, ছোট-বড় নর-নারী নির্বিশেষে সবাই বস্তুর গুণাগুণ, পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে, ছোট বড় প্রত্যেক বস্তুকে একটি প্রকৃষ্ট বা বিশেষ্যমূলক নাম প্রদান করতে পারে, যাকে ইংরেজিতে বলে 'proper name'। মানুষের ভাষা, যা দ্বারা আমরা আমাদের মনোভাব একে অন্যের নিকট ব্যক্ত করতে পারি; একজনের মনের ধারণা অন্যের সাথে আদান-প্রদান করতে পারি, তা মূলত 'নাম বাচক'।

মানুষের নাম নির্ধারণ করার সামর্থ্য এবং ধারণার আদান-প্রদান করার পারঙ্গমতা, যা সুগঠিত ভাষায়, নাম বাচক শব্দের ও বাক্যের মাধমে করা হয়, এটা হল মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নামের দ্বারা বস্তুকে চিহ্নিত করা এবং শব্দের মাধমে তা পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা, কার্যতঃ মানুষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যরূপে সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। আল কুরআন বলে যে, মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দর বিবরণের মাধ্যমে ভাব ব্যক্ত করার মাহাত্ম্য শিক্ষা দিয়েছেন (আল্লামাহুল-বয়ান)।[৪]

সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে, প্রকৃষ্টভাবে বা যথাযথভাবে নামকরণের বিদ্যা (ইল্‌ম) এবং সুন্দর বর্ণনাভিত্তিক ভাব প্রকাশের অলঙ্কার শাস্ত্র, ফাছাহাত ও বালাগত, Rhetoric and prosody হল মানব জাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্য। অতএব, যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নেয়া যায় যে, আদম-হাওয়ার সন্তান-সন্ততি, তথা সমগ্র মানব জাতি প্রকৃতিগতভাবে নামকরণের বিদ্যা এবং ভাষাগত অভিব্যক্তির অধিকারী।

পরিমাপের জ্ঞান

জ্ঞানের সূচনা পরিমাপ থেকে হয়। জ্ঞানের পরিমাণ যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন বস্তুর গুণাগুণ, পরিমাপ ও পরিমাণ এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিরূপণের মাধ্যমে

CS CamScanner

সম্পন্ন হয়। নিছক জানা ও জ্ঞানের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে জানাটা অনুমানগত; আর জ্ঞানের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাপ প্রয়োজন। কোনো বস্তুর সংজ্ঞায়ন গুণাগুণ, পরিমাপ, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের মধ্যে নিহিত। পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্বে এরূপ বিষদভাবে জানার বিষয়ক প্রক্রিয়াকে Definition বলা হয়, যা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটলের লজিক বা যুক্তিবিদ্যার প্রতিপাদ্য। প্রাচ্যের জ্ঞানতত্ত্বে খ্রিষ্টিয় ছয় শতকের চত্বরে গৌড়পাদাচার্যের বেদ-বেদান্তিক দর্শনের 'আগম শাস্ত্রের' আদলে এরূপে গুণাগুণ, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণের মাধ্যমে কোন বস্তুকে জ্ঞানীয়ভাবে পরিমাপ করার প্রক্রিয়াকে, বলা হয সংজ্ঞায়ন।[৫] আর আরবি ভাষ্যে এটা 'তা'রীফ'[৬] নামে আখ্যায়িত।

আগম শাস্ত্র, সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করে যথা- (ক) লৌকিক জ্ঞান, যাতে বস্তু ও সংজ্ঞা উভয়ই জ্ঞানসন্ধানীর সম্মুখে উপস্থিত; (খ) শুদ্ধ লৌকিক জ্ঞান, যাতে কেবল সংজ্ঞাই উপস্থিত, আর (গ) লোকোত্তর জ্ঞান, যাতে বস্তু ও সংজ্ঞা কোনোটিই উপস্থিত নয়, বরং যাতে বস্তু, জ্ঞানী ও জ্ঞাত একীভূত হয়ে সত্যে একাকার হয়ে যায়।[৭]

সরল কথায়, জ্ঞান অন্বেষণের প্রথম স্তর হলো 'অনুভূতি', দ্বিতীয় স্তর হল জানা ভিত্তিক 'ধারণা' এবং তৃতীয় স্তর হল সত্যিকারের জ্ঞান বা 'সত্য জ্ঞান'। খ্রিষ্টপূর্ব চার শতকের গ্রিক প্রাজ্ঞ মহামতি সক্রেটিসকে এই সূত্রে আমরা স্মরণ করতে পারি, যিনি প্রচার করেন যে, 'Knowledge is conceptual' (জ্ঞান ধারণামূলক)।[৮] এ প্রবচনটি আগম শাস্ত্রের দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞানতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাকে কিনা বলা হয়েছে "শুদ্ধ লৌকিক জ্ঞান" যাতে কেবল সংজ্ঞা, তথা বস্তুর সংজ্ঞায়িত ধারণাই উপস্থিত এবং যাতে উভয় বক্তব্য যথা- Knowledge ও Concept, একই স্তরীয় পর্যায়ে অবস্থিত। পক্ষান্তরে আগম শাস্ত্রে তৃতীয় স্তরীয় জ্ঞান, যা সত্যজ্ঞান, এবং যা লোকোত্তর স্তরে তথা meta-folk stage-এ অবস্থান করে, যা আদতে মানুষের সচরাচর জ্ঞানের নাগালের বাইরে সত্যিকার জ্ঞান বা সত্য জ্ঞানে অবস্থিত হয়, knowledge of reality, তাতে প্রাচীন গ্রিকরা পৌঁছতে পারেনি।

CamScanner

মহামতি সক্রেটিস এর এ প্রতিপাদ্য (dictum) 'জ্ঞান ধারণামূলক' (knowledge is conceptual) এর সূত্রমূলে, তাঁর সুযোগ্য দার্শনিক শিষ্য প্লেটো, জ্ঞানকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেনঃ Universal এবং Particular সার্বজনীন ও বেস্টিক।[৯] তৎপরবর্তী প্লেটোর শিষ্য মহাদার্শনিক এ্যারিস্টটল যুক্তিবিদ্যাকে একই সূত্রে শাণিত করে আরোহ, অবরোহ ও ফলশ্রুতি (inductive, deductive এবং consequence) logic এর উদ্ভাবন করেন এবং এই নব উদ্ভাবিত যুক্তিতত্ত্বের আদলে উদ্ভাবিত বিশ্বখ্যাত সিলোজিজম বা যুক্তিতাত্ত্বিক পদ্ধতি, syllogistic methodology এর গোড়াপত্তন করেন, যা সত্যিকারের সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান,[১০] তথা, a veritable science of definition-এ পরিণত হয়। এ ত্রিমাত্রিক সীলেজিজমের যুক্তিতত্ত্বের আওতায় এ্যারিস্টটল তৎকালীন বিশ্বব্যাপী প্রচলিত সমস্ত বিদ্যাকে একই পরিসরের আওতায় আনয়ন করে সিলোজিজমের তিন প্রতিপাদ্য বাহুঃ ম্যাজর-মাইনর-কনসিকোয়েন্স' ভিত্তিক বিশ্ববরণ্য সংজ্ঞায়নের বিদ্যার উদ্ভাবন করেন।[১১] সে সময় থেকে সংজ্ঞায়ন জ্ঞানতত্ত্বের অপরিহার্য মাধ্যমরূপে বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যযুগে এ মহা অবদানের জন্য এ্যারিস্টটলকে সাধারণভাবে বিশ্বজগতের 'প্রথম শিক্ষক' রূপে আখ্যায়িত করা হয়। মানব সমাজের জ্ঞান চর্চার একই প্রবাহে আমরা জিজ্ঞাস করতে পারিঃ সিলেজিজম যদি সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান হয়, তবে বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন কিরূপ হতে হবে?

বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন

কোনো কিছুকে সঠিকভাবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে ও বিশদভাবে জানতে হলে বস্তুটির যথাযথ সংজ্ঞায়নের প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়নের আশ্রয় গ্রহণ করতে সততই ইতস্ততঃ করেন এবং বলে থাকেন যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়নের কোনো প্রয়োজন নেই।

উদাহরণ স্বরূপঃ ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত একজন প্রসিদ্ধ আমেরিকান বিজ্ঞানী জন উডবার্ন (Woodburn) "সায়েন্স ডিফাইন্ড ভার্সাস ইনডিফাইনেবল (Indefinable)" অর্থাৎ "বিজ্ঞান সংজ্ঞায়িত বনাম

অসংজ্ঞায়নযোগ্য"- প্রবন্ধে বলেন: আদতে বিজ্ঞান এক ধরণের সমন্বিত এবং সুবিন্যস্ত জ্ঞান, যার প্রকৃতি নিছক সম্মিলিত বাস্তব ঘটনাবলি নয়; বরং একই সাথে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় উদ্ভাবিত, যা কোনোভাবেই অন্ধ বিশ্বাস ভিত্তিক 'ধারণা' প্রসূত নয়, ডগমেটিজম থেকে মুক্ত এবং লাগাতার বাস্তব জ্ঞানীয় প্রচেষ্টার আদলে অভিসিক্ত প্রকৃতির নিগড়ে সত্য আবিস্কারের লক্ষ্যে নিবেদিত বিশেষ জ্ঞান।[১২]

অন্য একটি উদাহরণ: ইউনেস্কোর "হ্যান্ড বুক ফর সায়েন্স টিচারস্ ১৯৮০" -এ প্রকাশিত বর্ণনায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিবরণে দেখা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে: বিজ্ঞান হল বৈজ্ঞানিকদের কার্যকলাপ (What scientists do)। অতঃপর সায়েন্সকে সংজ্ঞায়িত করার পরিবর্তে, তথা সায়েন্স (কি?) তা সংজ্ঞায়িত করার পরিবর্তে লেখক সায়েন্স 'কিরূপে' উদ্ভব হয়(?) তার বিবরণে ব্যাপৃত হয়। বিষয়টির তিনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বলেন: সতেরো শতকের তুলনায় বিশ শতকে বিজ্ঞান একটি বিপ্লব নিয়ে আবির্ভূত হয় যা একটি ভূমিকম্পের সাদৃশ্য। এতে বলা হয়, এহেন বিপ্লবের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রগতিশীলতার চূঁড়ায় এক ধরণের 'অনিশ্চয়তা' (Uncertainty) প্রদর্শন করছে এবং এর জ্ঞান প্রবাহ সার্বক্ষণিকভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। অতএব, বিজ্ঞানকে যদি জ্ঞান বলা হয়, তা হবে 'বিবর্তনশীল' জ্ঞান। প্রমাণসই (Prove) কথাটি অংক ও যুক্তি বিদ্যায় প্রয়োজ্য বটে, কিন্তু তা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সচরাচরভাবে প্রয়োগযোগ্য নয়। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন করার কোন প্রয়োজন নাই।

এরূপ এক প্রকার অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনোভাব নিয়ে, ডগমেটিজমের বিরুদ্ধাচরণ করে আংকিক সূত্রায়ণের প্রতি এবং ন্যায়শাস্ত্রের তার্কিক পদ্ধতির প্রতি, সন্দিহান বা স্কেপটিসিজম ভাব পোষণ করে যে, আধুনিক বিজ্ঞান, তাঁর কেবল একটি বিষয়ে স্থির নিশ্চিত যে, সব কিছুর শেষ প্রান্তে, যা কিছু বিজ্ঞানের জানা আছে তা ভুল প্রমাণিত হতে পারে।

যদিও এটা সবার জানা আছে যে, বিজ্ঞান একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে চলে, যার ভিত্তিমূল হল (ক) পর্যবেক্ষণ (খ) তথ্য-উপাত্তের

CamScanner

সংগ্রহ (গ) সাধারণ ধারণা (general concept) এর সূত্রায়ন (ঘ) একটি সন্দর্ভ (thesis)-এর গোড়াপত্তন (ঙ) একটি নিয়মনীতির উদ্ভাবন (চ) একটি থিওরির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, তবুও সংজ্ঞায়নের বেলায় বিজ্ঞান কেবল কট্টদর্শি (critical) নয় বরং পর্যাপ্তরূপে সন্দিহান (sceptic) অবস্থান গ্রহণ করে।[১৩]

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন করার জন্য ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *দ্য এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এন্ড এথিক্স* বিশ্বকোষে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয় এই বলে যে, সায়েন্স একটি এমন জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া যার অংশতঃ এর বিষয়বস্তুর দ্বারা এবং মুখ্যত: বাস্তব ঘটনা দ্বারা সংজ্ঞায়ন করা যায়, বরং আরো সুনির্দিষ্টভাবে এর আলোচ্য ঘটনাবলির পদ্ধতিগত বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যা 'এক্সপেরিমেন্ট' দ্বারা নির্ণিত।[১৪] বক্তব্যটি মূল ইংরেজি ভাষায় লক্ষনীয়, 'Science is a system of knowledge defined partly by its subject matter of more of objective facts, but mainly by the methods by which its data are reached and by the extent to which its conclusions can be experimentally tested".

"বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় যাতে মনোচিন্তা (introspection) বা নিজস্ব পরীক্ষা-নিরিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত এবং এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা নির্ণিত, তদুপরি (সর্ব প্রকার প্রযুক্তিগত সহায়ক দ্বারা সমৃদ্ধ) অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা নিরূপিত উপাত্তগুলোর উপর প্রয়োগ করার মাধ্যমে প্রাপ্ত"।

"Science is gained by observation including according to some introspection (or self-examination) and by experiment, but also by reflecting (with every available technical aid) on the data thus supplied."

বিশেষরূপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এমন একটি প্রকরণ, যা উপযুক্ত অন্বেষণকারীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারে, যারা পর্যবেক্ষণ ও এক্সপেরিমেন্টের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ দ্বারা স্বাধীনভাবে উক্ত বিষয়সমূহকে নিজস্ব অনুভবে পরিণত করে।

CamScanner

"Typically scientific knowledge is of such a kind, it can be verified by competent inquirers who repeat the observations and experiments and make them the subject of independent explexion".

বিজ্ঞান নিশ্চিতভাবে অন্যান্যদের প্রতি হস্তান্তরযোগ্য জ্ঞান। কিন্তু সাধারণ মানুষ নিউটনের রচিত 'প্রিন্সিপিয়া' শিরোনামের বৈজ্ঞানিক সূত্র সহজবোধ্য রূপে পায় না; কেননা সাধারণ লোকজন নিউটনের ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত ভাষার সাথে পরিচিত নয়, তাই তাঁর যুক্তিগুলো বুঝতে পারে না।

"Science is also essentially communicable knowledge. But average man does not find the science of Newton's principia very communicable, because he does not know the technical language and cannot follow the argument".

বিজ্ঞানের সূচনা ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার তথ্য উপাত্তের বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত।

"The beginning of science involves a process of selection from the data of the personal thought stream".

বিজ্ঞান আবশ্যিকভাবে একটি বিবরণমুখী সূত্রায়ন। এর লক্ষ্য হল, নৈর্ব্যক্তিক তথ্যসমূহের বিবরণ যা অভিজ্ঞতা ইত্যাদির পরীক্ষণমূলক বিবরণ যথাযথ সংক্ষিপ্ত এবং পরিপূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করে।

"Science is essentially descriptive formulation. Its aim is to describe the impersonal facts of experience in verifiable terms as precisely and completely as possible".

এটা কেন? (why) প্রশ্নের উত্তর দানের পরিবর্তে কিরূপ how(?) প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে।

"It answer the question how(?) rather than the question why(?)."

বিজ্ঞানের মৌলিক লক্ষ কোনো জিনিষকে পরিস্কারভাবে, পর্যাপ্তভাবে ও পারস্পরিক সম্পৃক্তভাবে দেখা, যাতে তা সঠিকভাবে সূত্রায়ন করতে এবং তার নিয়মনীতি (laws) আবিষ্কার করা সম্ভব হয়।

CamScanner

"The primary aim of scinece is to see things clearly, consistently and connectcdly, to formulate, to discover laws".

এটা অতঃপর বিজ্ঞানের পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি প্রদান করে এবং বলে: কোন সমস্যার বৈজ্ঞানিক পাঠে, তথ্যে উপনীত, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করাই হল বিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ।

It then turns to the methods of science and says: "The first step in scientific study of a problem is to get at the facts, to collect data".

অবশ্যই বর্তমান যুগে নব-নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক্ষিপ্র গতির এমন এক চমকপ্রদ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, ১৯৭০ সনের পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী হ্যান্স আলফাবেন সবাইকে সতর্ক করে বলেন: "যদি বিজ্ঞানীরা সর্বক্ষণ লাগাতার নিজেদেরকে পাহারায় নিবিষ্ট না রাখে, তাদের জ্ঞানার্জনের অবস্থা এরূপ হতে পারে যে, তাদের সঞ্চিত জ্ঞান নিছক বিশ্বাসে পরিণত হবে, যেমন বিগত দিনে পৌরানিক বিশ্বাস ছিল, যেমন ছিল টলেমী ও এ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা।[১৫]

"Indeed, the speed of newer scientific discoveries has assumed such a awesome proportion that, Hannes Alfaven, the 1970 nobel Laurate in physics warns: if scientists are not continuously on their guard, they may believe in mythical theories just as firmly as did Ptolemy and Aristotle".

বিজ্ঞানীদের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে এসে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অপারগতা লক্ষ করে, বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান গবেষক এম. আকবর আলী বলেন: এ কথা বলা অসমীচীন হবে না যে, যেসব বিষয়বস্তু বিজ্ঞান নামে পরিচিত, সেগুলো মূলত সমকালীন মানুষের অতি সাম্প্রতিক (up-to-date) জ্ঞানভাণ্ডার, যেগুলো সুত্রগতভাবে বিশ্লেষিত বিভিন্ন বিষয় বস্তুর জ্ঞান, যা ঐসব বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে মানুষকে সাহায্য করে এবং যেগুলো এক্সপেরিমেন্টের সাক্ষ্য-ছবুতের দ্বারা গবেষণাগারের ভেতরে ও বাহিরে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরা হয়, প্রায়শ: এগুলো কার্যকর প্রযুক্তিগত প্রায়োগিক সূত্রে উপস্থাপন করা হয়, তবে যদি এগুলো বিষয় বস্তুর ব্যাখ্যা

বিশ্লেষণে অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয় অথবা ঐ সব বিষয়ের কিছু বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হয়, কিম্বা এক্সপেরিমেন্টের দ্বারা প্রমাণিত না হয়, সেগুলোকে পুনঃসংস্করণ বা সংস্কার করা হয় অথবা পরিত্যাগ করা হয়।

"In view of these difficulties, a prominent Bengali historian of sciences, M. Akbar Ali says: It would not be very wrong to hold that various disciplines which are taught and known as science, are up-to-date knowledge of men about these matters as explained by theories which for the time-being help to understaud phenomena or a series of phenomena, and are generally supported by experiments in or outside laboratories, and often by practical technical applications, if and when they are found inadequate to explain other aspects of these pheaomena or the connected phenomena or are not proved by experiments, they are reformed of abandoned."

এরূপ পূণঃসংস্করণ বা পরিত্যাগের কার্যটি এক্সপেরিমেন্টের সাপেক্ষে করা হয় অথবা এমন সূত্রায়ন বা থিওরীর সাপেক্ষে যেগুলো অধিকতর যুক্তিযুক্ত হয় অথবা যেগুলো বিষয়টিকে বোধগম্য করার ক্ষেত্রে ঐ সব বিষয়সমূহের সব দিক দিয়ে অধিকতর পরিশুদ্ধ হয় এবং এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে বোধগম্য হয়।

"The reformation or omission is done in favous of experiment, theories which would be more plausible and would help understand more accurately these phenomena in all their aspects and are also supported by experiments."

অতএব বিজ্ঞানের নামে যা প্রচলিত, তা হল চিরবর্ধনশীল মানুষের জ্ঞান, যা পূর্ববর্তী যে সব ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে, নব নব ধারণাবলী যেগুলো এক্সপেরিমেন্টের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে, সেগুলোর সংযোজনে বর্ধিষ্ণু, কাজেই এরূপ চিরবর্ধনশীল জ্ঞান হল বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার।[১৬]

CamScanner

বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পদক্ষেপ তথ্য-উপাত্ত সঠিকরূপে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

"A second step is accurate registration of data".

বিজ্ঞানের সূচনা পরিমাপে প্রারম্ভ।

"Science beigns with measurement".

বিজ্ঞানের তৃতীয় পদক্ষেপ, তথ্য-উপাত্তগুলোকে যথা সম্ভব কার্যকর কাঠামোতে সন্নিবেশিত করা। তথ্য-উপাত্ত প্রায়শ: এতই বিপুল পরিমাণে জড় হয় যে, এগুলোর সমন্বয়ের জন্য পরিসংখ্যার বা জ্যামিতিক ছক অঙ্কনের পদ্ধতিগত সহায়তা গ্রহণ করতে হতে পারে।

"A third step in bringing the data into most useful form. These may be so numerous that some statistical or graphic divice is required for dealiug with them".

পরিশেষে, এই প্রক্রিয়ায় এমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভব হয়, যা অপরিমেয় না হলেও, তা সত্যের কাছাকাছি হতে বাধ্য।

"Finally, there is a science, which if not asymptomatic, is bound to be approximate".

একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম সূত্রায়িত বা প্রকাশিত করা হয় নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এবং পর্যাপ্ত সতর্কতার সাথে। তা থেকে পেছন ফিরে যাবার কথা ওঠে না, যদি না উক্ত পর্যবেক্ষিত বস্তুর উপাদানের মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

"A scientific law formulated on observed routine in the order of nature, and, if it has been estabilished with due care, there is no going back on it unless the properties of the materials observed, should change".

তবে হতে পারে যে, গৃহীত নিয়মটি কিছুটা কাছাকাছি সঠিক ছিল, হয়ত সংশ্লিষ্ট কিছু বাস্তবতা বাদ পড়েছিল, এমতাবস্থায় যখন তা প্রতীয়মান হয়, তখন পরবর্তীতে নিয়মটা পূনর্মূল্যায়ন করে বক্তব্যটি সংশোধন করা বিধেয়।[১৭]

CamScanner

"It may be, however, that the law was an approximate fit and left residual phenomena, a recognition of which subsequently led to a restatement of the law".

এতএব, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের নোবেল বিজয়ী আলফাবেন এর সাথে এ বিষয়ে সাধারণভাবে ঐক্যমত্য পোষণ করতে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের একটি সুবিন্যস্ত সংজ্ঞায়নের অনুসন্ধান করা বন্য হংস তাড়ানোর মতোই নিস্ফল।

আমাদের বক্ষ্যমান বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় আমরা আপাততঃ প্রাচীন গ্রিক ঐতিহ্যের তর্কশাস্ত্রের সূত্রগত থিওরিটিক্যাল পদ্ধতিতে বিশ্বজাগতিক প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করার প্রচেষ্টাকে পাশ কাটিয়ে, আমাদের দৃষ্টিকে কার্যকর ও এক্সপেরিমেন্ট ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরিক্ষার ব্যবহারিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চত্ত্বরে নিবদ্ধ করব। এহেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঢুকতে গিয়ে প্রথম পদক্ষেপেই তর্কশাস্ত্রের লজিককে প্রচন্ড হোঁচট খেতে হয়: 'কেন(?)' এর প্রশ্নকে 'কেমনে(?)'-র প্রশ্নে রদবদল করতে গিয়ে। কেননা, বিজ্ঞানীরা সবাই একমত যে, ব্যবহারিক বিজ্ঞান বর্তমান যুগে কোন কিছু কেন(?) ঘটে বা কেন হয়(?) তা নিয়ে বিব্রত হয় না, মাথা ঘামায় না বা তা বিবেচনা করার প্রয়াস পায় না। অবশ্যই বিজ্ঞান আধুনিক বিদ্যমান পরিস্থিতিতে, সরাসরি কোন কিছু কিরূপে(?) ঘটে, কি রূপে(?) সংঘটিত হয়, তাই একমাত্র বিচার বিবেচনা করে। আধুনিক বিজ্ঞান why(?)-এর থেকে how(?) এর দিকে ফিরে দাঁড়ায়। সূত্রগত প্রশ্ন কেন(?) কে তারা দর্শন ও ধর্মের হাতে হস্তান্তর করে। বিজ্ঞান কার্যকর বাস্তবতার চত্ত্বরে কিরূপে(?) কোন প্রক্রিয়ায় ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয়, তাই পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে কেবল হৃদয়ঙ্গম নয়, বরং তদুপরি মানুষের বুদ্ধির আওতায়, তা নিজেদের আয়ত্তে বা কন্ট্রোলে আনতে উৎগ্রীব হয়।

এ কেন(?) ও কিরূপে(?) অর্থাৎ why(?) and how(?) এর দ্বন্দ্বের স্তরে আমাদেরকে জ্ঞানতত্ত্বের বা epistemology-র প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়। প্রশ্ন ওঠে জ্ঞান আদতে কি? জ্ঞান কাকে বলে?

এ পর্যায়ে মনে হয়, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা প্রাচীন গ্রিকদের বিশ্বজনীন জ্ঞানের ঐতিহ্যগত দৃশ্যপট ভেদ করে নতুন জ্ঞানের নবজন্ম প্রত্যাশা করে। তাই যৎসামান্য জ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনার অবতারণা করা যাক।

সর্বজন বিদিত যে, জ্ঞান কৌতুহল (Curiosity) থেকে জন্ম গ্রহণ করে। একমাত্র কৌতুহল ও বিস্ময়াবিষ্ট হলেই মানুষ প্রশ্ন করেঃ এটা কী? প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা অনুমান করেন যে, জানার জন্য curiosity ও inquisitiveness, তথা কৌতুহল, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, মানুষকে চারটি প্রাথমিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উদ্বুদ্ধ করে, যেগুলো হলঃ কী, কেন, কীরূপে এবং কী জন্যে (?)।

এ চারটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়ার অনুসন্ধিৎসার রেশ টেনে গ্রিক মহাদার্শনিক এ্যারিস্টটল এ গুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রশ্নগুলোর অভ্যন্তরীণ যোগ-সংশ্লিষ্টতা ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে, তাঁর সারগর্ভ বক্তব্য মূলে, সার্বজনীন জ্ঞানানুসন্ধানের ভিত্তি স্বরূপ চারটি কারণবাদের উদ্ভাবন করেন, যেগুলিকে তিনি বিশ্বব্যাপী অবস্থিত সব কিছুর মূলে Material, formal, efficient and final causes রূপে ব্যক্ত করেন। এগুলোর বাংলা অনুবাদ- পদার্থিক, আকৃতিগত, সক্রিয় ও চূড়ান্ত কারণ রূপে করা যায়, তবে এগুলো মহাদার্শনিক এ্যরিস্টটলের যুক্তিবাদের ভিত্তি হিসেবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ কারণতাত্ত্বিক বিশেষায়িত পদগুলোকে বুঝে নিতে হবে। এ টেকনিক্যাল টার্ম বা পরিভাষিক শব্দগুলো বাংলা ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত কঠিন।

এ্যারিস্টটলের মতে উক্ত চার প্রকার প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় চার শ্রেণির জ্ঞানের উদ্ভব হয়, যেগুলো সবই ধারণামূলক। বরং বলা যায়, এসব প্রক্রিয়াগত জ্ঞান সমষ্টি, যা উক্ত চারপ্রশ্ন ও চার কারণের উত্তর বা জবাব অনুসন্ধিৎসার আদলে ধারাবাহিকরূপে উদঘাটিত হয়, সবই সমষ্টিগতভাবে ধারণামূলক জ্ঞান বা Conceptual Knowledge-এর

CamScanner

সামগ্রিক জ্ঞানভাণ্ডার তৈরি করে, যেমনটি গ্রিক মহাজ্ঞানী সক্রেটিস, তাঁর মহাশিষ্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্লেটো ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী মহাদার্শনিক এ্যারিস্টটল মনে করতেন এবং তাঁদের প্রভাবাধীন পাশ্চাত্যের ক্ল্যাসিক্যাল, মিডাইভেল ও মডার্ন যুগের সমগ্র সেক্যুলার জ্ঞানীগুনিজনদের দ্বারা যা অনুসৃত হয়ে আসছে।

এ্যারিস্টটলের ভাবধারায় উক্ত চার প্রশ্ন ও চার কারণমালার ধারাবাহিক গতি প্রকৃতি বিদ্যমান রয়েছে, যাতে প্রথমটি দ্বিতীয়টির দিকে পরিচালিত হয়, দ্বিতীয়টি তৃতীয়টির দিকে ও তৃতীয়টি চতুর্থটির দিকে ধাবিত হয়। এ স্থলে বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানীদের প্রস্তাবনা যথাক্রমে what ও why (কী এবং কেন) কে বাদ দিয়ে how (কীরূপে) এর পরিচর্যা করা, বস্তুত: উক্ত ধারাবাহিকতার ডোর ছিন্ন করে, ধারণামূল জ্ঞান বা Conceptual Knowledge এর সূত্রগত (Theoretical) অবকাঠামোকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার শামিল। এটা একটি মূলগত প্রশ্নের জন্ম দেয়, যথা- কী পরিমাপে, অথবা কী প্রকারে, পরিমাণগতভাবে ও প্রকৃতিগতভাবে How(?), what(?) এবং why(?) থেকে ভিন্নতর? অনুরূপভাবে বিবেচ্য How(?), চূড়ান্ত প্রশ্ন বা Final question what for(?) থেকেও কি প্রকারে ভিন্নতর?

এ্যারিস্টটলিয় প্রশ্ন ও কারণগুলোর ধারাবাহিকতার নিরিখে, এবং এগুলোর ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বিচারে, যে কেউ How (?)-এর অবস্থিতি অপর তিনটি প্রশ্নের অবস্থিতির একই পর্যায়ভুক্ত জ্ঞানতত্ত্বের শ্রেণিভুক্ত বলে বিবেচনা করতে বাধ্য, যেহেতু উক্ত চতুর্প্রস্ত পারস্পরিক সম্পর্কে সংযুক্ত হয়েই ধারণামূলক জ্ঞান বা conceptual knowledge-এর পূর্ণমানের জ্ঞানভান্ডার প্রতিষ্ঠিত করে।

অতএব, How(?) বা কীরূপের প্রশ্ন কি অসম্পূর্ণ থাকা ব্যতিরেকে, একা একা বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হতে পারে? অথবা নিজেকে ঘোরতরভাবে ঘায়েল করা ছাড়া, তা কি একাকী পথ চলতে পারে? কিংবা তা

CamScanner

কি ধারণামূলক জ্ঞানভান্ডারের উপর অপর্যাপ্ততার ও অপূর্ণতার দোষ আরোপ করা ছাড়া, একাকী নিজেকে চলমান করতে পারে?

সুতরাং How(?) কে বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা আমাদেরকে একটি জঘন্য পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করে, স্থিরচিত্তে গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে বাধ্য করে যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিজ্ঞানী বন্ধুরা কি How(?) এর গুটি ছুঁড়ে ধারণামূলক জ্ঞানের (Conceptual knowledge-এর) সীমানা বিস্তার করে পরিসর বাড়াতে চান অথবা ধারণামূলক জ্ঞানের দেয়াল ছেদ করে এর পরিসরকে ধ্বংসের মুখে নিপতিত করতে চান? এহেন জটিল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান কল্পে আমাদেরকে বাধ্যগতভাবে ধারণামূলক জ্ঞানতত্ত্বের আদ্য-অন্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচ্ছিন্নভাবে How(?)-এর বিচরণের বিচার বিবেচনা করতে হবে।[১৮]

ধারণামূলক জ্ঞানের পরিসর বিবেচনা

স্মরণ করা যেতে পারে যে, গ্রিক মহাজ্ঞানী সক্রেটিস বলেন: "জ্ঞান ধারণামূলক"। প্লেটোর মহাশিষ্য এ্যারিস্টটল এ আপ্ত বাক্যটিকে চূড়ান্ত জ্ঞান রূপে গ্রহণ করে, এরই ভিত্তি মূলে তাঁর বিশ্বপ্রসিদ্ধ ত্রিপদী যুক্তিবিদ্যা (syllogistic logic) গড়ে তুলেন। শুধু তাই নয়; তিনি একই ভিত্তি মূলে তাঁর জড়বাদী দর্শনও (Materialistic Philosophy) প্রতিষ্ঠা করেন। কি না ভেবে অথবা কোন বিশেষ পরিস্থিতির আদলে, তিনি সক্রেটিস এর অধিকতর পরিপক্ক: "নিজেকে জানো" (know thyself) আপ্ত বাণীকে পাশ কাটিয়ে যান!

যখন সক্রেটিস বলেন: "জ্ঞানই পূন্য" (knowledge is virtue), তিনি নিশ্চয়ই "আত্মজ্ঞান" (self knowledge)-কেই নির্দেশ করেছেন। এ আত্মজ্ঞানের ধারণাটি হুবহু ভারতীয় আর্য ঐতিহ্যেও সংস্কৃত আপ্ত বাক্য "আত্মনং বিদ্বি", অর্থাৎ নিজ আত্ম বা আত্মাকে জানো, যা আত্মাকে জানার অর্থবোধক। কেবল self বা নিজেকে নয়?

CS CamScanner

'আত্মনং বিদ্বি' আপ্ত বাক্যটি সংস্কৃত সাহিত্যে কেন্দ্রীয় অর্থবহ গুরুত্ব বহন করে। এর সরল অর্থ নিজ আত্মাকে জানো; বিদ্বি মানে তুমি জানো; বিদ্বি থেকে বিদ্যা। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানীয় ঐতিহ্যে আত্মনং বিদ্বিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ রূপে গ্রহণ করা হয়। এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বৈদিক উপনিষদিক দর্শনে জ্ঞানের শ্রেণি বিভাগ নিম্নরূপঃ

বিভু তৈজস প্রজ্ঞা তূর্য = জ্ঞান চার শ্রেণিতে বিভক্ত।

ক. বিভু হলোঃ বাহ্যিকভাবে জানা। কোন কোন কিছুর বাহ্যিক অবয়বের জ্ঞান। যা ইংরেজি ভাষায় knowledge of appearance; sense perception; অনুভূতির দৃশ্যতঃ জ্ঞান, তথা বাহ্যিকভাবে জানা, which is phenomenal, যা খাঁটি জ্ঞান নয়। উদাহারণ স্বরূপঃ আমি মাঠে একটি গরু চরতে দেখলাম।

খ. বৈদিক সংস্কৃত ঐতিহ্যে, খাঁটি বা আসল জ্ঞান নিজেকে জানা, আত্ম জ্ঞানেই আসল জ্ঞানের সূচনা হয়, যা হল অভ্যন্তরীণ জ্ঞান, যাকে বলা হয় তৈজস। এটা হল আকৃতি প্রকৃতিতে জানা। যেমন- বলদ গরু, দুধান গাভী ইত্যাদি।

গ. তৈজস জ্ঞান সম্মুখে অগ্রসর হয়ে, গভীরতর বা উচ্চতর দিব্য, স্বর্গীয়, অলৌকিক, মনোহর, সুন্দর জ্ঞানে পরিণত হয়ে 'প্রজ্ঞা' (Wisdom) এর জন্ম দেয়, যা মানুষের মানবোপযোগী সত্যসন্ধিৎসু জ্ঞান। মানুষের চূড়ান্ত জ্ঞান। মনুষ্য প্রকৃতি, man বাচক, নয়; বরং মানব প্রকৃতির, Human বাচক; যথা, মানবিক, humanitarian.

ঘ. এ তিন প্রকার জ্ঞান, যথা-বিভু, তৈজস ও প্রজ্ঞা, যথাক্রমে সাধারণ জ্ঞান, আত্ম জ্ঞান ও দিব্য জ্ঞানকে সংস্কৃতিতে তত্ত্ব জ্ঞান বলা হয়। এর প্রথম ধাপে মানুষ অনুভূতির জ্ঞান অর্জন করে, দ্বিতীয় স্তরে মানুষ বিবেকের সান্নিধ্যে সত্য বা ভালো-মন্দের জ্ঞান উপলব্ধি করে এবং তৃতীয় ধাপে মানুষ জ্ঞান সমৃদ্ধ বিজ্ঞজনে পরিণত হয় এবং প্রকৃত সুখ উপভোগ করে।

CamScanner

অতঃপর এ চতুর্থ ধাপে আত্মিক জ্ঞানে স্নাত হয়ে সত্যের মধ্যে একাকার হয়ে যায়।[১৯]

এ চতুর্থ স্তরে মানুষ নিজের দৈহিক অনুভূতি, মনপ্রাণের চিন্তা ও মনন শক্তির, আদ্য-অন্ত চিন্তা ধান্ধাকে তৃতীয় স্তরে হৃদয়গ্রাহী অন্তঃকরণে স্নাত করে, চতুর্থ স্তরের হৃদয়পটে আত্মার সান্নিধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন মানুষ সত্যের মাঝে ডুবে গিয়ে সত্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। এ অবস্থাকে সংস্কৃতে 'সিদ্ধ' হওয়া বলে; মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে যেমন বিদ্যান হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনা বলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সাধুতে পরিণত হয়। ধর্ম মাত্রই আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক এবং আধ্যাত্মিক সাধনাই ধর্মের কলকাঠি।

এ আধ্যাত্মিক সাধনা প্রক্রিয়াকে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্ট ধর্মে 'মেডিটেশন' (Meditation) বলা হয় এবং ইসলাম ধর্মে বলে 'যিকির'। তাই ভারতীয় আর্য্য ধর্মের ঐতিহ্যে যেমন সাধনা বলে মানুষ সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি ইসলামের ধর্মীয় ঐতিহ্যে 'যিকির' আযকারের সাধনা বলে মানুষ নিজ অস্তিত্বকে মহাপ্রভু আল্লাহর অস্তিত্বের মধ্যে ফানা করে, তথা বিলীন করে, খোদ আল্লাহর অস্তিত্বের আদলে 'বাকা' প্রাপ্ত হয়, তথা স্থিতি বা স্থিতাবস্থায় পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়। মুসলিম সমাজে এরূপ যিকির আযকারের মাধ্যমে সিদ্ধ বা কামেল মানুষ ওলী, দরবেশ নামে পরিচিতি লাভ করে। এ স্তরগুলোকে বাংলা ভাষায় যথাক্রমে বলা হয়: অনুভূতি -তথ্যজ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞান-সত্যজ্ঞান।

এশিয়া-আফ্রিকার প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ঐতিহ্যে আধ্যাত্মিক সাধনা সর্বজনবিদিত, সুপরিচিত ও স্বভাবিকই বটে। কিন্তু পাশ্চাত্যের সর্বকালের ঐতিহ্যে এটা স্বভাবসিদ্ধ বা স্বাভাবিক ছিল না এবং এখনও বোধগম্য নয়। তাই এরূপ সাধনাকে পাশ্চাত্যের লোকেরা 'মিস্টিসিজম' (Mysticism) বা রহস্যবাদ রূপে বিবেচনা করে থাকে।

প্রাচীন গ্রিকদের জ্ঞান গরিমা বাহ্যিক জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত চত্বরে, যুক্তিবাদের দর্শনের ভিত্তিতে চলমান ছিল। তাদের যুক্তিবাদের চত্বরে মহাজ্ঞানী সক্রেটিস নৈতিকতা বোধের অবতারণা করতে চেয়েছিলেন। তিনি

প্রচার করলেন "Knowledge is virtue"। জ্ঞান মানে 'প্রকৃত জ্ঞান' বা পুণ্য। এ বক্তব্যটি প্রাচ্য জ্ঞানতত্ত্বের তৃতীয় স্তর স্পর্শ করে। কেননা চূড়ান্ত পর্যায়ে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন প্রাচ্য কেবল যুক্তিবাদে পরিতৃপ্ত নয়। জ্ঞানকে সত্যিকারের জ্ঞানদীপ্ত হতে হলে, তা ভালোমন্দ বিচারের নিরিখে পুণ্যের গুণ দ্বারা গুণান্বিত হতে হবে। তাই সত্যিকারভাবে বিচার করতে গেলে, একটি কর্ম বা ঘটনা কি রূপে যুক্তিযুক্ত হয় শুধু তাই বিচার করলে চলবে না, তা কি পরিমাণ পুণ্য বহন করে তাই দিয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। সক্রেটিস প্রাচ্যের এরূপ তত্ত্ব জ্ঞানের দিকে ঝুঁকে ছিলেন।[২০]

তিনি চেয়েছিলেন যুক্তিকে নৈতিক বা (Ethical) জ্ঞানের দ্বারা সিক্ত করতে। প্রাচীন গ্রিকদের অন্য একটি দল, যা নস্টিক (Gnostic) নামে পরিচিত, তারা আরো এক পদ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে রহস্যময়ী আত্মজ্ঞান 'নস্টিম' (Gnostim) এর তত্ত্ববাদী দর্শন গ্রিকদের নিকট উপস্থাপন করেন।[২১]

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোর মধ্যে এসবের কিছুটা প্রভাব লক্ষ করা যায়। লক্ষ করার বিষয় যে, তৎপূর্বেকার গ্রিক দার্শনিক এনাকজেগোরাস গ্রিক দর্শনকে বিশ্বায়ন করার প্রচেষ্টায় বিশ্বআত্মার (World Soul) ধারণা গ্রিক চিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ করাতে চেয়েছিলেন। তিনি ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এ বর্ণিত মহা ফেরেশতা জিব্রাঈল এর নাম হিব্রু ভাষায় 'নামুস' শব্দকে 'নাউস' (Naus) আকারে তাঁর বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বে প্রবর্তন করেন।[২২] পরবর্তী কালে প্লেটো তাঁর বহুমুখী 'ডাইলগ'গুলোতে এই 'নাউস' শব্দকে আত্মা বা (Soul) অর্থে ব্যাপকহারে ব্যবহার করেন।[২৩] কিন্তু এ তত্ত্বজ্ঞানের ঝুঁকিকে বাহুল্যতা জ্ঞান করে প্লেটোর শিষ্য ও উত্তরসূরী এ্যারিস্টটলের যুগে নৈতিকতার তত্ত্বজ্ঞানের কল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

অতএব, মহাজ্ঞানী সক্রেটিস এর নৈতিকতার ধারণা ও নস্টিকদের কিঞ্চিত আধ্যাত্মিকতার ভাবধারা, গ্রিকদের চিরাচরিত বাহ্যিক জ্ঞানতত্ত্বের চত্ত্বরে অনভিপ্রেত রহস্যবাদের তিমিরেই থেকে গেল। এ সব চিন্তা ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে, এ্যারিস্টটল উপরে উল্লেখিত চারপ্রশ্ন ও

CamScanner

চারকারণ নিঃসৃত বাহ্যিক জড়বাদী জ্ঞান (Materialistic Knowledge) তত্ত্বকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করেন।

গ্রিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ philoe+sophia= philosophia ফিলসফি, এর শাব্দিক অর্থ, তথা, (philoe+sophia= philosophy), (love of wisdom) যা জ্ঞান+তত্ত্ব, এটি যে, জড়অতীত বা পদার্থ অতীত জ্ঞানের অর্থবহ, তাও তিনি উপেক্ষা করেন। তা হলে, philosophy যদি meta+physics হয়, তবে তা পদার্থ বা জড় থেকে উর্ধগত অর্থবহ। পরবর্তীকালে ফিলসফীর গবেষকরা গ্রিক দশর্নকে মানুষের জড় জাগতিক জীবনের সাথে একাকার করে, সমস্ত ফিলসফিকে (Empirical) অর্থাৎ ভুঁয়োদর্শনলব্ধ, অভিজ্ঞতাজনিত ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান, তথা (Experiencial) জ্ঞানের অর্থবহ রূপদান করে। এতো সরাসরি বুদ্ধিগতজ্ঞানের বিপরীত অর্থ হয়ে দাঁড়ায়।[২৪]

খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতকে ইউরোপে খ্রিষ্ট ধর্মের উদ্ভব হলে, খ্রিষ্টান আধ্যাত্মিক, আত্মিক (Spiritual), অশরীরী ধর্মতত্ত্ব, (spiritual ideology-এর) সাথে গ্রিক ফিলসফির সংঘাত বাঁধে। ফলে খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা এ্যারিস্টটলের জড়বাদী দর্শন (Meterialistic Philosophy) নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাঁর রচিত সমস্ত গ্রন্থাবলি বাক্সবন্ধি করে তালাবদ্ধ করে রাখে। তবে তাঁরা প্লেটোর আদর্শবাদী, (Idealism), দর্শনের কিছুটা হেরফের করে, আদর্শবাদের আদলে খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব (Chirstian Theology) গড়ে তোলেন।

সে যাই হোক, খ্রিষ্টিয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে বর্ধিষ্ণু মুসলিম সাম্রাজ্যের ধ্বজাধারী উমাইয়া ও আব্বাসীয়া খলিফাদের সাথে খ্রিষ্টান রোমান সম্রাটদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং একটি চূড়ান্তযুদ্ধে রোমান বাহিনী আব্বাসীয় খলিফা মামুনুর রশীদ এর সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে, সন্ধির প্রস্তাব দেয়। এ সুযোগ উপলক্ষ করে, জ্ঞানান্বেষী খলিফা মামুন, রোমান সম্রাটের নিকট কয়েকটি শর্ত পেশ করেন, তন্মধ্যে একটি বিশেষ শর্ত ছিল যে, নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্তকৃত গ্রিক দর্শনের গ্রন্থগুলো খলিফার নিকট হস্থান্তর করতে হবে। ফলে গ্রিক ফিলসফির বহু গ্রন্থ, বিশেষ করে

CamScanner

এ্যারিস্টটলের গ্রন্থাবলি মুসলমানদের হাতে চলে আসে এবং সেগুলো খলিফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমার' (House of Wisdom) বিশ্বপ্রসিদ্ধ গবেষণাগারে আরবি ভাষায় অনূদিত হয়ে হৃদয়গ্রাহী উচ্চতর গবেষণার বস্তুতে পরিণত হয়। আমরা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে লক্ষ করেছি যে, খ্রিষ্টপূর্ব বারো শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় গবেষকরা এ্যারিস্টটল ও অন্যান্যদের গ্রন্থসমূহ, আরবি ভাষার অনুবাদ থেকে ল্যাটিন ভাষায় পুনঃঅনুবাদ করে আত্মস্ত করতে উদ্যোগী হয়।

অন্যদিকে, মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষকদের দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই, প্রথম বিশ্ব প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক-বিজ্ঞানী আল-কিন্দি (মৃ. ৯৫০ খ্রি.) "আল-মা-ইয়াতুল-ইলম" অর্থাৎ কি(?) প্রশ্নের জ্ঞানতত্ত্ব নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে তিনি এ্যারিস্টটলের চার প্রশ্ন ও চার কারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।[২৫] পরবর্তীতে এ্যারিস্টটলের প্রবর্তিত কি-বাচক প্রশ্নমালাঃ কী(?), কেন(?), কী রূপে(?) ও কীসের জন্য(?) বিষয়বস্তসমূহ আল-ফারারী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বহুলাকারে সংশোধন করেন। আরো পরবর্তীতে ইবনে সিনা ও আল-রাযী আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে, জ্ঞানতত্ত্বকে প্রাথমিকভাবে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন, যথা- সূত্রগত ও ফলিত। সূত্রগত জ্ঞানতত্ত্বকে তাঁরা অনুমিতি (inferential) অথবা ধারণামূলক (conceptual) জ্ঞান রূপে চিহ্নিত করেন, যা এ্যারিস্টটলীয় syllogistic (ত্রিমাত্রিক) methodology (পদ্ধতি)-র আদলে কী(?) শ্রেণির প্রশ্নাবলি থেকে নির্গত হয় এবং hypothetical basis (অনুমান সিদ্ধ ভিত্তিতে) সূত্রায়িত হয়। অতএব এটা অনুমিত সংজ্ঞায়ন (inferential) ভিত্তিক জ্ঞান। এটাকে ইবনে সিনা ও আল-রাযী আরবি ভাষ্যে 'তাসাওওর' অর্থাৎ 'মানসিক চিত্রব্যঞ্জক সূত্রায়ন', নামকরণ করেন।[২৬]

এই Hypothetical based definition, অনুমানসিদ্ধ সূত্রায়ন ভিত্তিক সংজ্ঞায়নকে 'তাসাওওর' আখ্যায়িত করে, এ theoretical knowledge-এর বিপরীতে এক্সপেরিমেন্টাল (experimental) জ্ঞানকে প্রতিস্থাপন করে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁরা কিসে তোমাকে বুঝালে যে

'কীসের কী(?)' প্রশ্নমালার উদ্ভাবন করেন, যাকে ইংরেজিতে বলা যায় "what of what group of questions," আরবি ভাষ্যে 'মা আদরাকা মা হিয়া', কীসে তোমাকে বুঝালো যে তা কী? প্রশ্নমালার আদলে 'উলুম আত-তাজরিবিয়া' 'এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স' এর উদ্ভাবন করেন।

কীসের - কী(?) প্রশ্নমালার আদলে জ্ঞানতত্ত্ব

মানব জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনা ও কার্যত: অভিজ্ঞতার চত্বরে যথাক্রমে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের আদলে, মুসলিম জ্ঞানসাধকগণ জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, যথা আপাত দৃশ্যমান (apparent) ও বাস্তব সত্য (real) এবং এ দুই প্রকার জ্ঞানকে নির্দেশ করার জন্য দুই প্রকার সংজ্ঞায়নের উদ্ভাবন করেন। প্রথমত, গ্রিক সিলোযিজমভিত্তিক অনুমিতি সংজ্ঞা (inferential definition)-কে কিছুটা সংশোধন করে ও কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি করে তাঁরা 'তাসাওওর' (মানসিক চিত্র) রূপে তাত্ত্বিক পর্যায়ে গ্রহণ করেন এবং এর নামকরণ করেন 'তা'রীফ'। আর অন্যদিকে, কার্যকর জ্ঞানকে নির্দেশ করার জন্য, তারা এক নূতন ধরনের এক্সপেরিমেন্টাল সংজ্ঞায়ন প্রতিষ্ঠা করেন 'হদ' বা তাহ্দীদ, অর্থাৎ 'সীমায়িত সংজ্ঞা' নামে। মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীরা 'তাসাওওর' (inferential)-এর জ্ঞানকে গ্রিক দার্শনিকদের মতো সংজ্ঞায়িত করেন এই বলে যে, 'তাসাওওর' হল কোন বস্তর স্বরূপকে তার উপকারিতা ও অপকারিতা সমেত জানা।[২৭]এরূপ উপ-অপকারিতা সম্বন্ধে জানাকে তারা বলেন 'তা'রীফ' বা definition, সংজ্ঞায়ন। আর 'হদ' বা তাহদীদকে তারা বর্ণনা করেন এই বলে যে, 'হদ' হল কোনো বস্তুর পরিধি (বেস্টনী দেয়াল, boundary wall) নিরূপণ করা এমনি ব্যাপকভাবে (comprehensively) যাতে, উক্ত বস্তুর সর্বপ্রকার জাতিগত গুণাগুণ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বস্তুটিকে অন্য সব জাতীয় বস্তু থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথকীকরণ করে বা পার্থক্যায়ন করে, যা তাঁরা তা'রীফের বিপরীতে 'হদ' রূপে বর্ণনা করেন।

প্রণিধানযোগ্য যে, তাসাওওর বা মানসচিত্র, তথা ডেফিনিশন এর অর্থ-সম্প্রসারণ হয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে; আর 'হদ'-এর সম্প্রসারণ হয়

বিশ্লেষণে। ব্যাখ্যা হল (explanation)। আমরা একটি বস্তুকে, তার সাদৃশ্য অন্য বস্তুর তুলনা প্রদান করে ব্যাখ্যা করি, যেমন ঘুঘুকে কবুতরের মতো, কবুতরকে কাকের মতো, হরিণকে ছাগলের মতো বলে প্রকাশ করি। এটা অর্থবহ বটে, কিন্তু হুবহু বা exact উদাহারণ নয়। পক্ষান্তরে, বিশ্লেষণ মানে একই বস্তুর পরিমাণ-পরিমাপের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি তুলে ধরা, তথা বস্তুর বাস্তব ও সত্য বিবরণ প্রদান করা। তাই 'তাসাওওর' বা (definition) হল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ জ্ঞান; আর 'হদ' হল বাস্তব বিবরণ বা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ জ্ঞান।

ইসলামি পরিভাষায় তাসাওওর কে বলা হয়, "তা'রীফ আল-শাই বিল-আরাদিয়াত"- গুণাবলির দ্বারা কোন বস্তুকে ব্যাখ্যা করা; আর 'হদ' হল: "তা'রীফ আল-শাই বিল-যাতিয়াত"-কোন বস্তুকে তার সারবস্তু বা সারগর্ভ উপাদান দ্বারা বিশ্লেষণ করা। 'তাসাওওর'কে আরবি পরিভাষায় "তাসাও- ওর বিল-ওয়াজ্হে" বা অবয়ব দ্বারা বর্ণনা করাও বলা হয়; আর 'হদ'-কে 'তাসাওওর বিল-কুন্হে" অস্তিত্বের সারাংশ দ্বারা বিবরণও বলা হয়।

ইবনে সিনার মুনতেক বা যুক্তিতত্ত্ব

মধ্যযুগের মুসলমানদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইবনে সিনা যুক্তি বিদ্যাকে 'মুনতেক' নামে অভিহিত করেন এবং মুনতেককে একটি মননশীল কলা (Speculative art) নামে আখ্যায়িত করেন, যা মানুষকে একদিকে কোন বস্তুর গুণাবলির নিরিখে নামকরণ বা সংজ্ঞায়নের দিক নির্দেশ করে এবং অন্য দিকে বস্তুর সারবত্তা উপাদান সম্বলিত 'হদ' নির্ণয় করার পথ প্রদর্শন করে। এর প্রথমটি, জাতীয় গুণাবলির সংজ্ঞায়নকে তিনি 'সনাআত আল-নযরিয়াত' বা দার্শনিক প্রজ্ঞা নামকরণ করেন এবং দ্বিতীয় স্তরের, বিষয়বস্তুকে তিনি 'হাকিকত আল-হদ' 'সারবস্তু-চৌহদ্দি জ্ঞান' নামকরণ করেন। প্রথমটি হল দার্শনিক প্রজ্ঞা বা মননতাত্ত্বিক ফিলসফি; আর দ্বিতীয়টি হল প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঞ্জাত সুস্পষ্ট প্রজ্ঞান, যাকে তিনি

CamScanner

বলেন 'হাকিকত আল-বুরহান' যা আধুনিক যুগে সায়েন্স ও বিজ্ঞান নামে পরিচিত হয়। তিনি দ্বিতীয়টিকে, 'তাসদীক' অর্থাৎ 'সত্যসন্ধ'ও বলেন।

তিনি বলেন প্রকৃষ্ট জ্ঞান, 'তাসাওওর' বা ফিলসফি এবং 'তাসদীক' বা বিজ্ঞানের দুই মেরুর মধ্যে আবর্তিত হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যা বা লজিক এর কাজ হল এহেনজ্ঞানকে প্রকারভেদে মননশীল দার্শনিক মেরুতে এবং/অথবা সত্যসন্ধ বিজ্ঞানের মেরুতে পরিচিহ্নিত করা। তাই লজিক বা যুক্তিবিদ্যাও দুই প্রকার, এক প্রকার হল সূত্রগত তিনমাত্রিক দার্শনিক যুক্তি/গ্রিক লজিক ও অন্য প্রকার হল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাক্ষ্য ছবুত সম্বলিত, চারমাত্রিক বুরহান বা evidential logic। চারমাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল এক্সপেরিমেন্টাল ও চারমাত্রিক পরিক্ষিত ও নিরিক্ষীত জ্ঞান হল 'উলুম আত-তাজরিবিয়া' বা এক্সপেরিমেন্টাল বিজ্ঞান, (experimental science), যার ভুল অনুবাদ হল ব্যবহারিক বিজ্ঞান।[২৮]

আদতে মুসলিম জ্ঞানীগুণীরা এহেন দুই প্রকারের জ্ঞানতত্ত্বের বিভক্তি আল-কুরআনের নিরিখে উদঘাটন করেন। মানবজাতিকে আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্বপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন বা (nature and law of nature) হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্য আল কুরআন প্রায়শ: দুইপ্রস্ত প্রশ্নের অবতারণা করে। এর এক প্রস্ত হল 'কী(?) জাতীয়' এবং অপর, প্রস্ত হল 'কিসের কী(?)' জাতীয়। এহেন কী(?) জাতীয় প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের দায়িত্ব মানুষের সাধারণ জ্ঞানের উপর ছেড়ে দিয়ে, আল কুরআন দ্বিতীয় প্রস্তি প্রশ্নমালার উত্তর দানে ব্যাপৃত হয়। এর কারণ হল, কী(?) প্রশ্নমালার চারপ্রশ্ন, যথা-কী(?), কেন(?), কী রূপে(?) ও কীসের জন্যে(?) সামগ্রিকভাবে, ব্যাখ্যাজনক উত্তর অন্বেষণ করে; অন্যদিকে কিসের কি(?) প্রকরণের প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণাত্মক উত্তর তালাশ করে এবং এর সুদূরপ্রসারী পরিণতির বিচার বিবেচনায় আত্মনিয়োগ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা জিজ্ঞেস করি: তোমার নাম কি? তুমি এখানে কেন এসেছ?; তুমি কিরূপে আসলে?; এবং তুমি কীসের জন্য এখানে এসেছ? এতে আমরা জিজ্ঞাসিতজনকে তার অবস্থান 'ব্যাখ্যা' করার প্রত্যাশা করি।

CamScanner

পক্ষান্তরে, আমরা যখন কাউকে কিসের কি(?) প্রশ্ন করি, যেমনটি আল কুরআন বারংবার এহেন কিসের কি(?) প্রশ্নের অবতারণা করে, এর উত্তরে তার নিকট থেকে 'বিশ্লেষণাত্মক' উত্তরের প্রত্যাশা করা হয়, যাতে সে প্রশ্নকৃত বিষয়টির আদ্য-অন্ত, উদ্দেশ্য,আদর্শ ইত্যাদির বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা প্রদান করে প্রশ্নকারীকে আশ্বস্ত বা সন্তুষ্ট করতে চেষ্টিত হয়।

এর প্রমাণ স্বরূপ, আল কুরআন (সুরা আল-ক্বারিয়া) থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া গেলঃ

১০১:১-৩:
এক মহা প্রলয়ঙ্কারী দুর্যোগ!
কী সে মহা দুর্যোগ?
কী সে তোমাকে বুঝাল সেই মহা দুর্যোগ কী?

১০১:৪-৬:
সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায়।
আর পর্বতমালা হবে ধূনিত পশেমের ন্যায় তরবতর।

১০১:৬:৭:
তখন যার ভারী হবে (পুণ্য কর্মের) পাল্লা।
সে লাভ করবে সুখী জীবন।

১০১:৮-৯:
তবে কিন্তু যার হালকা হবে (পুণ্যের) পাল্লা।
তার স্থান হবে হাবিয়া নরকে!

১০১:১০-১১:
তোমাকে কিসে বুঝালো যে তাহা কী!
(উহা হল) প্রজ্বলিত আগুনের কুন্ডলী!

প্রনিধান যোগ্য যে, শুনতে অবাক লাগলেও এটা নির্ঘাত সত্য যে, আল কুরআন নাযিল হবার পূর্বে (খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকের

মাথায়) মানুষের চিন্তা ভাবনায় বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন দেখা যায় না। প্রাচীন কালে ব্যাখ্যাশাস্ত্রের ছড়াছড়ি ছিল। প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত হিসেবে, সংস্কৃত ভাষায় বেদ ব্যাখ্যা শাস্ত্রের উল্লেখ করা যায়। অতঃপর বাইবেল এর ল্যাটিন ব্যাখ্যা শাস্ত্র (Exegesis) এর উল্লেখ করা যায়। আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা করাকে 'শরাহ' বলা হয়।

আরবি ভাষায় 'শরাহ' কথাটির ছড়াছড়ি দেখা যায়। একশ' পৃষ্ঠার কোন সারগর্ভ আরবি গ্রন্থের পাচঁশত পৃষ্ঠা 'শরাহ' তত বিরল নয়। তবে আল-কুরআনের 'শরাহ' নিষিদ্ধ। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, আরবি ভাষায় যত কবিতা ও কাব্য গ্রন্থ আছে, এসবের ব্যাখ্যা অত্যন্ত জনপ্রিয়। পরীক্ষার প্রশ্নেও ব্যাখ্যায় ভর্তি। কিন্তু এ সবের বিশ্লেষণ হয় না। এমন কি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সা.-এর বাণীসমূহেরও (হাদিস গ্রন্থের) শরাহ হয়।

কিন্তু আল কুরআন মহান বিশ্ব স্রষ্টা প্রতিপালকের বাণী। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ হস্তে মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি জীবের মতো প্রতিপালন করেন। তিনি মানুষের সার্বিক কল্যাণে ধর্মগ্রন্থ ও বাণী অবতীর্ণ করেছেন। আল কুরআন আল্লাহর বাণী। মানুষের কল্যাণে আল্লাহর কথাগুলো অধিকতর সহজ বা কল্যাণকর করে কারো বলার সাধ্য নাই। দ্বিতীয়, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলো মহাপ্রভু আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকৃত; যেমন, বেদ, বাইবেল-এ মূল বাণীর সাথে ব্যাখ্যার সংমিশ্রণ হয়ে অর্থ বিকৃতি ঘটেছে। তাই কুরআনের ব্যাখ্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এতে কঠোরতা প্রদর্শন করার জন্য রসুল সা.-এর বাণীতে হাদিসে কুদসীতে, আল্লাহ নিজে বলেন: "যে কেহ কুরআনকে নিজস্ব মতামত দিয়ে ব্যাখ্যা করল, সে যেন নরকে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়।"

তবে রসুল সা.-এর হাদিসকে আল-কুরআনের ব্যাখ্যা রূপে গণ্য করা হয়; কেননা, আল কুরআন যেমন আল্লাহর 'প্রকাশ্য ওয়াহী' তেমনি রসুল সা.-এর নবুয়তী যুগের বাণী আল্লাহর গোপন অনুপ্রেরণা 'ইল্‌হাম' মূলে রসুল সা.-এর অন্তরে সন্নিবেশিত। অতএব, কুরআনকে রসুল সা.-এর

CamScanner

হাদিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। তবে কুরআনের অর্থ সম্প্রসারণ করে কুরআনের বাণী মানুষের হৃদয়ঙ্গম করার জন্য মুসলিম বিজ্ঞজনরা 'তাফসির' অর্থাৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কুরআনের 'অর্থ সম্প্রসারণ শাস্ত্রে'র উদ্ভাবন করেছেন।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে বলা যায়,ব্যাখ্যা হল এক শব্দকে তুলনীয় অন্য শব্দ দ্বারা আনুমানিক অর্থ সম্প্রসারণ করা, যেমন কাককে কবুতরের মতো বলা যায়। আর বিশ্লেষণ হল, মূল শব্দ স্থির রেখে এর মৌলিক উপাদানগুলোর বিবেচনায় অর্থসম্প্রসারণ করা, যেমন স্বাস্থ্য পরীক্ষকরা এক্সরের ফিল্ম ইলেকট্রিক প্লেইটে ধারণ করে রোগী এবং রোগের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষায় একমাত্র কুরআনের তাফসির বা বিশ্লেষণ শাস্ত্র আছে, অন্য কোন গ্রন্থের তাফসির নাই, অন্য সব গ্রন্থের কেবল শরাহ বা ব্যাখ্যা শাস্ত্র আছে।

প্রণিধানযোগ্য যে, একটি শব্দের, কথার বা বাক্যের বহুমুখী অর্থ সম্প্রসারণের জন্য ব্যাখ্যা হয়। আর একটি শব্দের, কথা বা নির্দেশের অভ্যন্তরীণ মৌলিক অর্থ ও যথাযথ তাৎপর্য উদঘাটনের জন্য তাফসির, বিশ্লেষণ বা (Analysis) হয়। ব্যাখ্যার দ্বারা ভাব বোধগম্য হয়; আর বিশ্লেষণের দ্বারা আদেশ নির্দেশ-এর বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম হয়। মহাপ্রভুর নির্দেশিত ধর্ম পালনে, ওয়াহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ (Revealed) প্রত্যাদিষ্ট আদেশ-নির্দেশের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়োজন অপরিহার্য। এ হেন চেতনা থেকে মুসলিম ধর্মবিশেষজ্ঞরা আল-কুরআনের দ্বিপ্রস্তীয় প্রশ্নমালা থেকে তাফসির-এর বিশ্লেষণ পন্থা উদ্ভাবন করেন।

তাফসির অর্থে বিশ্লেষনাত্মক পদ্ধতি, যা থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Analysis Methology)-র উদ্ভব হয়েছে, এর আলোচনায় ব্যাপৃত হবার পূর্বে, মনে রাখা প্রয়োজন যে, কি(?) শ্রেণির প্রশ্নমালা, what group of questions-এর ধারণামূলক (Conceptual) জ্ঞান, আল-কুরআনের ভাষ্যে স্বয়ং মহা প্রভু আল্লাহ মানব জাতির আদি-পিতা হযরত আদম (আলাইহিস-সালাম)-কে বস্তুসমূহের নামকরণের জ্ঞান (আল্লামাল-আদাল

CamScanner

আসমা কুল্লাহা, ২: ৩১) হিসেবে শিক্ষা দেন। এই নামকরণের বিদ্যার, মানব গোষ্ঠী যুগে যুগে উৎকর্ষ সাধন করে প্রাচীন যুগের খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ মহাজ্ঞানী দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের হাতে what category-র fourfold, চারপ্রশ্নমালার আদলে তৎকালীন জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করে।[২৯]

পরবর্তীকালে খ্রিষ্টিয় সপ্তম সতকের প্রথম দশক থেকে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের, আরবি চন্দ্র বছর হিসাবে প্রায় ৩৩ বছর নাগাদ আল কুরআন অবতীর্ণ হবার যুগে আল-কুরআনের 'মা-আদরাকা' বা 'দিরাআ'-র সূত্র অবলম্বন করে, উক্ত কি? জাতীয় প্রশ্নমালার অংশতঃ সম্প্রসারণ করে এবং অংশত: বিপরীতমুখী ভাবধারা অবলম্বন করে, তাফসির বা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, Analytical Methodology এবং 'উলুম আত-তাজারিবিয়া', এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান মুসলিম পণ্ডিতগণ উদ্ভাবন করেন।

সার সংক্ষেপ

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রথমত, সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মানবজাতিকে মহাপ্রভু আল্লাহ (সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা) কথার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করার সক্ষমতা প্রদান করেন, যা গোড়া থেকেই বিশ্বব্যাপী বস্তুসমূহের নাম করণের বিদ্যায় পরিণতি লাভ করে। এ বিরল গুণটি হযরত আদম ও মা হাওয়া আ.-এর বংশধরদের মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয়ত, মানুষের জ্ঞান বস্তুসত্তার গুণাগুণ, পরিমাণ ও বৈশিষ্টের মানসিক পরিমাপ নিরূপণ করার প্রক্রিয়ায় আরম্ভ হতে দেখা যায়, যা পর্যায়ক্রমে বস্তু নিচয়ের সংজ্ঞায়ন বা Definition উদ্ভাবনের দিকে পরিচালিত হয় এবং শেষ অবধি গ্রিক মহাজ্ঞানী সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের যুগে, তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণামূলে প্রকৃষ্ট সংজ্ঞায়নের বিদ্যায়, science of definition এ পরিণতি লাভ করে।

CamScanner

তৃতীয়ত, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়নের, definition of science এর বিবেচনায় উপনীত হয়ে, আমরা দেখতে পেলাম যে, বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে উৎসাহী নন এবং বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়নের বদলে তাঁরা একধরণের মুক্ত জ্ঞান (free knowledge), অন্ধভাবে যা মান্য করার ভাবধারা (dogmatism), থেকে মুক্ত, কল্পনা বিগর্হিত, সিলোযিজম, ইনফারেন্স ইত্যাদির কাটছাট নিয়ম, বাঁধা ধরা পদ্ধতির আওতা বহির্ভূত, চিন্তা ধান্ধায় আমাদেরকে লিপ্ত করতে উদ্যত হন। তাঁরা এমনকি সায়েন্স সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে আমাদেরকে সুনিশ্চিত জ্ঞানের বদলে সাম্ভাব্য জ্ঞানে বহন করে নিতে প্রয়াস পান। তাতে বিজ্ঞানের মধ্যে certainty-এর বদলে probability-ই অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

চতুর্থত, স্থির মস্তিস্কে আধুনিক বিজ্ঞানীরা আমাদের চিরাচরিত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিক জ্ঞানধারার 'কি'(?) এবং কেন(?)' (what and why(?) প্রশ্নের থেকে সরে এসে, 'কিরূপে(?)' প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে মনোনিবেশ করতে আহবান জানান, যাতে আমরা বাস্তব, এক্সপেরিমেন্টাল, পুনঃপরীক্ষণীয়, চির পরিবর্তনশীল, গতিশীল, কার্যকর জ্ঞান, মানুষ এবং প্রকৃতির রহস্য মূলে অন্বেষণ করতে ব্যাপৃত হই। এতে তাঁরা আমাদের প্রচলিত জ্ঞান ধারার বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহাত্মক ভাবমুর্তি অবলম্বন করে বসে। ইংরেজিতে বলতে গেলে, Assuming almost a rebellious attitude against the classical and medieval philosophical knowledge derived from the answers to the questions of what(?) in search of an objective, observational, experimental, verifiable, ever-changing, dynamic, practical knowledge of the secrets of man and nature.

পঞ্চমত, আল-কুরআনের জ্ঞানতত্ত্বের নিরিখে, আমরা এ্যারিস্টটল কর্তৃক প্রবর্তিত 'কি, কেন, কিরূপে এবং কিসের জন্য' প্রশ্ন মালার স্তরের বিপরীতে 'কিসের কি?' ধাঁচের প্রশ্নমালার মুখামুখি হই, যেখান থেকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, তথা উলুম

CamScanner

আত-তাজরিবিয়ার ভাবধারা আবিষ্কার করেন এবং এহেন সম্পূর্ণরূপে নূতন বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেন।

অতএব লক্ষনীয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা যেরূপ কষ্টসাধ্য উপায় ও চিন্তাভাবনার প্রেক্ষিতে সায়েন্স বা বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন বিষয়টি এড়িয়ে যেতে, এমনকি বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়নের সম্ভাবনাকে নাকচ করে, what, why, how এর বিচার বিবেচনায় নিমজ্জিত হয়েছেন এবং আমাদেরকেও তাতে স্নাত বা অবগাহন করাতে চেষ্টিত হয়েছেন, what, why কে বাদ দিয়ে how-তে প্রীত হয়েছেন, যা আপাতদৃষ্টিতে অমূলক ঠেকে। তাই আমরা পরবর্তীতে বিজ্ঞানের স্বরূপ বিচার বিবেচনা করতে চেষ্টিত হব।

CamScanner

নির্দেশিকা

১. ভারতীয় আর্যদের বেদের ওঁম এর ধারণা কুরআনে আসমাআ-র ধারণা, যেন্দ আবেস্তার 'নাম' এর ধারণা।

২. সুরা বাকারা, ২: ৩১, "আল্লাহ আদমকে বস্তুসমূহের নামকরণের জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। আল্লামা অর্থ ইল্‌ম শিক্ষা দিলেন, তথা বিজ্ঞান শিক্ষা দিলেন 'বস্তুসমূহের নাম করণের বিজ্ঞান'।

৩. সুরা বাকারা, ২: ৩১-৩৩।

৪. সুরা আর রহমান, ৫৫:৪।

৫. ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, অনুবাদ (গৌড়পাদাচার্য কৃত আগম শাস্ত্র বা বুদ্ধোত্তর বেদান্ত, নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ১৯৭৪ খ্রি., অধ্যায় ৪, পৃ. ৪৬।

৬. আরবি অভিধান 'মুনজিদ', বৈরুত, ১৯৪৯ খ্রি., পৃ. ১১৫।

৭. উপরোক্ত ৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৮. W.T. Stace: *A Critical History of Greek Philosophy,* London, 1950, p. 143.

৯. C. E. Joad: *Guide to Philosophy,* London, 1948, p. 259ff.

১০. W. Stanley Jevon: *Elementery Lessons in Logic*, London, 1882, p. 126 ff.

১১. Eduard Zeller: *Outline of the History of Greek Philosophy*, New Youk, 1955, p. 187 ff.

১২. John Woodburn: "Science definded versus Indefinable, a personal attemp to define science", *The Science Teacher*, Vol.34, No. 8, Nov. 1967, pp. 27-30.

১৩. UNESCO: *Handbook for Science Teachers*, Paris, 1980, p. 1.

১৪. James Hastinges ed. *Encyclopedia of Religion and Ethics*, pp. 252-58: "Science"

১৫. Ibid.

১৬. Malik Akbar Ali: *Science in the Quran*, Dhaka, 1976, p. 14.

১৭. Ibid. pp. 252-58.

১৮. 'জ্ঞান' তত্ত্বের পরিসরে আর্থ-সংস্কৃতির একটি চমকপ্রদ শব্দিক গঠন ইংরেজি ভাষার knowledge-এর 'kn' এর সাথে গ্রিক ভাষার gnostic এর 'gn' এবং ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার 'জ্ঞ'-এর শাব্দিক সাদৃশ্যতা ও অর্থগত একত্মতায় দৃষ্ট হয়, এগুলোর অর্থ হল জ্ঞান। তবে লক্ষণীয় যে, জ্ঞান বা knowledge হল যা অনুসন্ধান করা হয়। এর বিপরীত পক্ষে বিদ্যা বা learning হল যা অর্জন করা হয়, এবং যা জ্ঞানের প্রাথমিক সোপান, আদত 'জ্ঞান' নয়। তাই knowledge যদি know অর্থাৎ জানা (জা) থেকে হয়, তবে knowledge এর অর্থ হবে যা জানা গেল, অর্থাৎ বিদ্যা, যা অর্জন করা হয়, অতএব, এর অর্থ জ্ঞান (জ্ঞা) নয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের সম্মূখে অগ্রসর হতে হবে। জ্ঞা-জ্ঞান এর ইংরেজি হল to be wise, তা থেকে wisdom, জ্ঞান মানে জানা নয়, তাই knowledge মানে জ্ঞান নয়, 'বিজ্ঞান' নয়।

১৯. উপরের ৫নং টীকা দ্রঃ।

২০. ঐ, ৫নং টীকা।

২১. Frank Thilly: *A History of Philosophy*, p. 124 ff.

২২. উপরের ৫নং টীকা, পৃ. ৯৯ সামনে।

২৩. ঐ, পৃ. ২১১ সামনে, এবং Plato: *Republic*, Nous দ্রঃ।

২৪. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, *রাষ্ট্রদর্শন শাস্ত্রে মুসলিম অবদান*, মুকাদ্দিমা-উপক্রমণিকা, ঢাকা, ১৯৭৮ খ্রি., পৃ. ১।

২৫. George N. Atiyah: *Al-Kindi, The Plilosopher of the Arabs*. Islamabad, Pakistan, 1966, pp. 155-56.

২৬. নীচে দেখুন।

২৭. ফার্সি ভাষায় এটা এভাবে বলা হয়: "দানিসতন মাহিয়তে হার শায় বেনাফী ওয়া যরর-ই-আঁন"।

২৮. *ইসলামি বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউযন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ১৯৫-২০৫।

২৯. The answer to what-group of questions begins with the science of nomenclature given to Father Adam by Allah (SWT) (allama-l-adama–l-asmaa kullaha), which came to perfection in the syllogism of Aristotle.

CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ

এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স বা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের স্বরূপ উদঘাটনে আমাদের পূর্বকার আলোচনায় আমরা কয়েকটি বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ পয়েন্ট এর সম্মুখীন হই। প্রথমত, সাধারণ্যে বহুল প্রচলিত বিশ্বাস বা ধ্যান-ধারণার বিপরীতে, আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন গ্রিক ভাষায় এবং ল্যাটিন ভাষায় 'science' (সাযেন্স) শব্দটির কোনো অস্তিত নেই। মধ্যযুগের গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষাতেও এর প্রচলন পাওয়া যায় না।

খ্রিষ্টিয় বারো শতকে আরবি ভাষার 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' অর্থে 'উলুম আত-তাজরিবা'র অনুবাদ হিসেবে, ল্যাটিন ভাষায় 'scientiis' ডাবল 'i' যুক্ত বহু বাচনিক একটি শব্দ সর্বপ্রথম খ্রিষ্টিয় বারো শতকের দিকে আমাদের নজরে পড়ে।[১] এর পরবর্তীতে খ্রিষ্টিয় তেরো শতকে পাশ্চাত্যেও একজন খ্রিষ্টান ইসলামি জ্ঞানবিশারদ, রজার ব্যাকন, আরবি 'ইলম' একবাচনিক শব্দের অনুবাদরূপে ল্যাটিন ভাষায় 'scientia' এবং বহুবাচনিক স্বরূপ 'scientiae' শব্দের অবতারণা করেন।[২] তবুও জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থে পাশ্চাত্যে এ সব শব্দের প্রচলন হয়নি। পাশ্চাত্যের লোকেরা এবং গবেষকরা বিজ্ঞানকে 'Natural Philosophy' অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক দর্শন' নামেই আখ্যায়িত করে চলে খ্রিষ্টিয়-উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত।[৩]

খ্রিষ্টিয় উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে Natural Philosophy-এর বদলে যখন science সায়েন্স শব্দের দ্বারা আখ্যায়িত করতে আরম্ভ করে, তখন বিস্ময়করভাবে তারা পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের উদ্ভাবিত scientiis, scientia ও scientiae শব্দমালার ব্যবহারের পরিবর্তে 'science' শব্দের অবতারণা করেন, যা ইংল্যান্ডের খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা ইংরেজি কথ্য ভাষায় কুরআন ভিত্তিক আরবি 'আয়াত' শব্দের 'আল্লাহর নিদর্শন' অর্থের সমতূল্য অর্থবহ, খ্রিষ্টান ধর্মশাস্ত্রে 'sign of

God' অর্থে কিছুটা রহস্যবাদ 'mystery of the creation of God', অর্থে মহাপ্রভু গডের 'sign' 'চিহ্ন' নিদর্শন এবং মহাপ্রভু গডের 'সৃষ্টি রহস্য' অর্থে ব্যবহার করে।[৪] প্রনিধানযোগ্য যে, ইংল্যান্ডের খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকগণ 'science' শব্দটি সর্বদা 'God' শব্দের সাথে যুক্ত করে ব্যবহার করতেন, যেমন আমরা তাদের খ্রিষ্টিয় ১৩৪০ সনের ব্যবহারে দেখতে পাই। খ্রিষ্টিয় ১৪২৬ সনের এক ব্যবহারে আমরা শব্দটির বানানভেদে 'scyence' রূপেও দেখতে পাই। খ্রিষ্টিয় ১৬০১ সনের দিকে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, মহাকবি শেক্সপিয়ার science শব্দটি সেকুল্যার অর্থে 'mystery' বা রহস্য হিসেবে ব্যবহার করেন। উপরে আমরা আরো দেখেছি যে, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'science of God' মানে 'আল্লাহর নিদর্শন' অর্থেই এ বাক্যাংশটি ব্যবহার করেছেন।[৫]

অতএব, প্রশ্ন উঠে পাশ্চাত্যের পরবর্তীকালীন বিজ্ঞানীরা রজার ব্যাকন ও অন্যান্য পূর্বতন বিজ্ঞান গবেষকদের 'experimmtal science' এর জন্য 'sciens+entis' থেকে উদ্ভাবিত শব্দ 'scientia' শব্দ গ্রহণ না করে,বার শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত তৎপরিবর্তে 'Natural Philosophy' অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক দর্শন' পরিশব্দ ব্যবহার করলেন কেন? এর হেতু কি? ব্যবহারিক বিজ্ঞান তো কোনোভাবেই দর্শন বা ফিলসফি নয়। আর শেষ অবধি যখন 'প্রাকৃতিক দর্শন' পরিশব্দ বদলিয়ে তাঁরা উনিশ শতকের মাঝামাঝি 'বিজ্ঞান' শব্দ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখনও তাঁরা 'scientia' বৈজ্ঞানিক পরিশব্দের পরিবর্তে 'science', যা বিশুদ্ধ ল্যাটিন নয়, যাজকীয় পরিশব্দ ইংলিশ রূপে, কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত, তাই ব্যবহার করলেন কেন? প্রশ্নগুলো আপাততঃ খোলামেলা প্রতীয়মান হলেও, আদতে গুরুতর তাৎপর্যবহ! এগুলোর ঐতিহাসিক মূল্যমান অপরিসীম।

আমরা উপরে লক্ষ্য করেছি যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা খ্রিষ্টান ধর্মের ডগ্‌মা-বিরোধী নিষিদ্ধ জ্ঞান চর্চার অপবাদের শিকার হওয়ার ও কপারনিকাস, গ্যালিলিও গং এর মতো ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকদের হাতে ইনক্যুয়িজিশনের কঠোর শাস্তি পাবার ভয়ে কোনঠাসা ছিল। তাই

CS CamScanner

খ্রিষ্টান যাজকতন্ত্রের এবং পোপের কোপানলে পড়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে তারা চালাকি করে বিজ্ঞানের জন্য বৈজ্ঞানিক শব্দ 'scientia', pl. 'scientiae', ব্যবহার করার পরিবর্তে, সাদৃশ্যপূর্ণ যাজকীয় পরিশব্দ ইংরেজি কথ্য ভাষার science পরিশব্দ, এখতিয়ার করে এবং এহেন 'science' কে experimental-এর সাথে যুক্ত করে 'experimental science' রূপে ব্যবহার করে।

আমরা উপরে আরো লক্ষ্য করেছি যে, তাজরিবী উলুম (উলুম আত-তাজরিবিয়া) তথা Experimental Science, মুসলিম জ্ঞান গবেষকরা উদ্ভাবন করেছিলেন, যা তাঁরা বিশ্লেষণাত্মক ভাবধারা (analytical spirit) এর আদলে 'কিসের কী?' 'মা-দিরাইয়া' (what of what?) ভিত্তিক কুরআনী বাগধারা থেকে উদ্ভাবন করেছিলেন। আমরা এ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আল কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে, তথা ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে, বিশ্লেষণাত্মক ভাবধারা ও বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানীয় পদ্ধতি (Analytical spirit and analytical methodology) বিশ্বজগতের শৈল্পিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। কুরআনের আবির্ভাবের পূর্বে মানব সভ্যতা চিরাচরিত ব্যাখ্যা পদ্ধতির অনুসরণ করত; বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা ভাবনা মানব সভ্যতায় সর্বপ্রথম কুরআন মজীদ দ্বারাই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। কেননা, কুরআন মজীদ ব্যাখ্যা পদ্ধতি নাকচ করে বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়েই অবতীর্ণ হয়। তদুপরি আমরা লক্ষ করেছি যে, কুরআন সর্বতোভাবে 'বিশ্লেষণাত্মক' পদ্ধতির চত্বরে অবতীর্ণ হয়ে, মানব জাতির শিক্ষা-দীক্ষার জগতে নূতন জ্ঞান প্রকরণের 'চার প্রশ্নের' অবতরণা করে নূতন চার-প্রস্তী জ্ঞানতত্ত্বের জন্ম দেয়।

কুরআন ভিত্তিক চতুর প্রশ্ন হল: মা মাহিয়া, মা ইদরাকিয়া, তাজরিবা, তা'দিল; অর্থাৎ কী(?), কিসের কী(?), এক্সপেরিমেন্ট, যথার্থ ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্ত (Justifiable Conclusion)।

চতুর্প্রস্তী জ্ঞানতত্ত্ব, যা চতুর্প্রশ্নের উত্তর ও ফলশ্রুতিতে নির্ণিত হয়, তা হল: তথ্যজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, এক্সপেরিমেন্টাল জ্ঞান, সূত্রায়িত সিদ্ধান্ত।

CamScanner

আল কুরআনের ভাষ্যে 'অজানাকে তাজরিবী (experimmtal) পদ্ধতিতে জানার জ্ঞান' তথা 'অজানাকে জানার জ্ঞান' এর (ক) প্রথম পদক্ষেপ, পর্যবেক্ষণ (খ) দ্বিতীয় পদক্ষেপ তথ্যগত মূল্যায়ন (গ) তৃতীয় পদক্ষেপ তাজরিবী পরীক্ষা-নিরীক্ষা (ঘ) চতুর্থ পদক্ষেপ যথাযথ ন্যায়নিষ্ঠ তা'দীন/সমন্বিত জ্ঞান।[৬]

আল কুরআনের দিরাইয়া-র সমার্থবোধক শব্দ

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শেষাংশে আল কুরআনের সুরা আল-ক্বারিয়ার 'কিসের কী?' জোড়া (double set) প্রশ্নের অবতারণা আমরা লক্ষ্য করেছি। এতে বলা হয়েছে, 'কিসে তোমাকে বুঝালো যে সেটা কী' (মা আদরকা মা হিয়া)। লক্ষণীয় যে, এখানে 'আদরা-কা' শব্দটি 'দরাআ' থেকে উদগত। আরবি ভাষায় 'দরআ' মানে আকল, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সিদ্ধান্ত এবং এর একটি কার্যকরী অর্থ হল 'বন্যপশু ধরার ফাঁদ'। এখানে 'মা আদরা-কা মা হিয়া' দ্বারা তোমাকে ধাক্কা দিয়ে বলা হয়েছে, তুমি আকল খাটায়ে, বুদ্ধি খাটায়ে দেখ, এ বিস্ময়কর ব্যাপারটি কী? এটা একটি প্লীহা চমকানো কর্মকারক ঘোরালো প্রশ্ন। It is an objective querying dictum of the holy Qur'an.-এর উত্তর খুঁজতে বিষয়বস্তুকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য মুসলিম প্রাজ্ঞজনেরা পর্যায়ক্রমিক প্রশ্ন 'কী?', 'কিসের কী?', এর তৃতীয় ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্যে 'জরা' তথা 'অভিজ্ঞান' প্রয়োগ করে 'তাজরিবা' 'experiment' পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। প্রণিধান যোগ্য যে, experiment ও তাজরিবা, 'objective' পরিশব্দ *vis-a-vis* experience, অভিজ্ঞতা হল subjective পরিশব্দ। আমরা উপরে দেখেছি যে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রায় দুইশত বছর ধরে এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেছে। ইউরোপীয় প্রথম সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ রজার ব্যাকন, উলুম আত-তাজরিবিয়ার যে অনুবাদ 'experimental' করেছেন, তাতে তিনি কি (experience) অর্থ নিয়েছেন -না অন্যকিছু, এটাই ছিল প্রায় দুইশ বছর ধরে তাদের তর্কের বিষয়বস্তু।

CamScanner

তাই 'তাজরিবা' মানে অভিজ্ঞতা (experience) নয়, বরং 'অভিজ্ঞান' experiment, যা কলিকাতার হিন্দু পণ্ডিতগণ 'ব্যবহারিক' বলে অনুবাদ করে, উলুম আত-তাজরিবিয়া, তথা experimental science-কে বাংলা ভাষাভাষীর সম্মুখে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' রূপে উপস্থাপন করেছেন। আমরা এ ভুল অনুবাদের নিঃসঙ্কোচে অনুসরণ করে (experimental science)-কে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' বলে চালিয়ে যাচ্ছি।

আল কুরআনে এরূপ 'ডাবল সেট' জোড়া প্রশ্ন অহরহ উত্থাপন করা হয়েছে; কেননা, এটা কুরআনের বাকভঙ্গির বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই বটে। এরূপ জোড়া প্রশ্নগুলোর আদলে আল কুরআন মানব জীবনের বিভিন্ন জটিল সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করে, প্রত্যেকটির আদলে বিশ্ব জগতের সুশৃঙ্খল গতি-প্রকৃতিতে মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর প্রকৃষ্ট নিদর্শনাদি প্রদর্শন করে। উদাহারণস্বরূপ আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া গেল।

সুরা আল-ক্বদর (ক্ষমতা), ৯৭: ১-৫[৭]:

১. নিশ্চয় আমরা এটা (আল কুরআন) ক্ষমতার রজনীতে অবতীর্ণ করেছি।

২. এবং তোমাকে কিসে বুঝালো ক্ষমতার রজনী কী?

৩. ক্ষমতার রজনী (এমন এক রাত্রি) যা এক হাজার রজনীর চেয়েও উত্তম।

৪. তাতে অবতীর্ণ হয় ফেরেশতাগণ এবং পবিত্র আত্মা (মহা ফেরেশতা জিবরাঈল) তাদের মহান প্রভুর আদেশে; প্রত্যেক কর্মময় অবস্থায়।

৫. শান্তিময়তা বিরাজ করে প্রভাত উদয়ের আগ পর্যন্ত!

সুরা ইনফিতার, ৮২: ১৭-১৯:[৮]

১৭. এবং তোমাকে কি-সে বুঝালো মহা বিচার দিবস কী?

১৮. অতপর তোমাকে কিসে বুঝালো মহা বিচার দিবস কী?

CamScanner

১৯. তা এমন দিবস যে দিন কেউই কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতাধারী থাকবে না! সে দিন সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যাস্ত থাকবে (কেবল) আল্লাহরই হাতে!

সুরা হাক্কাহ, ৬৯: ১-৬[৯]

১. নিরেট সত্য!

২. নিরেট সত্য কী?

৩. কিসে তোমাকে বুঝালো নিরেট সত্য কী?

৪. আদ ও ছামুদ (জাতি) মিথ্যাচরণ করল মহা প্রলয়ঙ্কারী দুর্যোগকে!

৫. তবে ছামুদ (জাতি)-কে ধ্বংস করা হল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা!

৬. আর আদ (জাতি)-কে ধ্বংস করা হল এক প্রচন্ড ঝঁঞ্ঝা বায়ুর দাপটে!

আল কুরআনে ঘুরেফিরে বারংবার কী(?) ও কিসের কী(?) প্রশ্নের অবতারণা পূর্বতন বুদ্ধিশুদ্ধি, কল্পনা-জল্পনা, মতামত, মতবাদ, ব্যাখ্যা, explanation, opinion, interpretation ও theory এবং what not (!) ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রায়ন, সংজ্ঞায়ন, এক কথায় সামগ্রিকভাবে conceptual knowledge, বুদ্ধিবৃত্তিক মননশীলতার দিগদিগন্ত ভেদ করে, কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বেকার ব্যক্তি-বুদ্ধিজাত subjective ধ্যান-ধারণামূলক জ্ঞান তত্ত্বের ব্যতিক্রমে, এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীতে, বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাচাই-বাছাই করে, ব্যক্তি চিন্তা নিরপেক্ষ objective truth, নিরেট সত্যে উপনীত হবার জ্ঞান তত্ত্বের সূচনা করে, যা ব্যাখ্যাতাত্ত্বিক subjective জ্ঞানের বিপরীতে বিশ্লেষণ তাত্ত্বিক objective truth, বস্তুতাত্ত্বিক নিরেট সত্য জ্ঞানের পথ নির্দেশ করে।

আল কুরআনের প্রথম প্রত্যাদিষ্ট ওয়াহী, ঐশীবাণী বা দৈববাণী সম্বলিত প্রথম বাক্য[১০]: "পড় তোমার প্রতিপালক-প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন-সৃষ্টি করেছেন মানুষকে একটি (অলৌকিকতার) লটকানো (শুক্রানুজ ডিম্বানু সম্মিলিত) বিন্দু থেকে। এ অলৌকিকভাবে লটকানো বিন্দু বা 'আলাক' আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় জাইগট, তথা, শুক্রানু দ্বারা

নিসিক্ত ডিম্বানু ইউটারাস-এ লটকে যাওয়া অবস্থানকে বুঝি। এ সৃষ্টি কর্ম মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা নয়, বরং একটি কৌশলগত বাস্তব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সমাহার। শুক্রানু ও ডিম্বানুর যৌথ বা জোড়া সমাহার বাচ্চাদানির দেয়ালগাত্রে লটকে যাবার পূর্বাপর অসংখ্য শুক্রানু+ডিম্বানু বিন্দু বিসর্গ নিস্ফল হয়ে তলিয়ে যায়, একমাত্র যেটা বাচ্চাদানির গাত্রে লটকে যেতে সমর্থ হয় তা থেকে বাচ্চা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূচনা হয়। আর বাদ বাকি শত শত, হাজার হাজার শুক্রানু ও ডিম্বানু নিঃস্প্রাণ নিরেট বস্তুই থেকে যায়। তাই 'নাই' পর্যায়ের লটকানী বা 'আলাক' থেকে বিশ্বজাগতিক সচরাচর প্রাণী সত্ত্বার বংশ বৃদ্ধিজনিত সৃজন কর্মের ধারায় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর হুকুমে, আদেশে সৃষ্টি কর্ম আরম্ভ হয়। অতএব, অবাক বিস্ময়ে আমরা আল কুরআনের অবতীর্ণ লগ্নের প্রথম বাক্যটি আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলের বিশ্ব জাগতিক প্রক্রিয়ার একটি ফলিত উদাহারণ রূপেই দেখতে পাই।

প্রনিধানযোগ্য যে, প্রাণের সৃষ্টি কেবল শুক্র থেকেও নয়, আর কেবল ডিম্বাণু থেকেও নয়; বরং একটি 'নাই' পর্যায়ের 'আলাক' বা লটকানী থেকে জীবনের সূচনা হয়। অতএব, ফলিতার্থে প্রাণের সৃষ্টি নাস্তি থেকে আস্তিতে, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে, Nothing থেকে Something-এ উত্তরণ বটে। গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এহেন 'নাস্তি' থেকে 'আস্তি'র সৃজন প্রক্রিয়ার যেমনি একটি সাদামাটা সংঘটিত ফলিত এক্সপেরিমেন্ট, তাজরিবা, একটি ব্যবহারিক সমীক্ষা ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে, তেমনি এতে বিদ্যমান থেকে সৃষ্টির উত্তরন লগ্নে, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটি তোড়জোড় উল্লম্ফন, যার দাপটে প্রাণের সঞ্চার হয়, ফলোদয় হয়। এহেন সৃজনশীল উল্লম্ফনই তাজরিবী বিজ্ঞানের অন্তরাত্মা, মর্ম বাণী। বিজ্ঞানকে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক করতে, তাজরিবী বা এক্সপেরিমেন্টাল করতে, সাদামাটা বিচার বিবেচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে সাথে, সৃজনশীল উল্লম্ফন সূত্রডোর ধরতে উৎপ্রেরণা, ও উদ্দীপনায় উৎপ্রাণিত হওয়া চাই। তাই প্রকৃত অর্থে প্রকৃষ্ট বিজ্ঞান শিক্ষকের শিষ্যত্ব লাভেই সত্যিকারের বিজ্ঞানী হওয়া যায়। তাই বলি, বিজ্ঞানী হতে বিজ্ঞান শিক্ষা করা যথেষ্ট নয়, বিজ্ঞান সাধনা প্রয়োজন। সাধক বিজ্ঞানীই সত্যিকারের বিজ্ঞানী।

CamScanner

পুনরাবৃত্তি করে আবার বলি, আল কুরআনে যত্রতত্র double-set question, 'জোড়া জোড়া' প্রশ্ন দেখতে পাই। এক সেট হল: সাধারণ সংজ্ঞায়নের, definition এর; এগুলো 'কি'(?) প্রকরণের প্রশ্ন। এগুলোকে আরবি ভাষায় বলা হয় 'তা'রীফ', অর্থাৎ যাবতীয় গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণের সংজ্ঞায়ন। দ্বিতীয় সেট এর প্রশ্ন হল: 'কিসের কি(?)', যে গুলো সীমা নির্ধারণের, বা সীমা নিরূপণের সংজ্ঞায়ন; আরবি ভাষায় এগুলোকে বলে 'হদ' (হদ্দ, সীমা), অর্থাৎ আঙ্কিক: দৈর্ঘ্য-প্রস্ত-বেধ-উচ্চতা নিরূপণ। তাই তা'রীফ এর বিপরীতে বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়নকে বলে 'হদ'।

অতএব, বিজ্ঞানের 'সংজ্ঞায়ন' নাই বলাটা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর এক্সপেরিমেন্ট-এ টিকলে তা সঠিক, অন্যথায় তা বেঠিক, অর্থাৎ কিনা প্রত্যেক জিনিসটা কেমন বুঝতে হলে খেয়ে দেখতে হবে, বলাটা মূর্খতার পরিচায়ক। এরূপ কথা পণ্ডিত লোকের মুখে নিশ্চয়ই শোভা পায় না।

নির্দেশিকা

১. উপরের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২. ঐ

৩. ঐ

৪. ঐ

৫. ঐ

৬. ঐ

৭. আল কুরআন: *English Tronslation of Meaning and Commenteny*, King Fahad Holy Qur'an Printing Complex, 1992, C, E, p. 1985.

৮. Ibid. p. 1934

৯. Ibid. p. 1913/14

১০. Ibid. p. 1804

CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

তিন প্রস্তী বনাম চার প্রস্তী সংজ্ঞায়ন

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, আল কুরআন সচরাচর বা সাধারণভাবে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত মানুষের সহজাত কৌতুহল উদ্দীপক প্রশ্ন: 'কি(?)', what(?), মা, ইত্যাদি 'কি' জাতীয় প্রশ্নমালার পাশাপাশি (আল কুরআন) বিশ্ব সভ্যতার চত্বরে অন্য এক প্রকার প্রশ্নের অবতারনা করে, যা সাধারণ কৌতুহলের চত্বর থেকে আরো গভীরে গিয়ে, 'কিসের কি(?)', What of what(?), মা আদরকা মা হিয়া, (কিসে তোমাকে বুঝালো কিসের কি?), একটি নেহাত জটিল প্রশ্নের অবতারণা করে এবং আল কুরআনের স্তরে স্তরে তা বার বার উপস্থাপন করে, নিজ অবস্থানকে 'কি(?)' থেকে 'কিসের কি(?)'-এ সরিয়ে নিয়ে জটিল আলোচনার ব্যাপৃত হয়। ফলে এই দ্বিতীয় স্তরীয় প্রশ্ন ও উত্তরের উপর নিজের অবস্থানকে চিহ্নিত করে। মুসলিম জ্ঞানীগুণিরা এহেন দ্বিতীয় স্তরীয় 'কিসের কি(?)' সংস্কৃতির অনুসরণ করে 'উলুম আত-তাজরিবীয়া' নামক তাজরিবী বিজ্ঞান, এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স নামকরণকৃত একটি সম্পূর্ণ নূতন জ্ঞান তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। ফলে জ্ঞান তত্ত্ব মুসলমানদের হাতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর এক ভাগ হল পুরাতন ঐতিহ্যগত দার্শনিক তিনপ্রস্তী জ্ঞান। আর দ্বিতীয় নতুন প্রস্ত হল: মুসলমানদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নূতন উদ্ভাবিত চারপ্রস্তী বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রনিধাণযোগ্য যে, পুরাতন ঐতিহ্যবাহী তিন প্রস্তী জ্ঞান, দর্শন জ্ঞানের তিন মাত্রা হল:

Major-minor-consequence: ইংরেজি

কুবরা-ছোগরা-নতীজা: আরবি

আর ব্যাবহারিক বিজ্ঞান, তাজরিবী উলুম, এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স এর চার মাত্রা হল:

CamScanner

রিওয়ায়াত-দিরায়াত-তাজারিবা-তা'দীলঃ আরবি বৈজ্ঞানিক 'হদ' পদ্ধতির এ শেষোক্ত চতুর্প্রস্থীকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছেঃ

(ক) Collection of information or data (রিওয়ায়াত)

(খ) Ratianal verification and classification of data (দিরায়াত)

(গ) Experimeantal testing (তাজরিবা)

(ঘ) Verified formula or thesis (তা'দীল)

অতপর লক্ষনীয় যে, আল কুরআনের 'মা ইদ্রাকিয়া' 'কিসের কি?' তত্ত্বের নিগড় থেকে সৃজনশীল তাজরিবী বিজ্ঞানের আবিষ্কার পূর্বেকার মননশীল ইনফারেন্সিয়্যাল দার্শনিক জ্ঞানতত্ত্বের দিগদিগন্ত ভেদ করে এক নবনতুন বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান তত্ত্বের সূচনা করে। এ নবনূতন জ্ঞানতত্ত্ব সচরাচর- deriving knowledge or wisdom from experience নয়; বরং তা হল; to create or gaining new knowledge by means of experiment. Deriving knowledge হলো অভিজ্ঞতা প্রসূত, যা কর্তৃবাচক, subjective; পক্ষান্তরে creating knowledge or gaining knowledge, হলো কর্মবাচক, objective. এই 'experiment' শব্দটি ইংরেজি ও ইউরোপীয় কোনো ভাষায় ছিল না; এমনকি বাংলা ও সংস্কৃতেও ছিল না। এই নূতন জ্ঞানটা মুসলমানরা 'তাজরিবা' করে সৃষ্টি করে বা উদ্গত করে। তাই এ নবনূতন জ্ঞানকে তারা নামকরণ করল 'তাজরিবিয়া', যা কিনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 'অভিজ্ঞান' নূতনভাবে experiened করা হল। অধিকন্তু এরূপ নবলব্ধ জ্ঞান হিসেবে তা হল কুরআনী ভাষায় 'মা লাম্ ইয়ালাম' তথা 'অজানাকে জানার জ্ঞান', যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নব অভিজ্ঞান মূলে স্থির নিশ্চিতরূপে জানা গেল, বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান, 'objective knowledge'। তদুপরি, আরো প্রণিধানযোগ্য যে, এই জ্ঞান আহরণ করতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হয়, scientific methodology or experimental methodology বলা হয়, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্ষেত্রে একাধিক জ্ঞানতত্ত্বের সমন্বিত প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। তাই কার্য্যতঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বহুমাতৃক

CamScanner

জ্ঞানাদির সমাহার হতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ, পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অঙ্ক ও রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য।

অতএব, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বরূপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহুবাচনিক, pluralistic, এ জন্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আরবিতে এক বচনে 'ইলম' বলার পরিবর্তে বহুবচনে 'উলুম' বলা হয়, বলা হয় 'উলুম আত-তাজরিবিয়া', যার ল্যাটিন অনুবাদ করা হলো scientiae experimetalis ও ইংরেজি অনুবাদ করা হলো 'experemental sciences', প্রতি-শব্দটি বহুবাচনিক অর্থবহ, যদিও প্রচলিত ভাষায় এটাকে 'experimental secence' বলা হয়ে থাকতেও পারে। এহেন বিশ্লেষনের পরিপ্রেক্ষিতে এর বাংলা পরিশব্দ 'ব্যাবহারিক বিজ্ঞান' সরাসরি অশুদ্ধ এবং শব্দার্থিক প্রকরণে নির্ঘাৎ ভুল। বিজ্ঞান মানে সংস্কৃত ও বাংলার 'বিশেষ জ্ঞান' নয়। বিজ্ঞান মানে পরীক্ষিত-নিরীক্ষিত ফলিত জ্ঞান, নিরেট বস্তুনিষ্ঠ objective জ্ঞান, তাজরিবী জ্ঞান, experimental knowledge; অধিকন্তু বিজ্ঞান ইউরোপ-এশিয়া আফ্রিকার সংস্কৃতি-জাত বা ঐতিহ্যবাহী ধ্যান ধারণা প্রসূত নয়, এমনকি আরবি ভাষাতাত্ত্বিক 'ইসিম-ফেল-হরফ' প্রসূত নয়, তথা ব্যাকরণিক বিশেষ্য-বিশেষণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াজাত কোন প্রকার জ্ঞান প্রকারণও নয়। প্রকৃত পক্ষে এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স, উলুম আত-তাজরিবিয়া ইসলামের অলৌকিক ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের নব-উদ্ভাবিত চতুর-প্রন্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত: অজানাকে জানার কৌতুহল উদ্দীপ্ত সৃজনশীল মননতার যৌথ উপলব্ধ ফলশ্রুতি। এর মধ্যে 'theo' থিও বা দেও, 'ry' বা তত্ত্ব, তথা জিন, পরি, দেব, দৈত্য ইত্যাদির কথিত 'theory' বা দেবতত্ত্ব বা দেববাণীর কোন হাত-পাত নাই। 'উলুম আত-তাজরিবিয়া' মানব জাতির মানবিকতার সৃজনশীল উচ্চতর সত্যের উপলব্ধির পরিস্ফুরণ, আত্মবিকাশ জ্ঞান।

আরো বিস্তারিত সরলতর বিশ্লেষণ করে বলা যায়, কুরআনী মানবতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে মানুষকে তিনপাঠী জৈবিক সত্ত্বা হিসেবে কল্পনা করা যায়, যথা সজীব দেহধারী-প্রাণসম্পন্ন-আত্মা বিশিষ্ট প্রাণী।

CamScanner

প্রথমত, জৈবিক দেহধারী হিসেবে মানুষ উদ্ভিদ জাগতিক অস্তিত্ব ধারণ করে, উদ্ভিদ খেয়ে, ভিটামিন উদ্ভিদ খাদ্যসার গ্রহণ করে জীবন রক্ষা করে।

দ্বিতীয়ত, প্রাণসম্পন্ন সত্ত্বা হিসেবে, মানুষ প্রাণীজগতের পশুপক্ষির প্রাণবন্ত জীবন ধারায় উদ্ভিদের সাথে (vitamin এর সাথে) জৈবসার (protein) গ্রহণ করে, মাছ মাংসের জৈবিক খাদ্য ভক্ষণ করে প্রাণ রক্ষা করে, প্রাণীর বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠত্বের গুণে গুণান্বিত হয়ে, প্রাণী শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হয়। তবে বুদ্ধিমত্তার উৎস হল মস্তিষ্ক; আর মানুষের মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীসত্ত্বার মস্তিষ্ক থেকে আকৃতিতে বৃহত্তম, ওজনে সর্বাধিক ভারী এবং জটিলতম বিনুনিতে বিন্যাস্ত বিধায়, প্রাণী জগতের বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে মানুষ অনন্য, অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

তৃতীয়ত, আল কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী, মহান সৃষ্টিকর্তা (পরমাত্মা) মানুষকে নিজের আত্মা (পরমাত্মা), রূহ, soul থেকে ফুকে আত্মা (মানবত্মা), মানবিক রূহ, human soul প্রদান করেছেন, তাতে মানুষ রূহ, আত্মা, soul গুণে বিশ্বজগতের, সৃষ্টিজগতের যাবতীয় সবকিছুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। তাই কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ কেবল দেহ ও প্রাণধারী manic(!) animal, social animal, economic animal বা সামাজিক জীব, অর্থনৈতিক প্রাণী, বুদ্ধিমান প্রাণী নয়; বরং দেহ, প্রাণ ও আত্মাধারী human being, মানবিক সত্ত্বা; অধিকন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দেয়া, 'রূহধারী' হিসেবে, মানুষ হল ভালো-মন্দ বিচারের সামর্থ্যবান ও কর্তব্য প্রাপ্ত বিবেকবান সত্ত্বা, তথা মানবিক সত্ত্বা, human or humanitarian being। এহেন প্রেক্ষিতে মানুষের মানসিক প্রবৃত্তির, মনুষ্য প্রকৃতির পরিচয় ঘটে, অন্যান্য প্রাণীদের মতো জিহবাগ্রের আচরণে, লোভ লালসায়; আর মানুষের মানবিক সত্ত্বার, মানবতার প্রকাশ ঘটে লোভ-লালসা সম্বরণের মাধ্যমে, ভালো-মন্দ বিচার মূলে, বিবেকের নির্দেশ পালন করে অমায়িকতা প্রদর্শন করার কর্মকান্ডে। এক কথায়, মনু, মনুষ্য মানসিক ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায় লোভ লালসায় এবং মানব, মানবিকতার

CS CamScanner

প্রকাশ ঘটে ন্যায়নিষ্ঠ বিচার বিবেচনায়, ন্যায় বিচার ও নৈতিকতার ভিত্তিমূলে।

প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে, 'ইয়াওমুল জুমআ', জুমা বারে, মুসলমানরা সাপ্তাহিক জুমআর সালাত, উদযাপন করে। এই congregational prayer-এ ইমাম সাহেব একটি খুৎবা, sermon প্রদান করেন এবং এ খুৎবাটি পবিত্র একটি বাক্য পাঠে শেষ করেন: "অবশ্যই মহান আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন অনুগ্রহের সাথে ন্যায়বিচার করার জন্য, 'ইন্নাল্লাহা ইয়ামুরুকুম বিল-আদলি ওয়াল-ইহ্সান", যা ইংরেজি ভাষায় মহাকবি শেক্সপিয়ার প্রতিধ্বনি করে বলেন: "justice tempered with mercy" (Merchant of Venice) যা মানবিকতার Humanitarian গুণ সম্পন্ন। আল কুরআনের ভাষ্যে মুসলমানরা এহেন মানবিকতার কর্তব্য দ্বারা অদিষ্ট হয়েছে।

আল কুরআনের ক্ষুরধার, সুমধুর, প্রদীপ্ত, হৃদয়স্পর্শী আবেদন

আল কুরআনের জটিল দ্বিবাচনিক প্রশ্নমালার হৃদয়-কাড়া আবেগময় আবেদনের ফলশ্রুতি অনুধাবন করতে, আমাদের বর্তমান আধুনিক যুগের সাদাসিদা আবেগহীন তথাকথিক বস্তুনিষ্ঠ কথামালা, আদেশ-উপদেশের প্রাচীর ভেদ করে মুসলিম এবং তাদের ঘনিষ্ট প্রতিবেশী হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান বিজ্ঞজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমরা ইসলামের অভ্যুদয় কালের প্রাঞ্জল ইমানদার মুসলিমদের চৈত্য-চেতনা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, হৃদয়গ্রাহী নৈতিকতা ও উচ্ছল কর্মতৎপর জীবনধারার কিঞ্চিত বিশ্লেষণাত্মক কথ্য-কথার অবতারণা করতে চাই।

আল কুরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর বাণী। এর প্রত্যেকটি পূর্ণ বাক্যকে 'আল্লার নিদর্শন', 'আয়াত' বলা হয়। আল কুরআনে এরূপ প্রায় ৬২৩০টি বাক্য, বচন বা আয়াত আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটি আল্লাহর কথা, অলৌকিক তাৎপর্যবহ সততা ও সত্যের আলোকবর্তিকা, সৎ ইচ্ছা, সৎ চিন্তা ও সৎ কর্মের দিশারী। কুরআনের কর্ম তৎপরতা, সে সব কর্মকান্ড ইমানধারী

CS CamScanner

মানব জীবনকে দিনরাত বাধ্যতামূলক পাঞ্জেগানা ছলাত কায়েম করার মাধ্যমে সদা-সর্বদা ধর্মকর্মে ঘিরে রাখে, তা ইমানধারী মু'মিন মুসলমানের আত্মনিবেদিত অন্তরাত্মাকে সজোরে আকর্ষণ করে, জল্পনা-কল্পনামুখর মন-মেজাযকে সততা, নৈতিকতা ও সত্যনিষ্ঠতার প্রতি নমনীয় ও সংযত রাখে এবং ইসলামি সদাচারুদ্বুদ্ধ দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যকে ধর্ম রক্ষায়, ধর্ম প্রচারে ও ধর্মসম্প্রসারণে আত্মোৎসর্গিত আবেগোচ্ছাসে কর্মোদ্দীপ্ত, সজাগ, সচেতন ও সতেজ রাখে।

কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমান হবে আল্লাহ ও রসুল সা.-এর প্রতি আত্মসমর্পিত (মুসলিম), আত্মনিবেদিত (মু'মিন), আত্মোৎসর্গিত সংগ্রামী (মুজাহিদ), ন্যায়নিষ্ঠ, নৈতিকতা-উদ্বুদ্ধ, সামাজিক জীবন যাত্রায় মধ্যপন্থী, নিরলস-চরমপন্থাবিগর্হিত (উম্মাতুন ওস্ত্বা) ধর্মপ্রচারে ও সত্যপ্রতিষ্ঠায় চিরসংগ্রামী (মর্দে মুজাহিদ)। আল্লাহর রসুল সা.-এর সমসাময়িক ও পরবর্তী দুই প্রজন্মের ছাহাবী-তাবেয়ী-তাবে-তাবেয়ীগণের দৃঢ় ইমানী অবস্থান ছিল এরূপই।

মহান আল্লাহ বলেন:

> "(হে ইমানধারী মুসলমানগণ) এবং এভাবেই আমি তোমাদিগকে একটি মধ্যপন্থী মানবসমাজে (উম্মাতুল ওস্ত্বা) প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা অন্যান্য মানবগোষ্ঠীর উপর (দৃষ্টান্তমূলক) সাক্ষী হয়ে থাক এবং রসুল তোমাদের উপর (দৃষ্টান্তমূলক) সাক্ষী হয়ে অবস্থান করেন"। (সুরা বাকারা, ২: ১৪৩)
>
> "তোমরাই হচ্ছো দুনিয়ার সর্বোত্তম মানবসমাজ (উম্মা), যাদেরকে সমগ্র মানজাতির জন্য (দৃষ্টান্তরূপে) বের করা হয়েছে: তোমরা সৎকর্মের আদেশ দিবে ও অসৎ কর্মের নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যয় (দৃঢ় বিশ্বাস) স্থাপন করবে..."। (সুরা আলে ইমরান, ৩: ১১০)

অতএব, বলার অপেক্ষা রাখে না, ইসলামের উষালগ্নে আল কুরআনের আসাধারণ, অলৌকিক, প্রেমময় প্রমোত্ততার দাপটে উৎপ্রাণিত

CamScanner

ঐশী প্রত্যাদেশী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, সত্য গ্রহণ ও সত্যপ্রচারের সংগ্রামী চেতনায় উত্থিত হয়ে মুসলিম উম্মা 'আল্লাহু আকবর' বাণী শিরে ধারণ করে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-র ঝান্ডা উঁচিয়ে, একহাতে তলোয়ার ও অন্য হাতে কলম ধারণ করে দিগ্‌বিদিক কাপিয়ে একশত বছরের মাথায় দুনিয়ার এক প্রান্তে ভারতবর্ষের সিন্দুদেশকে পদানত করে, সেন্ট্রাল এশিয়ার তুর্কিস্থানে উপনীত হয় এবং অন্যদিকে ইরাক, সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা দখল করে, স্পেন বিজয় করে, ইউরোপের বক্ষদেশ ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে উপনীত হয়। এতে বিশ্ব ইতিহাসের মোড়ঘুরে যায়, নূতন ভাবধারা, নবনূতন চৈতন্য-চেতনা, ধর্ম, সংস্কৃতির গতিধারা, মানুষের সৃজনশীল সাধ্য-সাধনা, এক কথায়, মানব সভ্যতার বিশ্বব্যাপী নূতন জয় যাত্রার দ্বার উন্মোচিত হয়।

৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নবুয়াত প্রাপ্তির শত বছরের মাথায় ইসলামের ঐতিহাসিক পটভূমিতে মুসলিম উম্মার বিস্ময়কর সামাজিক বিবর্তন ও কল্পনাতীত রাজনৈতিক সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বৈশ্বিক প্রতিরোধ প্রতিক্রিয়ার চাপে স্তিমিত স্থিতাবস্থা ধারণ করলে, দিগ্‌বিজয়ী মুসলিম জনগোষ্ঠী বিজিত পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার বিশাল এলাকা, উত্তর আফ্রিকার বিস্তর উর্বরভূমি এবং ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদশালী স্পেন দেশ ও দক্ষিণ ফ্রান্সের বিরাট অংশে শান্তিপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে, রাজনৈতিক দলবলের চাহিদা অনুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অনুসারে ছোট বড় অনেক রাজ্য স্থাপন করে, তারা অসির যুদ্ধের স্থলে মসির সংগ্রাম, কলম যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। আরব, ইরানী, তুর্কি মুসলিম বিজ্ঞজনেরা কলম হাতে দিগ-বিদিগ জ্ঞান অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে।

আল্লাহর রসুল সা. বলে গেছেনঃ "প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর উপর জ্ঞান অন্বেষণ 'ফরয', অবশ্য কর্তব্য"। তিনি বলেছেন পরকালের পাপ-পূণ্যের বিচারের ক্ষেত্রে, হাশরের ময়দানে অসি-অর্জিত পূণ্যের সাথে মসি অর্জিত পূণ্যের পরিমাপ করা হবে, যাতে রসুলুল্লাহ সা.-এর কথা মতে, শহীদের রক্তের চেয়ে (ইমানধারী) জ্ঞানীর মসির মূল্য অধিক হবে।

রসুলুল্লাহ সা. এরশাদ করেন: যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণের জন্য পথ চলে, সে আল্লাহর রাস্তায় বিচরণ করে, পথিমধ্যে মারা গেলে সে শহীদ রূপে পরিগণিত হবে। রসুলুল্লাহ সা. বলেন: জ্ঞান অন্বেষণ কর চিন দেশেও যদি যেতে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন হলে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য চিন দেশে যেতে হলেও তথায় গিয়ে জ্ঞান অন্বেষণ কর। তিনি আরো এরশাদ করেনঃ জ্ঞান হল মুসলমানের হারানো মনি, তা যেখানেই পাও কুড়িয়ে নাও।

মুসলিম জ্ঞানীগুণীরা সিন্ধু বিজয়ের রেশ ধরে একদিকে ভারতীয় আর্য্যভাষা সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দারস্ত হয় এবং অন্য দিকে গ্রিক-রোমান সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ সিরিয়া ও আলেকজেন্দ্রিয়া বিজয়-করে গ্রিক দর্শনের ও গ্রিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার জ্ঞান আহরণ করতে উদ্যোগী হয়। এক পর্যায়ে রোমান সেনাবাহিনী মুসলিম বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলে, মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে রোমানদের দ্বারা নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত এ্যারিস্টটল সহ অন্যান্য গ্রিক দর্শনের গ্রন্থাদি মুসলমানদের নিকট হস্তান্তরের শর্ত আরোপ করা হয় এবং প্রচুর গ্রিক জ্ঞানভান্ডার তারা হস্তগত করে।

ইরান বিজয়ের পর তারা তখনকার দিনে বিশ্ব বিখ্যাত উচ্চতর জ্ঞানকেন্দ্রে জুন্দেশাপুরের জ্ঞানভান্ডার হস্তগত করে, যাতে গ্রিক, নেস্তরীয়, নিওপ্লেটনিক ও ইরানী পেহলবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও চর্চা হতো এবং যেখানে দুনিয়ার বিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান বিজ্ঞানের সমন্বিত চর্চা করত এবং বিশ্বায়নে ব্রতী হতো। তদুপরি মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থান বিজয় ও চিনের আধিপত্যাধিন মা-ওরাউন-নাহার (Transoxiana) বিজয়, মুসলমানদেরকে দুইটি-অমূল্য পন্যবস্তুর অধিকারী বানিয়ে দেয়, পন্য দু'টি হলো চিনা প্রযুক্তিতে তৈরি কাগজ প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া এবং চিনি তৈরির কৌশল।[১] আবার অন্যদিকে মুসলমাদের উন্নত জাহাজ তৈরি শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার, তাদেরকে বিশ্বব্যাপী অন্যান্য জাতি ও জনগোষ্ঠীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিস্তার গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ফলে অচিরেই তারা ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও চিন দেশের

ক্যানটন এর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সমূহের সাথে নৌ-যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সুপ্রসিদ্ধি লাভ করে [২]।

বলা হয় প্রথম যুগের মুসলমানগণ খ্যাতিমান যোদ্ধা ও প্রায়শঃ বাধাহীন দিগবিজয়ী হলেও, পরদেশ বিজয় ও বিজাতীয় জনগোষ্ঠীর ধণ সম্পদ অধিকার করার চেয়েও, বিশ্বের স্বনামধন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলো দখল করাকে অধিকতর কাম্য ও মূল্যবান মনে করত। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, নিরপেক্ষ অমুসলিম ইতিহাসবিদগণ ইসলামের দিগবিজয়ের ইতিহাস তন্নতন্ন করে বিচার বিবেচনা করে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মুসলমানদের স্বদেশে-বিদেশে, দেশ-দেশান্তরে দিগবিজয়ী যুদ্ধ আগাগোড়া প্রতিরক্ষামূলক, defensive ছিল; স্বপ্রণোদিত, আক্রমনাত্মক কিংবা offensive ছিলো না। আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরাই বিশ্বের মাঝারে এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি মুসলমানদের বাস্তব কার্যকলাপ বিবেচনা করে তুলে ধরেছেন। আদতে মুসলমানেরা আল্লাহর বাণী আল কুরআন এবং রসুল সা.-এর বাণী হাদিস এর আদেশ নির্দেশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মান্য করে চলে, চলতে বাধ্য। আল কুরআন ও রসুল সা.-এর ন্যায় বিচার (Justice) ও নৈতিক আচরন (moral behaviour) প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে বজায় রাখা ও সাদরে মান্য করে চলা অবশ্য কর্তব্য 'ফরয' করা হয়েছে, ঘরে-বাইরে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ও শান্তিতে, তাকে ন্যায় বিচার ও নৈতিক নীতি মান্য করে চলতেই হবে। অন্যথা তার ধর্মবিশ্বাস, ইমান রক্ষা পাবে না। আল কুরআনে ও হাদিসে, শান্তিতে হোক বা যুদ্ধে হোক, স্বপ্রণোদিত আক্রমন নিষিদ্ধ, রাত্রিতে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ, একমাত্র আক্রান্ত হলেই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বৈধ এবং আত্মরক্ষার্থে ষড়যন্ত্র (ফিতনা) নির্মূল করার জন্যও যুদ্ধ করা বৈধ। মোক্ষম কথা হল, যুদ্ধক্ষেত্রেও বৈধাবৈধের দেখভাল করার জন্য প্রত্যেক সৈন্যবাহিনীর সাথে একজন কাযী (Judge) নিয়ুক্ত থাকেন।

এক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর একটি কবিতার উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তিনি বলেনঃ

CamScanner

মোরা সন্তুষ্টচিত্ত, সর্বশক্তিমানের ভাগ্য লিপিতে!
মোদের জন্য বরাদ্ধ জ্ঞান; আর শত্রুর জন্য সম্পদ!!
কেননা সম্পদ অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়!
আর অবশ্যই জ্ঞান বেঁচে থাকে চিরদিন ধরে!!

[রাদ্বিনা কিস্‌মতুল জব্বার-এ ফি-না!
লানাল ইলমু ওয়া লিল আ'দা-এ মালু!!
ফা-ইন্নাল-মালু ইয়াফ্‌নী 'আন্‌ ক্বরীবিন্‌!
ওয়া 'আম্মাল ইলমু বাকীন্‌ লা ইয়াযালু!!]

ইসলামের স্বরূপ

মানবজাতির জ্ঞানবুদ্ধি ও মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে ইহ-পরকালীন উভয় জগতের চত্বরে বিচার্য উৎসমূলে, ইসলাম একটি ধর্ম (শুদ্ধ ভাষায় 'ধৰ্ম্ম')। ধর্ম্মের সন্ধি বিচ্ছেদে হয় 'ধ+মর্ম', অর্থ ধ= ধারণ করে যা, মর্ম= অন্তরবাণী, মর্মবাণী, তথা -বিবেক নিসৃত বাণীর ধারক, বিবেক নিসৃত বাণী হল ধৰ্ম্ম, যা কথ্যভাষান্তরে অতি সম্প্রতিকালে চলতি বাংলা ভাষায় 'ধর্ম' বলে চালু হল। অতএব, ধর্ম হল মানবতার মর্ম বাণী, সর্বোচ্চ সাধু বার্তা। বিশ্ব জগতে, সৃষ্টি জগতে এর উপরে কিছুই নাই। আবার, বিবেক হল, আবেগের উল্টো, ন্যায়নিষ্ঠ, আত্মার অভিব্যক্তি।

স্মর্তব্য, আল কুরআনের মতে মহাপ্রভু আল্লাহ বাবা আদমের ক্বলবের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে, নিজের রূহ থেকে ফুঁকে রূহ প্রদান করলেন এবং রূহের অভিব্যাক্তি হল বিবেক, যেমন- প্রাণের অভিব্যক্তি হল 'মন', আর দেহের প্রকাশ হলো অনুভূতি। এহেন অনুভূতি, মন ও বিবেক এর চৈত্য-চৈতন্য হল মানবতার বিলক্ষণ পরিচয়, unique quality, differentia। মহাপ্রভু বিশ্বস্রষ্টা নিজ soul থেকে Adam কে ফুকে human soul, মানবাত্মা, দিয়েছেন-এটা ইহুদিদের তাওরাত বা বাইবেলেরও বক্তব্য।

ভারতীয় আদি ধর্মগ্রন্থ 'বেদ'-এর ভাষ্যেঃ মহাপ্রভু পরমাত্মার থেকে মানবাত্মার উৎপত্তি। এহেন রূহ soul, আত্মার অভিব্যাক্তি হল 'বিবেক'। বিবেক হলো, যা নির্বাক, নিরপেক্ষ, ভালো-মন্দ বিচার করে নৈতিকতা উৎপন্ন করে, ন্যায়তঃ বিচারের উৎস, বিবেকের মর্মবাণী হল ধর্ম। আরবি ভাষায় ধর্মকে বলা হয় 'দ্বীন', মানে আল্লাহ প্রদত্ত মানব জীবনব্যবস্থা, দ্বীনে ইসলাম। এহেন আল কুরআনের ভাষায় মহাপ্রভু আল্লাতে অকুণ্ঠ বিশ্বাস, হল 'প্রত্যয়', Faith, ইমান, যা এহেন নৈতিকতা ভিত্তিক ধ্যান-ধারণার প্রতীক মানুষের 'মানব' জাতিগত 'মানবিকতার' প্রশস্ত চত্ত্বরে যার বিকাশ ঘটে। প্রণিধানযোগ্য যে, আমরা মানুষ জাতি বা মানুষ্য জাতি বলি না। আরবি ভাষায় এর সমতুল্য হল 'নাস' মানে মনুষ্য, মনুষ্য হল পশু, এর ইংরেজি ভাষ্য 'man', যাকে বলা হয়ঃ social animal, political animal, Karl Marx-এর ভাষায় Economic Animal, কিন্তু জাতি বা গোষ্ঠি বা race বলতে 'human race' তথা মানব জাতি হয়। মানুষ, man আর 'নাস' হল প্রাণীয় বৈশিষ্ট্যের আধার। আর মানব, human হলো আত্মা, soul, রূহ-এব বৈশিষ্ট্যের প্রতীক; এর অর্থ দাঁড়ায় বিবেকবান সত্ত্বা। আরবিতে মানবকে 'নাস'কে 'ইনসান' বলা হয়। অর্থাৎ কিনা, নাস মানে মানুষ এবং ইনসান মানে মানব। লক্ষ্যনীয় যে, মানুষজাতি হয় না, মানবজাতি হয়, শুদ্ধ।

ইমানঃ আকিদা

পার্থিব সামাজিক জীবনের মানব ইতিহাসের চত্তরে আবির্ভূত ইসলাম ছিল একটি জ্ঞানান্বেষণের বিপ্লব, a revolution of learning; মানুষে মানুষে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ভিত্তিক সম্পর্কের বিপ্লব এবং বিশ্বব্যাপী ন্যায়তঃ বিচার প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। অনুরূপভাবে গোড়া থেকেই ইসলাম ছিল মানবাধিকার বিশ্বময় প্রবর্তনের সংগ্রাম, দুর্বলের, গরীব-মিসকীন, নিপীড়িত, পদদলিত, অত্যাচারিত নিঃস্ব মানবগোষ্ঠীর অনমনীয় পৃষ্ঠপোষক। তবে অধিকারের কথা যখন এসেই গেল, তাতে বলে রাখা যায় যে, ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সা. বিশ্ব প্রসিদ্ধ Charter of Madinah,

CS CamScanner

'মদিনা চুক্তি'র মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ মানব অধিকার এর সনদপত্র প্রদান করেছেন, যা ছিল Human Right-এর সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক দলিল। এই সনদে নির্বিশেষে মানুষের জান, মাল এবং সম্মানের পবিত্রতা রক্ষা এবং নিরাপত্তার বিধান করা হয়েছে।

যাই হোক, আমরা উপরে লক্ষ করেছি যে, মহাপ্রভু আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনধারী, কিতাবধারী, গ্রন্থধারী উম্মা, সামাজিক জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয়ধারী মুসলিম জাতি, সূচনা থেকেই হযরত মুহাম্মদ রাসুলের সা. মাধ্যমে প্রদত্ত ওয়াহী, সরাসরি আল্লাহর বাণী, দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, প্রথম একশ' বছর যেমন তলোয়ার নিয়ে আত্মরক্ষামূলক দুর্বার সামরিক অভিযানে মেতে উঠেছিল, তেমনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করে জ্ঞানান্বেষণে মাতোয়ারা হয়ে দ্বিগবিদিগ ভেদ করে দেশ-দেশান্তরে ধাবিত হয়।

ইরাকের বাগদাদে অষ্টম শতাব্দীতে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে, খলিফা আল-মনছুর, যিনি গ্রিকদের জ্ঞান চর্চায় আকৃষ্ট ছিলেন, রাজধানী বাগদাদে একটি অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিভিন্ন গ্রিক গ্রন্থাদি আরবি ভাষায় অনুবাদ করার প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং অনুবাদ কর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর নাতী খলিফা মামুন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির আরবিতে অনুবাদের উপর বিশেষ জোর দেন। এগুলোর অনুবাদের পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে অনুদিত কাগজাদি দাঁড়িপাল্লায় মেপে সমপরিমাণ সোনা দিয়ে পারিশ্রমিক প্রদান করেন। খলিফা মামুনের পিতা খলিফা হারুনুর রশীদ ভারতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত গ্রন্থাদি আরবিতে অনুদিত হয়। তিনি নিজেও সংস্কৃত ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন বলে কথিত আছে।

মুসলিম জ্ঞানী গুণিরা দেশ-দেশান্তরে অনুসন্ধান করে বিভিন্ন উৎস থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন এবং এগুলোকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে বিন্যস্ত করে উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ও বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য খলিফা মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের বিশ্বপ্রসিদ্ধ 'বায়তুল হিকমা',

CamScanner

House of Wisdom, যা বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম বিদ্যাপিঠ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগশ্রেষ্ঠ গবেষণাগার রূপে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

জ্যামিতিক সমীকরণের জ্ঞান

বায়তুল হিকমার একটি বিশ্বতাত্ত্বিক বিপ্লবাত্মক জ্ঞানানুগ সমীকরণের ধারাণার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারি। সরল কথায় রোমানদের শাসনাধিনে মিসরের বিশ্ববিখ্যাত পিরামিড এর ত্রিপাট বিশিষ্ট আকার-আকৃতি নিয়ে গ্রিক জ্ঞানীগুণীরা গবেষণা করে খ্রিষ্ট তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এতে গ্রিক অঙ্কবিদ ইউক্লিড এর মূখ্য ভূমিকা ছিল। জ্যামিতি পিরামিডের ত্রিপাটের সাদৃশ্যে ত্রিকোণমিতি; জ্যামিতি শাস্ত্রের মূখ্য আংকিক সমীকরণ হলোঃ যেকোনো ত্রিভুজের তিন কোণ দুই সমকোণের সমান। এ সমীকরণের ভিত্তিতে প্রাচীন যুগের পরিমাপ পদ্ধতি গড়ে ওঠে।

খলিফা মামুনের প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের বায়তুল হিকমায় জ্যোতির্বিদ গবেষকদের প্রচেষ্টায় আকাশের মানচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে এই ইউক্লিডীয় সমীকরণের কিছু ত্রুটি বিচ্চুতি ধরা পড়ে। বায়তুল হিকমার বিজ্ঞান গবেষকরা আকাশের সঠিক মানচিত্র অঙ্কনে বারে বারে ব্যর্থ হয়ে, বুঝতে পারেন যে, জ্যামিতিক সমীকরণ 'যে কোন ত্রিভুজের তিন কোণ দুই সমকোণের সমান'। যদিও কাগুজে সত্য, বিশ্ব প্রকৃতিতে তা সত্য নয়। কেননা এ জ্যামিতিক সমীকরণটি শর্ত সাপেক্ষ যে, উক্ত ত্রিভুজটির কোণগুলো সরল রেখায় তৈরি হতে হবে। কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতিতে, যেমন ভূপৃষ্ঠে তেমনি আকাশেও সব কিছু বক্র রেখায় পরিচালিত হয়। তাই ভূপৃষ্ঠে, আকাশে, বাতাসে, অন্তরিক্ষে কোথায়ও সরল রেখা পাওয়া যায় না, সবই মধ্যাকর্ষণের আকর্ষণে বক্র হয়ে যায়। তাই সমীকরণটি কাগুজে সত্য হলেও, প্রকৃতিতে অচল।

CamScanner

তাই বায়তুল হিকমার বিজ্ঞানীরা 'ট্রিগনমেট্রি' উদ্ভাবন করে জমি এবং আকাশের পরিমাপের ব্যবস্থা করেন। তাই দিয়ে বিজ্ঞানীরা আকাশের মানচিত্র তৈরি করেন।

জ্ঞানতত্ত্বের চতুর্বিভাজন

জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞানতত্ত্বকে চার ভাগে বিভক্ত করে শিক্ষা ও গবেষণার কার্যক্রম সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তকরণ ছিল মুসলিম জ্ঞান সাধকদের একটি স্মরণীয় অবদান, যা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে অদ্যাবধি অনুসৃত হচ্ছে। ইমাম গাযযালী বর্ণনা করেন যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রারম্ভ থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষার সহজীকরণ, শৃঙ্খলায়ন, ও পর্যায়ক্রমিক সুবিন্যস্তকরণের লক্ষে মুসলিম জ্ঞানীগুণীরা জ্ঞান শিক্ষা প্রক্রিয়াকে চার ভাগে বিভক্ত করেন, যথা (ক) ইবতিদায়িয়াহ, (খ) আওয়ালিয়াত, (গ) নযারিয়াত ওয়া দীনিয়াত ও (ঘ) তাজরিবিয়াত।[৩]

এ চতুরবিভক্তিকে ইংরেজি ভাষায় বলা হচ্ছে যথাক্রমে: (a) primary (b) secondary (c) graduation and (d) post-graduation। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এ বিভক্তি গুলো আরবি থেকেই পাশ্চাত্যের ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষাগুলোতে গৃহীত হয়েছে এবং ইংরেজির অনুকরণে বাংলা ভাষায় এগুলোকে (ক) প্রাথমিক, (খ) নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (গ) স্নাতক (ঘ) স্নাতকোত্তর রূপে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার এ বিভক্তি খ্রিষ্টিয় নবম-দশম শতাব্দীর ইরাকের বাগদাদ ও স্পেনের কর্ডোভা ভিত্তিক মুসলিম সভ্যতার দীর্ঘস্থায়ী অবদান।

এ চতুরর্বিভক্তির পাঠক্রম বাগদাদ ভিত্তিক মুসলিম প্রাচ্যে এবং কর্ডোভাভিত্তিক মুসলিম পাশ্চাত্যে কিরূপ ছিল? এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় প্রশ্ন বটে। এর উত্তরে বলা যায়:

(ক) প্রাথমিক ইবতিদায়ী স্তরে, (primary level), প্রমাণসহ দলীল দস্তাবেজ মতে, যৎসামান্য শুদ্ধভাবে পড়া, লেখা ও অঙ্কের অনুশীলন, the elements of reading, writing and arithmetic শিক্ষা দেয়া হতো।

CamScanner

(খ) দ্বিতীয় স্তরের আউয়ালিয়াতে, (secondary level) পরিশুদ্ধভাবে পড়ার কলা কৌশল ও লেখার পদ্ধতি ও মাত্রা শিক্ষা এবং সেই সাথে ধীরস্থির শুদ্ধ চিন্তার অনুশীলন দেয়া হতো।

(গ) তৃতীয় স্তর হল স্নাতক graduation level, দার্শনিক পর্যায়ের মননশীল জ্ঞানের স্তর, যা আরবি ভাষায় 'আলিম' অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন নামে পরিচিত ছিল। এতে মননশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির অনুশীলনের অবতারণা হতো। At this level speculative sciences were introduced which were classified as purely intelleclual, এ স্তরের জ্ঞান চর্চাকে আরবিতে 'আকলি মহয' বিশুদ্ধ দর্শন বা theoretical নামে অভিহিত করা হতো।

অধিকন্তু এ তৃতীয় স্তরে শিক্ষাক্রম দুই ধারায় বিভক্ত করা হত। প্রথম ভাগে উপরে উল্লেখিত দার্শনিক মননশীল ধারায় কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আর দ্বিতীয় বিভাজনে ধর্মীয়, প্রশাসনিক, শরীয়াহ, তথা ধর্মীয় বিজ্ঞান, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার আইন কানুন ইত্যাদি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম ধারার 'আকলি' বিজ্ঞানাদির বিপরীতে এ দ্বিতীয় ধারার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে 'নকলী মহয' অর্থাৎ textual learning derived from authoritative textual writings, textual works, such as, the Holy Quran, Holy Bible, Sayings of the Holy Propet Muhammad (peace be on lim) Hadith, books of the law, Fiqh, Fatwa etc, অর্থাৎ কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, ফতোওয়া ইত্যাদি অবলম্বনে শিক্ষা প্রদান, যা প্রথম বিভাজনের theoretical বা দার্শনিক সূত্রগত শিক্ষাক্রমের বিপরীতে practical, কার্যকর শিক্ষাক্রম রূপে অভিহিত হওয়ার উপযোগী।

এ তৃতীয় স্তরে প্রথম বিভাজনের আকলী বিজ্ঞানাদি, speculative, intellectual sciences, মননশীল দার্শনিক বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষাক্রম গ্রিক যুক্তিবিদ্যা দিয়ে আরম্ভ করা হতো, এবং পর্যায়ক্রমে এতে অঙ্ক, জ্যামিতি, এলজেব্রা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি, যেমন উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ইত্যাদি এবং পদার্থ-অতীত গ্রিক দশন, ভারতীয় দর্শন, ইরানী দর্শন

CamScanner

ইত্যাদি।[8] আর দ্বিতীয় বিভাজনের নাকলী শিক্ষাক্রমে ছিল ধর্মীয় বিজ্ঞানাদি যথা- উলুম আল-হাদিস, কুরআনের তাফসির বিশ্লেষণ শাস্ত্র, ইসলামি আইন তত্ত্ব, ফিকাহ, উসূল আল-ফিকাহ, ইসলামি ধর্ম-দর্শন এবং বিভিন্ন ধর্মের সূত্রগত শাস্ত্র।[৫]

(ঘ) চতুর্থ স্তরে তথা শেষ পর্যায়ে, উলুম আত-তাজরিবিয়াহ, experimental sciences এর শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত ছিল, যথা- অঙ্ক শাস্ত্র, যাতে জ্যামিতি, এলজেব্রা একীভূত ছিল, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, রাজনীতি বিজ্ঞান, নৈতিক শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক তাসাওফ, ইত্যাদি সম্বলিত ছিল। এসব শিক্ষাক্রম বিভক্তির পর্যালোচনায় আমরা সংজ্ঞায়নের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান

আমরা উপরে শিক্ষাক্রম বিভাজনের তৃতীয় পর্যায়ের মননশীল বিজ্ঞানাদির speculative sciences-এর বিষয় উপস্থাপন করেছি, সেই সূত্র ধরে আমরা সংজ্ঞায়নের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করতে পারি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের আরবি ভাষায় জ্ঞান চর্চার একক পরিশব্দ ছিল 'ইলম' অর্থ বিজ্ঞান, এর বহুবচন 'উলুম' বিজ্ঞানাদি। আজকালকার আধুনিক যুগের বিজ্ঞান পরিশব্দের মূখামুখি 'কলা' ও 'বানিজ্য' পরিশব্দের মতো সে যুগে 'ইলম' ও 'উলুমের' মুখামুখি সেরূপ কোনো বিকল্প পরিশব্দ ছিল না। বিশেষত: উচ্চস্তরের জ্ঞান চর্চা যেহেতু প্রায়শ একটি বিষয়বস্তুর সাথে অন্যান্য বিষয়বস্তু সংমিশ্রিত হতো এবং কোন কোন স্তরে যৌথভাবে প্রয়োগিক হতো, তাই উচ্চস্তরের জ্ঞান চর্চা সর্বদা বহুবচনে 'উলুম' রূপেই পরিচিত ছিল, উদাহরণ স্বরূপ 'উলুমুল কুরআন, উলুম আল-হাদিস, উলুম আত-সিয়াসিয়াত', উলুম আত-তাজরিবিয়াত ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

মননশীল জ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিজ্ঞজনেরা মননশীল বিজ্ঞানাদিকে এ্যরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার আওতাভুক্ত করার জন্য Inductive ও

Deductive, যুক্তিবিদ্যার সাথে মানানসই করে নেন এবং এ্যারিস্টটলীয় সংজ্ঞায়নপদ্ধতির অনুসরণে, সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান, science of definition কে আরবি ভাষায় 'তা'রীফ' অর্থাৎ পরিচিতি নির্ণয়ের নাম করণের বিদ্যা রূপে আখ্যায়িত করেন। অতঃপর যে কোন বস্তুর প্রাথমিক পরিচিতি নির্নয়ের জন্য বিষয়বস্তুর বিবেচনাকে এ্যারিস্টটলীয় চতুপ্রর্স্তী প্রশ্নমালা ও চতুর্প্রস্তী কারণ ও ফলাফলের, causes and effects এর সাথে সম্পৃক্ত করেন। এতে এ্যারিস্টটল পন্থী মুসলিম যুক্তি বিদ্যার উদ্ভব হয় এবং মুসলিম বিজ্ঞজনদের হাতে যুক্তি বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এরই ভিত্তিতে মুসলিম দর্শন শাস্ত্র ও মুসলিম ধর্মদর্শন আকায়েদ শাস্ত্র বিকশিত হয়। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের আধ্যাত্মিকতার স্তরে গবেষণায় লিপ্ত মুসলিম সাধকরা এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বিস্ময়কর নিপুণ সৃষ্টি কৌশল উদঘাটনে এক পদও অগ্রসর হতে পারছিলেন না। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সা. একটি বিশুদ্ধ হাদিসে বলে গেছেন: "আল-ইলমু ইলমান; ইম্মা আলা-ল্ লিসান ওয়া ইম্মা আ আলা-ল-জনান; ওয়া আন্না ইলমুল জনাল, হুয়া ইলমুন নাফেউন"। আর্থাৎ জ্ঞান হল দুই প্রকার; এক প্রকার জ্ঞান জিব্বার উপরে অবস্থিত এবং অন্য প্রকারের জ্ঞান অন্তরে সন্নিবেশিত; আর অবশ্যই অন্তরে সন্নিবেশিত জ্ঞানই প্রকৃষ্ট উপকারী জ্ঞান। এ বিভক্তি অনুযায়ী এ্যারিস্টটলের Conceptual Knowledge এবং বাহ্যিক জ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিবিদ্যা, উক্ত হাদিসের প্রথম বিভক্তি 'জিহ্বার উপরের জ্ঞান'-এর পর্যয়ভুক্ত হয়, যা কথায় কথায় বিকশিত হয় এবং কথার মনন প্রক্রিয়ার চিন্তা ধান্ধায় ধারণামূলক Inferential বিদ্যায় ও Conceptual Knowledge এ পরিপূর্ণতা লাভ করে; তারই ছত্রছায়ায় এ্যারিস্টটলীয় যুক্তি বিদ্যার উৎপত্তি ও বিকাশ হাদিসের দ্বিতীয় বিভক্তির আন্তরিক জ্ঞানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সা. স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আন্তরিক জ্ঞানই উপকারী জ্ঞান, যা মুসলমানের কাম্য। রসুল সা.-এর উপদেশ সম্পৃক্ত হৃদ্যিক আন্তরিক জ্ঞানের অনুসন্ধানে মুসলিম জ্ঞানীগুণীরা উপরে উল্লেখিত কুরআনতাত্ত্বিক 'কিসের কি' প্রশ্ন মালার

CS CamScanner

উদ্ভাবন করেন, যা গ্রিক দার্শনিকদের স্বপ্নাতীত ছিল। এরই ভিত্তিতে সাধনা করে তারা একাদিকে গভীরতর হৃদ্যিক, অভ্যন্তরীণ যুক্তিতত্ত্বের আদলে উলুম আত-তাজরিবিয়া, ব্যাবহারিক বিজ্ঞান, experimental sciences উদ্ভাবন করেন এবং অন্যদিকে গভীরতর আধ্যাত্মিক সাধনামূলে 'তাসাওফ' বা আধ্যাতিক সূফীতত্ত্বের (miscalled Islamic Myaticism) বিকাশ ঘটান। এই নবলব্ধ উভয়বিধ গবেষণার ফলশ্রুতি (ক) বহিরস্ত তাজরিবী বিজ্ঞান এবং (খ) অভ্যন্তরীন সুফিতাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান এর উন্মেষ ঘটান। এ নবতর গভীরতর জ্ঞানন্বেষনে-র কোনো পরিসীমা নাই এবং এর গতি প্রকৃতির গবেষণার শর্ত হল হৃদ্যিক পরিতৃপ্তি, 'এত্মিনানে কলব' সম্মত হওয়া। যাবত এতমিনানে কলব, আন্তরিক পরিতৃপ্তি হাছেল হবে না, তাবৎ প্রচেষ্টাও নিবারণ হবে না। এহেন সাধনা পুষ্ট যে গভীর গবেষণা যুক্তি বিদ্যার মাধ্যমে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান, experimental science এর উজ্জ্বল যুক্তি, সুস্পষ্ট যুক্তিবিদ্যা evidential logic, আর বাহ্যিক যুক্তি বিদ্যা হল 'হুজ্জাত' inferential logic এবং গভীরতর গবেষণাপুষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিদ্যা হল 'বুরহান', তথা self-evident. অতএব, experimental science এর কোনো logic নাই, experiment-এ টিকলে সঠিক, আর experiment-এ না টিকলে বেঠিক বলা, বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে না জানার পরিচায়ক।

হুজ্জত বনাম বুরহানের পর্যালোচনা

এ্যারিস্টটলীয় ত্রিপদী যুক্তিতত্ত্ব অনুমিত inferential, syllogistic logic মুসলিম বিজ্ঞজনেরা নাকচ করেননি, বরং স্তরভেদে বাহ্যিক দার্শনিক জ্ঞানের বিচার বিবেচনায় তা সাদরে গ্রহণ করেন এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য বিষয়বস্তুর বিবেচনাকে এ্যারিস্টটলীয় চতুর্প্রস্তী প্রশ্নমালা ও চতুর্প্রস্তী কারণ ও ফলাফলের, causes and effects, এর সাথে সম্পৃক্ত করেন। এতে এ্যারিস্টটলপন্থী মুসলিম যুক্তি বিদ্যার উদ্ভব হয় এবং মুসলিম বিজ্ঞনীদের হাতে যুক্তিবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এরই ভিত্তিতে মুসলিম দর্শন শাস্ত্র ও মুসলিম ধর্মদর্শন আকায়েদ শাস্ত্র বিকশিত হয়।

CS CamScanner

কিন্তু ধর্মতত্ত্বের আধ্যাত্মিকতার স্তরে গবেষণায় লিপ্ত মুসলিম সাধকরা এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বিস্ময়কর নিপুণ সৃষ্টি কৌশল উদঘাটনে একপদও আগ্রসর হতে পারছিলেন না। এ স্তরে পুনরায় স্বরণ করা যেতে পারে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সা. একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বলে গেছেন: "আল-ইলমু ইলমান: ইম্মা আলা-ল লিসান ওয়া ইম্মা আলা-ল-জিনান; ওয়া আন্না ইলমুল জিনান, হুয়া ইলমুন নাফেউন"। অর্থাৎ জ্ঞান হল দুই প্রকারের, একপ্রকার জ্ঞান জিব্বার উপরে অবস্থিত এবং অন্য প্রকার জ্ঞান অন্তরে সন্নিবেশিত; আর অবশ্যই অন্তরে সন্নিবেশিত জ্ঞানই প্রকৃষ্ট উপকারী জ্ঞান।

তাই উপরে উল্লোখিত 'আল-ইলমু ইলমান' তথা জ্ঞানের দুই প্রকার বিভক্তি ভিত্তিক আল্লাহর রসুল সা.-এর হাদিসের আদলে, তাঁরা বিভিন্ন দার্শনিক ক্ষেত্রে, যথা- ধর্মদর্শন, ধর্মাবিশ্বাস শাস্ত্র আকায়েদ, নৈতিক দর্শন, আইন শাস্ত্র, উছুল এর নীতি শাস্ত্রে হুজ্জতের তথা এ্যারিস্টটলীয় লজিকের ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োগ করেন।

পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে যে, এ্যারিস্টটল মানুষের সহজাত curiosity, কৌতুহলের চাহিদা, demand, মিটাবার তাগিদে চারটি প্রশ্নের অবতারণা করেন, যথা- কি(?), কেন(?), কিরূপে(?) এবং কিসের জন্য(?) (what, why, how and what for?) এবং এগুলোর বিচার বিবেচনার লক্ষ্যে চার প্রকার 'কারণতত্ত্বের' উদ্ভাবন করেন, যেগুলো হলো: (ক) material cause, পদার্থিক কারণ (খ) formal cause আদর্শিক কারণ (গ) efficient cause কার্যকর কারণ এবং (ঘ) final cause চূড়ান্ত কারণ। অতঃপর এ চার প্রকার অনুক্রমিক প্রশ্নের ভিত্তিতে তিনি একাদিকে তাঁর অনন্য প্রতিভাদিপ্ত syllogistic methodology of definition, তথা বিষয় বস্তুর সংজ্ঞায়নের ত্রিপদী পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং অন্যদিকে চতুর্কারণতত্ত্বের নিরিখে তিনি বিশ্বজগতের সর্বময় কার্যক্রমের ব্যাখ্যা প্রদান করতে চেষ্টিত হন। এ দুইটি টানা-বানার উপর প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের সরলবোধ্য বিশ্বদর্শন গড়ে ওঠে, যা ধারনামূলক জ্ঞান, অনুমান ভিত্তিক, অনুমিত, প্রকল্পিত conceptual

CamScanner

knowledge ও গ্রিক ঐতিহ্যগত metaphysics, (পদার্থ অতীত দর্শন), ও গ্রিক দর্শন এর চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।[৬] প্রচীন যুগে এটাকেই সমসাময়িক বিশ্বজগতের সর্বময় জ্ঞান রূপে উপস্থাপিত করা হয়।

এ্যারিস্টটলীয় এ চতুপ্রশ্নের রেশ ধরে মুসলিম বিদ্বৎজনরা গবেষণা পরিচালনা করলে পরবর্তী কালের ইসলামিক যুগের জ্ঞান গবেষকদের দৃষ্টিতে যে সব প্রশ্ন ভেসে ওঠে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের দার্শনিক চিন্তাভাবনার চত্বরে মানব জীবনের গভীরতর ও অধিকতর জটিল বাস্তবতার সমস্যাদি সমাধানে এ্যারিস্টটলীয় চতুর্প্রশ্ন অপ্রতুল প্রতীয়মান হয়। তাঁরা আল কুরআনের বিশ্বদৃষ্টি অবলম্বন করে এ প্রশ্নমালার চেয়ে জটিলতর চুতর্প্রশ্নমালার উদ্ভাবন করেন, যেগুলো কিসের-কি(?), '(মা দিরাইয়া) স্তরের পরিক্রমার সূচনা করে। আরবি ভাষায় ধারাবাহিকভাবে এ প্রশ্নগুলো হলোঃ হাল-মা-লিমা-আইয়ু? এর ভাবধারণা হলো, যা ইংরেজি ভাষায় বলা যায় 'whether of not?' হবে কি, হবে না(?)। প্রশ্নটি জটিল, যা দ্বিতাত্ত্বিক উত্তর খুঁজে, demands double-set answer, যেমন প্রশ্ন করা হলেঃ হাল আল্লাহু খালিকুল আলমে? আল্লাহ কি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা? 'ক' 'খ' এর প্রতিদ্বন্দ্বি? সমস্ত প্রেসিডেন্ট কি ক্ষমতা ধারী?

'মা' অর্থাৎ কি(?) একটি প্রশ্নবোধক শব্দ। এর অর্থ দাঁড়ায়: কোনোকিছু, কোনটি, কোন কোন ধরনের, কিসের দ্বারা ইত্যাদি। 'হাল' এর পরিক্রমায় যখন 'মা' প্রশ্নের অবতারণা করা হয়, তখন 'মা' দিরাইয়া'-র আদলে এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ কিসের কি(?) যেমন বলা যেতে পারেঃ কিসে তোমাকে বুঝালো যে তা কিসের কি? যেমনিভাবে বলা যায়ঃ তোমাকে কিসে বুঝালোযে আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা? তোমাকে কিসে বুঝালো যে 'ক' 'খ'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী?

'লিমা'-র অর্থ হলঃ কিসের জন্য? এটা 'হাল' এর পরিক্রমায় ব্যবহৃত হলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'লিমাযা' মানেঃ কোন কারণে(?) বা কোন যুক্তিতে(?) কেনইবা? কিসের জন্য এটা এরূপ হল?

'আইয়ু'-র অর্থ হলঃ যে কেহই হোক না কেন? সে যাই হোক না কেন(?) কে, কি, কেন(?) ইত্যাদি। 'হাল এর পরিক্রমায় এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ কোন বিষয়ের কারণে? কেনইবা এরূপ করা হল? এটা কিসের ব্যাপার? এটা আদতে কোন বিষয়ের শেষ প্রান্তে নিয়ে যায়, উপসংহারে উপনীত করে, অথবা যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যস্থল, থিসিস বা তা'দিলে উপনীত করে।

এখন প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয়ঃ হ্যাঁ আল্লাহ হলেন বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হতে পারেঃ কেননা, বাহ্যিক জগতে অসংখ্য সৃষ্টির নিদর্শন (আফাক-দিগন্তে) এবং প্রত্যেকের অন্তরে অবস্থিত প্রাকৃতিক জগতের ঐক্য স্বরূপতা, সমরূপতা, unifomity of nature এর উপলব্ধি, হৃদয়ে উপলব্ধি (ফি আনফুসাকুম), একক জনের সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়ঃ বিশ্বজগতের যদি একাধিক স্রষ্টা ও পালনকর্তা থাকত, তাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হত এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হত ও কর্মধারা নষ্ট হয়ে যেতো।

অতএব, চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর অবিসম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক, নিয়ন্তা প্রভূ একক আল্লাহ ছাড়া আর কোন কল্প-বিকল্প হতে পারে না।

এ জটিল বিষয়টি সহজবোধ্য করার জন্য পুনরুক্তি, repeat করে বলা যায়ঃ 'হাল আল্লাহ খলিকুল-আলম?' আল্লাহ কি বিশ্বজগতের স্রষ্টা? 'ক' কি 'খ' এর প্রতিদ্বন্দ্বি? Are all the Presidents holders of power of the State? সব প্রেসিডেন্ট কি রাষ্ট্রের ক্ষমতাধারী হন? 'মা' আরবিতে সমভাবে একটি জটিল প্রশ্নবোধক শব্দ। এর অর্থ দাঁড়ায়, 'which, what, that which, whatsoever, why, wherefore ইত্যাদি। কোনটি, কিসে, কোন সেটা, কি প্রকারভেদে, কেনইবা, কি প্রকারান্তরে ইত্যাদি ধরণের জটিল প্রশ্নের উদ্রেককারী। মা'দিরাইয়া, কিসের কি ধাঁচের প্রশ্ন, যা 'হাল-কে অনুসরণ করে। 'মা'-এর আদত অর্থ দাঁড়ায় 'কিসের জন্য কি; what of what(?). যেমন বলা হয়ঃ কিসে তোমাকে বুঝালো যে সেটা কি? উদাহরণ

CS CamScanner

স্বরূপ উপরের প্রশ্ন: আল্লাহ কি বিশ্বজগতের স্রষ্টা নন? এর সাথে যুক্ত করে বলা যায়: What makes you understand that Allah is the Creator of the universe? What makes you understand that 'A' is the challenger of 'B'? কিসে তোমাকে বুঝালো যে আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা? কিসে তোমাকে বুঝালো যে 'ক' হল 'খ' এর প্রতিদ্বন্দ্বি?

'লিমা' অর্থ কিসের জন্য(?) For what(?) এর পূর্ববর্তী দুই প্রশ্নের সাথে সারিবদ্ধভাবে আসলে, এটা 'লিমাযা' 'কোন যুক্তিতে(?) অর্থে দাঁড়ায়। আরো অর্থ হয়: কেন(?) কি জন্যে তা এমন হয়(?) ইত্যাদি।

'আইয়ু' এর অর্থ হল: যে কেউ, যাই হোক না কেন, কে(?) কিসে(?) কিইবা(?)। আর পূর্ব তিন প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় আসলে, এর অর্থ দাঁড়ায় 'লি-আইয়ু শাইয়িন' অর্থাৎ কিসের জন্য এটা করা হল(?) For what it is done? কিসে এটা এমন হলো? 'what it is that? এটি বিষয়টিকে চূড়ান্তের দিকে নিয়ে যায়, উপসংহারের দিকে নিয়ে যায়। যথার্থ পরিসমাপ্তির দিকে বিষয় বস্তুকে নিয়ে চলে।

এখন উত্তর প্রদানের পালায়, যদি প্রথম প্রশ্নটির বেলায় বলা হয়: হ্যাঁ, আল্লাহ্ হলেন বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা; তবে ক্রমধারায় দ্বিতীয় প্রশ্নের আদলে বলা হবে: কেননা, সৃষ্টির অগণিত নিদর্শন যেগুলো বহির্জগতের নভোমন্ডলে (ফিল-আফাক) পরিদৃষ্ট হয় এবং বিশ্বজগতের সুশৃঙ্খল প্রকৃতির আদলে যা অন্তরের অন্তস্থলে (ফি আনফুসিকুম) উপলব্ধ হয়, তা নির্বিশেষে বিশ্বজগতের একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব সূচিত করে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়: যদি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক প্রভু একাধিক হতো, তাঁদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যেত এবং বিশ্বজগতের কার্যক্রম ব্যহত হতো ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে বিশ্ব পরিস্থিতি ভেঙ্গে পড়তো।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়; যদি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক প্রভু একাধিক হতো, তাঁদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যেত এবং বিশ্বজগতের কার্যক্রম ব্যহত হতো এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিনষ্ট হয়ে বিশ্ব পরিস্থিতি ভেঙ্গে পড়তো।

CamScanner

সর্বশেষে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরচতুর্থয়ের ধারাবাহিকতায় অবশ্যই বলতে হবে যে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক, নিয়ন্তা মহাপ্রভু, রাব্বুল আলামীন, একক, একচ্ছত্র অধিপতি সমগ্র বিশ্বজগতের। The Creator, Suatainer, Providence Lord of the universe is one, unique and alone.

বিষয়াদিকে আরো সহজবোধ্য করার জন্য বস্তনিচয়ের চতুর্পরিমাণ বিভক্তি বিবেচনা করা যায়। প্রত্যেক বস্তুর পরিমাপে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-উচ্চতার সমতূল্য চতুর প্রস্তের সাথে চতুর্প্রশ্নের সংযোজন করে বলা যায় 'হাল' হল দৈঘ্য, 'মা' হল প্রস্ত, 'লিমা' হল বেৎ এবং 'আইয়ু' হল উচ্চতার সমতূল্য। এহেন পরিক্রমায় সৃষ্টিজগতের সার্বিক বিবেচনায়, আমরা খালিক্বকে দৈর্ঘ্য, রাব্বকে প্রস্থ, প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে বেধ এবং আল্লাহকে উচ্চতার সমতূল্য রূপে কল্পনা করতে পারি; অতএব সৃষ্টির নিদর্শনাদি স্রষ্টার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করে।

হদ (হদ্‌দ) তথা পরিমাপক গুণাগুণ

আরবি ভাষায় বৈশিষ্ট্যিক গুণ বা differentia-এর বর্ণনাকরণে তিন প্রকার পরিশব্দ ব্যবহৃত হয়। (ক) মহাপ্রভূ আল্লাহর বৈশিষ্ট্যিক গুণ হল 'যাতি' নিজস্ব, selfy (খ) সচরাচর ব্যক্তি ও বস্তুনিচয়ের আকৃতি-প্রকৃতি, পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, গুণকে বলা হয় 'ছিফাতী', qualitative differentia, এবং (গ) পরিমাণ পরিমাপগত বৈশিষ্ট্য, quantitative differentia কে বলা হয় হদ্‌দ, যা বাংলা ভাষায় সহজসাধ্য উচ্চারণের লক্ষ্যে আমরা বলতে পারি 'হদ', অর্থাৎ পরিমাপ, quantititive measurement এই তৃতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগত 'হদ' হল বুরহান যুক্তি তত্ত্বের পরিমাপক।

আল কুরআনের বিশ্বতত্ত্ব এবং ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবধারা অনুধাবন ও সাধারণ্যে ব্যক্ত করার লক্ষ্যে মুসলিম জ্ঞান সাধকরা গ্রিক inferential logic, হুজ্জতভিত্তিক qualitative measurement, গুণগত পরিমাপ এর স্থলে 'বুরহান' ভিত্তিক পরিমাণগত পরিমাপ বা পরিমাণগত

সংজ্ঞায়নের, তথা 'হদ' ভিত্তিক বুরহান এর যুক্তিতত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এটাকে পরিমাপক যুক্তি, measerement or limits এর logic, আরবি পরিভাষায় কেবল 'হদ' বা dimentional definition, স্তরীয় সংজ্ঞায়ন বলা যায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গ্রিক inferential logic applies to philosophy whereas the dimentional logic applies to experimental sciencs. গ্রিক হুজ্জত যুক্তিবিদ্যা কেবল দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পরন্ত ইসলামি পরিমাপগত বুরহান যুক্তিবিদ্যা কেবল ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৭]

তবে মুসলিম জ্ঞানী-বিজ্ঞানীগণ জ্ঞানের চত্বরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেননি। বরং তাঁরা হুজ্জত ও তা'রীফ এর সংজ্ঞায়নকে কোন বস্তুর গুণাগুণ নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন এবং তারই সাথে 'হদ' ভিত্তিক সংজ্ঞায়ন প্রয়োগ করে বস্তুটির বাস্তবতা objectivity ও উপযোগীতা এবং কার্যকরিতা নির্ধারণ করেন। এরূপে তাঁদের সম্মুখে তাজরিবী বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রের ধারাবাহিকতায় বিস্তৃত ছিল। তাঁরা দর্শনকে সর্ম্পূণ আলাদা করে দেখেন নি। তাদের জ্ঞান চর্চায় তারীফ, inferential definition, উচ্চতর তাহদীদ বা হদ এর evidential definition এর পূর্বসূরী ছিল, তাঁরা তাজরিবী, experimental বিজ্ঞানের ক্ষেত্র তৈরি করতে দর্শনকে ব্যবহার করেছেন। তাই বড় বড় নামজাদা বিজ্ঞানীরা বড় বড় দার্শনিকও ছিলেন, আল-কিন্দী, ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদ।

এরূপ চতুর্প্রস্থী সংজ্ঞায়নের পরিক্রমা থেকে, অর্থাৎ তাহদীদ বা হদ চর্চার রেশ ধরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গড়ে ওঠে, যাতে প্রথম ধাপে (ক) collection of information or data, খবরাখবর ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, যা 'রিওয়ায়ত' নামে পরিচিত (খ) rational verification and classification of data, তথ্যের যৌক্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শ্রেণি বিভক্তি যা 'দিরায়ত' নামে পরিচিত (গ) experimental testing, তাজরিবী সমীক্ষা, যা 'তাজরিবাহ' নামে পরিচিত এবং (ঘ) verified formula or thesis, পরীক্ষিত সূত্রায়ন বা যুক্তিসঙ্গত সূত্রায়িত উপসংহার, চূড়ান্ত বক্তব্যের

CamScanner

উপস্থাপন, যা 'তাদীল' নামে পরিচিত, তা সূত্রায়িত আকারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এতে বলা হয়, তাজরিবী বিজ্ঞানঃ রিওয়ায়াত, দিরায়াত, তাজরিবা ও তা'দীল সম্মিলিত গবেষণার ফরশ্রুতি। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা তা'দীল-কে thesis নামে অনুবাদ করেন। আরবিতে 'আদল' মানে justice এবং তা'দীল' মানে justifiable conclusion, যে কথাটি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা গ্রিক পৌত্তলিকতা ভাবাপন্ন theo+isis= thesis অর্থাৎ 'দেববাণী', অর্থাৎ আমার কথা নয়, দেবতার কথা রূপে অনুবাদ করেছেন। Thesis পরিশব্দ আধুনিক বিজ্ঞানীদের আরবি থেকে ল্যাটিনে অনুবাদকালীন বানানো শব্দ; এটা ক্লাসিক্যাল গ্রিক বা ল্যাটিন শব্দ নয়।

হদ বা তাহদীদ এর চতুর্প্রস্তী পরিমাপগত পদ্ধতি

আরবি ভাষায় হদ, হদ্দ মানে কোনো বস্তুর চতুরপার্শ্বের পরিসীমা, কোন বস্তুর চারিপ্রস্ত পরিসীমা নিরূপণ করা। তাই 'হদ'-এর শাব্দিক অর্থ সীমা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত অর্থ 'পরিসীমা'। আল কুরআনে 'হদ্দ', বহুবচনে 'হুদূদ' শব্দদ্বয়কে আইনী পরিভাষারূপেও ব্যবহার করে, যা লজ্ঘন করা যাবে না, লজ্ঘন করলে 'হদ্দ'-এর শাস্তি প্রযোজ্য হবে। আর 'হুদূদ' লংঘন করা নিষেধ।

দর্শনের পরিভাষায় 'হদ্দ' মানে সংজ্ঞায়ন, definition, হদ কোন বস্তুর পরিচিতিমূলক গুণের নির্দেশ করে। কোন বস্তুর 'তাহদীদ', সংজ্ঞায়ন সম্পন্ন হয়, যখন ঐ বস্তুটিকে নিকটতম একই জাতীয় বস্তুসমূহ থেকে পৃথকীকরণ করা হয় এবং একই সঙ্গে পরিচিতি দানকারী বিশেষ গুণটির স্বরূপ বর্ণিত হয়। এরূপ হদ-কে, সংজ্ঞায়নকে বলা হয় 'হদ্দে তামাম' পূর্ণমান সংজ্ঞায়ন। উদাহরণ স্বরূপ, একজন মানুষ এর সংজ্ঞায়ন বা 'হদ' হলঃ 'এমন এক প্রাণী যে বিবেকের অধিকারী', সরল কথায়, মানুষ হলঃ 'বিবেকবান প্রাণীসত্ত্বা, বিবেকবান সত্ত্বা', "an animal possessing soulful consciousness"। অন্য এক প্রকারের 'হদ' হল যা কোনো বস্তুর

সীমাগুলোর শেষ রেখা পর্যন্ত নির্দেশ করে, যথায় এটির শেষ প্রান্ত ও অন্যবস্তুর প্রারম্ভ নির্ণিত হয়। অন্য কথায়, কোনো বস্তুর প্রারম্ভ ও শেষ প্রান্ত সম্বলিত বর্ণনাকে 'হদ' বলে। উদাহরণস্বরূপ ইউক্লিসিডিয় জ্যামিতির axioms, শতঃসিদ্ধগুলো 'হদ' রূপে গৃহীত।[৮] ইমাম গাজ্জালি, ইসলামের বিশ্বপ্রসিদ্ধ অনন্য শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, 'হদ' কে ত্রিধারায় বিভক্ত করেন যথা- আক্ষরিক, প্রথাগত ও আবশ্যিক; অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, প্রথম প্রশ্নঃ 'হাল'(?) অস্তিত্বের ভিত্তি 'আছলু-ল-ওয়াজুদ' সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, অস্তিত্বশীলের অবস্থা সম্পর্কে এবং এর গুণাগুণের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে। দ্বিতীয় প্রশ্ন 'মা' বস্তুর পারিশাব্দিক বিশ্লেষণ তলব করে, বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও নির্যাস এবং সারবত্তার বিশ্লেষণ তলব করে। তৃতীয় প্রশ্ন 'লিমা'(?) যুক্তিযুক্ততা ও সাক্ষ্যপ্রমাণ এর প্রমাণসহই উত্তর খুঁজে। চতুর্থ প্রশ্নঃ 'আইয়ু'(?) বস্তুটির সঠিক পার্থক্যকরণ, বিশ্লেষণ, কোত্থেকে, কোনদিকে, কখন ইত্যাদির যথাযথ নির্ণয় কামনা করে।

এহেন প্রশ্নোত্তরের বিষয়গুলো জানা, ইমাম গায্যালীর মতে, 'হদ' নির্ণয় করার পূর্বশর্ত। তিনি এগুলোকে 'আদ-দুয়ামতুল-হদদ' বলে আখ্যয়িত করেন এবং 'হদ' শুদ্ধ হবার জন্য ছয়টি নীতি ধারার বর্ণনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এ ছয়টি ধারা সর্বপ্রকার বিজ্ঞানাদি অধ্যয়ন করার জন্য সাধারণ নীতি মালা। এ ধারাগুলো ভালোরূপে হৃদয়ঙ্গম করা ব্যতীত কোন ব্যক্তির যেকোনো বিজ্ঞানের সমস্যাসমূহের অধ্যয়ন করতে যাওয়া অসার নিরর্থক, তা যেকোনো বিজ্ঞান হোকনা কেন, ধর্মীয় বিজ্ঞানাদি হোক বা পদার্থিক বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদিই হোক না কেন।[৯]

ইমাম গাজ্জালি বলেন, ধর্মীয় বিজ্ঞানাদি ছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি প্রাথমিকভাবে অস্তিত্বশীল বস্তুগুলি নিয়ে ব্যাপৃত হয়। অস্তিত্বশীল বস্তু দুই ভাগে বিভক্তঃ চিরস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী বা গুণগত। বস্তুর গুণাগুণ শ্রেণিগতভাবে হয়ত প্রাণী সত্ত্বায় অস্তিত্বশীল, যেমন- জ্ঞান, ইচ্ছা, স্বাধীনতা, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি অথবা যে সব গুণাগুণ প্রাণী সত্ত্বার

উপর নির্ভরশীল নয়, যেমন- রং, বায়ূ, স্বাদ ইত্যাদি। আর সত্ত্বাগত বস্তুগুলি শ্রেণিগতভাবে হয়ত প্রাণধারী, উদ্ভিদ এবং প্রাণহীন বস্তুনিচয় ইত্যাদি।[১০]

তিনি সর্বশেষে জ্ঞানকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন, যথা (ক) শিক্ষার আবশ্যিক উপাদানসমূহ এবং (খ) জ্ঞান যা অন্বেষণ করা হয়, অর্থাৎ কিনা শিক্ষা ও জ্ঞানের, প্রথমটি অর্জন করা হয় এবং দ্বিতীয়টি অনুসন্ধান করা হয়। অতঃপর তিনি শ্রেণি বিভক্তি করেন জ্ঞান কে, যা অনুসন্ধান করা হয়, তা হয়ত 'নযরিয়াত' দার্শনিক অথবা 'মারিফাহ'; হৃদয়ঙ্গম মুখিন, তথা, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, তাজরিবী (experimental), যাতে 'হদ' অবলম্বন করে চলতে হয়[১১] এবং বুরহান অবলম্বন করে চলতে হয়। যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন, এটা আমাদেরকে এ প্রতিপাদ্যে উপনীত করে যে, বিজ্ঞান 'হদ' বা পরিমাপ, (measurement) এ আরম্ভ হয়।[১২]

সুতরাং 'হদ'-এর আদলে আমরা বলতে পারি যে, বিজ্ঞান এর প্রারম্ভ হয় দর্শনের সমাপ্তির পরবর্তীতে। যেখানে দর্শনের শেষ সেখানে বিজ্ঞানের আরম্ভ। আর বুরহানের আদলে আমরা বলতে পারিঃ বিজ্ঞান নিজেকে পরিচিহ্নিত করে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টাল, তাজরিবী বিজ্ঞান, evidential, সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের আদলে প্রতিভাত হয়; তা মননশীল দর্শনের চিন্তাধারার, কলা ও সাহিত্যিক কর্মকান্ডের বিপরীতে।

সার সংক্ষেপ

অতএব, এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স এর উদ্ভব বর্তমান যুগে প্রচলিত বিজ্ঞান জগতের উদ্ভাবনী প্রশ্নমালার 'কি(?)' এবং 'কেন(?)' প্রশ্নদ্বয়কে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রত্যাখ্যান করে অথবা অত্র প্রশ্নদ্বয়কে ফিলোসফি, দর্শন এর ক্ষেত্রে নির্বাসন দিয়ে নয়; অথবা গ্রিক দর্শনের চতুর্প্রশ্নের মধ্য থেকে 'কি রূপে(?)' 'How(?)' প্রশ্নটি বেছে নিয়ে ব্যাবহারিক বিজ্ঞানের বীজক্ষেত্রকে উর্বর করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে অথবা এমনকি এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের চতুর্কারণমালার পদার্থিক জগতের উপর প্রভাব, প্রতিপত্তি, কার্যকলাপের ছত্রছায়ায় বিজ্ঞানকে লালন-পালন করেও নয়; বরং

CS CamScanner

নিঃসন্দেহে এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স এর উৎপত্তি আল কুরআনের 'কিসের কি?' 'what of what (?)' এর চত্বরে প্রশ্নমালার আদলে তাজরিবী উৎসাহ উদ্দীপনা, experimental spirit, 'মা দিরাইয়ার' চতুরজটিল প্রশ্নের তন্ন তন্ন করে মন জুড়ানো উত্তরের অনুসন্ধানের তোড়ে বিকাশ লাভ করে, যেমনটি অত্র পুস্তকে বিষদভাবে ও বিস্তারিত কলেবরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিবরণের পরিক্রমায় বিবৃত করা হয়েছে। এক কথায়, এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স, মানব জাতির জ্ঞান অন্বেষণের পরিক্রমায় এক বিশিষ্ট শ্রেণির জ্ঞানতত্ত্ব হিসেবে, How(?) প্রশ্ন থেকেও না, অথবা কার্য-কারণের প্রক্রিয়াগত পারস্পরিক বন্ধন সূত্রের আকৃতি প্রকৃতি আবিষ্কারের মাধ্যমেও না, এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের উদ্ভব হয়েছে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানীদের হাতে আল কুরআনের 'মা দিরাইয়ার' 'কিসের কি' 'what of what (?)' প্রশ্নের উত্তর উদঘাটনের ব্যাপক গভীরতর গবেষণার আদলে।

মুসলিম বিজ্ঞানীরা আল কুরআনের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে বস্তুর পরিপূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত তাজরিবী, experimental জ্ঞান হাছেল করার লক্ষে, প্রথমে প্রচলিত ধারণামূলক সংজ্ঞায়নের, (conceptual definition) মাধ্যমে বস্তুর গুণগত, (qualitative), প্রকৃতি নির্ণয় করে, তারপর কুরআন নির্দেশিত 'কিসের কি(?)' চার প্রশ্নমালার আদলে বস্তুর পরিমাপ পরিমাণগত প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে 'হদ' (dimentional quantitative definition) প্রয়োগ করে বস্তুর প্রকৃতি ও কার্যকারিতা নিরূপণ করেন। সুতরাং এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স বা ব্যাবহারিক বিজ্ঞান দার্শনিক জ্ঞানের থেকে সম্পূর্নরূপে বিচ্ছিন্ন হবার বদলে, দার্শনিক জ্ঞানের, (conceptual knowledge) সম্প্রসারণে অবস্থান করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ দার্শনিক জ্ঞানকে 'উলূম আল-নাযারিয়াত', (intellectual sciences) রূপে শ্রেণি বিভক্ত করেন এবং তাজরিবী বিজ্ঞানাদিকে 'উলুম আত-তাজরিবিয়াত' নামে বাস্তব জ্ঞানের আধার পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসূত তাজরিবী বিজ্ঞান এর শ্রেণি বিভক্ত রূপে আখ্যায়িত করেন।

CS CamScanner

নির্দেশিকা

১. Hsia Nai: *A Historcal Speech of Friendship Between China and Pakistan*, Peking 1965, p.14.

২. ঐ।

৩. Imam Ghazzali: *Al-Mustasfa min ilm al -usul*, Bulaq, Egypt, 1322 Hizri, p. 3.

৪. আমার সাম্প্রতিক প্রবন্ধঃ "পাশ্চাত্যের যুক্তিতত্ত্বের সমীক্ষা" অপ্রকাশিত।

৫. ইমাম গায্যালীঃ *আল-মুসতাসফা*, পৃ. ১২।

৬. উপরের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, রজার ব্যাকন এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৭. *সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৫২৮, মুসলিম বিজ্ঞানী জুরজানীর প্রতি নির্দেশ করে।

৮. Imam Ghazzali: *Al-Mustasfa*, pp. 12-13

৯. ঐ, পৃ. ৫-৬।

১০. ঐ, পৃ. ১৬।

১১. ঐ।

১২. *Scientific Indications of the Holy Quran*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1990, p. 400.

CamScanner

অষ্টম অধ্যায়

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বাস্তব প্রকৃতি

Experimental Science তথা ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের সুদূরপ্রসারী অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে আমরা কিছু চমকপ্রদ বিষয়ের মুখোমুখি হই। প্রথমত, দেখা যায় যে, 'science' শব্দটি প্রাচীন গ্রিক ভাষায় অথবা প্রাচীন ল্যাটিন ভাষায় প্রচলিত ছিল না। এমনকি এ দুটি প্রাচীন ভাষায় মধ্যযুগীয় scholasticism বিকাশের সময়েও এ শব্দটির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর চত্ত্বরে, আমরা 'scientiis' আকারে একটি শব্দ দেখতে পাই,যা আরবি 'ulum'/ উলুম-এর অনুবাদ হিসেবে গৃহীত হয়। আরবি ভাষায় 'ulum' শব্দটি 'ilm' এর বহুবচন। সম্ভবতঃ বহুবচন সূচিত করার জন্য এই শব্দটির শেষে একটি 's' যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ আরবি বহুবচন 'ulum' এর অনুবাদে বহুবচন বিজ্ঞানাদি (sciences) বুঝাবার জন্যে তা করা হয়েছে।[১]

পরবর্তীতে খ্রিষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর চত্বরে, মহাজ্ঞানী খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ ও গবেষক পণ্ডিত রজার বেকন এই শব্দটিকে একবচনে 'scientia' এবং বহুবচনে 'scientiae' রূপে ল্যাটিন ভাষায় বিজ্ঞান বুঝবার জন্য উদ্ভাবন করেন।[২] উৎপত্তিমূলে scientia, sciens+entis শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তবুও এই পরিভাষা গুলো পাশ্চাত্যে সাধারণ্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না এবং বিজ্ঞানের পাশ্চাত্যের গবেষকরা এটাকে 'natural philosophy' বা 'প্রাকৃতিক দর্শন' রূপে প্রাক্তন গ্রিক ও প্রাক্তন ল্যাটিন ভাষার ঐতিহ্য মূলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যবহার করতে থাকেন।[৩] তবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন বিজ্ঞান বুঝাবার জন্য বিগত পাঁচশত বছর ধরে তাদের ব্যবহৃত 'natural philosophy' এর বদলে অধিকতর পরিশুদ্ধ পরিভাষা ব্যবহারের সংকল্প করল, তখন 'exsperimental science' শব্দ গ্রহণ করল, যদ্দারা তারা

নিশ্চয় 'scientiae' এর বদলে 'science' শব্দ ব্যবহার করল। যদিও এর অর্থ বিজ্ঞান নয়।[৪] সম্ভবতঃ তারা ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদেরকে ক্রুদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখতে 'scientiae'-র স্থানে ইংরেজ খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের 'science of God' কথাটির আদলে 'science' শব্দটি ব্যবহার করে। ইংরেজ খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা দেখা যায় যে, 'science' শব্দটা সর্বদা 'God' শব্দের সাথে সংযুক্ত করে ব্যবহার করত। যেমন 'science of God' (১৪২৬ খ্রি.)। মহাকবি Shakespeare 'science' অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাপন্ন 'mystery' রূপেও ব্যবহার করেছেন (১৪০১ খ্রি.)। তবুও 'science of God' পরিভাষাটি ধর্মযাজকদের মধ্যে ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[৫]

তবে প্রশ্ন জাগে কি কারণে পাশ্চাত্যের উদীয়মান বিজ্ঞানীরা ব্যবহারিক বিজ্ঞান বুঝাতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা একবচনে 'scientia' ও বহুবচনে 'scientiae' পরিহার করে, ইংলিশ যাজকীয় শব্দ 'science' ব্যবহার করে তাদের মধ্যে বিগত পাঁচ শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত 'natural philosopy' (প্রাকৃতিক দর্শন) কথাটির রদবদল করল এবং কেন?

উক্ত প্রশ্ন ধাঁধাঁপূর্ণ ও যৎসাধারণ হলেও ঐতিহাসিক দিক থেকে অতিব তাৎপর্য্যপূর্ণ।

আমাদের চিন্তার দিগন্তে এর কোনো সহজ ও সঠিক উত্তর নাই। আমরা কেবল অনুমান করতে পারি যে, উদীয়মান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা কোনো না কোনো প্রকারে, ক্যাথলিক খ্রিষ্টান যাজকদের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এবং পোপতন্ত্রের ঈর্ষান্বিত ধর্মদ্রোহীতার শাস্তি প্রদানের প্রবনতা থেকে আত্মরক্ষার মানসে অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণভাবে এহেন হাস্যকর কথাটি সম্পাদন করেছেন।

আমরা যুক্তি সহকারে অনুমান করি যে, এই উদ্দেশ্যে ক্যাথলিক যাজকদের এবং পোপতন্ত্রের চোখে ধূলো দিতে ইংলিশ যাজকীয় শব্দ 'science', যার সরল অর্থ 'নিদর্শন' বা 'insignia' এবং প্রায় তিন শতাব্দী ধরে ব্যবহার হওয়া 'science of God' তথা 'আল্লাহর নিদর্শন' অর্থের

শব্দটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 'scientiae' এবং রজ্যার বেকনের উদ্ভাবিত 'scientiae experinentalis' পরিভাষাটি বিকৃত করে 'experimental science' পরিভাষার প্রচলন করে।

আমরা উপরে বলেছি যে, ব্যবহারিক বিজ্ঞান মুসলিম গবেষকরা আবিষ্কার ও উন্নয়ন করেন। আল কুরআনে প্রদত্ত 'মা-দিরাইয়া', 'what of what?' অর্থাৎ কিসের কি? প্রশ্নের আদলে বিশ্লেষাণাত্মক যুক্তি বা 'analytical spirit'-এর অনুসরণ করে- এই মহাগুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও বিকাশ সম্পাদন হয়েছিল। কেননা, এই বিশ্লেষণণাত্মক যুক্তির চত্বরের বিপরীতে পূর্ববর্তী মানব সভ্যতার সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের চত্বরে আমাদের সূদূর প্রসারী অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় যে, এহেন বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি তথা 'analytical spirit' এবং বিশ্লেষনাত্মক পদ্ধতিগত শিক্ষার তথা 'anlytical methodology of learning' এর কোনো প্রকার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি আল কুরআন মজিদ নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে। একমাত্র কুরআন মজিদের চত্তরে বিপুলভাবে প্রদত্ত 'কিসের কি' প্রশ্নের আদলে এহেন 'anylitical spirit and anlytical methodology' তথা বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি ও বিশ্লেষনাত্মক পদ্ধতি মুলে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পন্ন হয়।[৬]

এ স্তরে এটাও আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, আল কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে গ্রিক মহাচিন্তাবিদ এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার প্রভাবে বিশ্বব্যাপী বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চা, 'inferntial knowledge' বা যুক্তিতাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চায় পর্যবসিত ছিল। আল কুরআনের বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির অনুসরণে মুসলিম গবেষকরা অত্র 'inferential' জ্ঞানচর্চাকে পরিবর্তন করে 'analytcal' জ্ঞানচচার উদ্ভাবন করেন।

অনুরূপভাবে, এটা বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা আল কুরআনের আবির্ভাব সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণাত্মক শিক্ষাপদ্ধতি বা 'anlytical methodology of learning' এর উপরেই দেখতে পাই, যা একটি চতুর্প্রন্তী জ্ঞানতত্ত্বের উপর বিকশিত হয়, যথা, ক) পর্যবেক্ষণ খ) বিশ্লেষণ গ) নিরূপণ

এবং ঘ) প্রকৃত জ্ঞান, যাকে আমরা কুরআনের 'অজানাকে জানা'র পদ্ধতিরূপে 'knowing the unknown' আখ্যায়িত করতে পারি।[৭]

আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায়, এহেন অজানাকে জানার পদ্ধতি চতুর্প্রস্তে প্রকাশ করা হয়, প্রথম পদক্ষেপ, selection from the data of the personal thought stream, দ্বিতীয় পদক্ষেপ 'acurate registration of the data or measurement', তৃতীয় পদক্ষেপ, 'bringing the data into useful form' এবং চতুর্থ পদক্ষেপ 'stepping upon the science being approximate formulation of the natural law'।[৮]

আল কুরআনের 'কিসের কি' বা দেরাইয়া যুক্তি তত্ত্বের বিষয়টি আমরা ষষ্ট পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। আল কুরআনের অনেক সুরায় অনুরূপ দ্বিপ্রস্তী প্রশ্নের অবতারনা করা হয়েছে যেগুলো মানব জীবনের বহুমুখী জটিল সমস্যাবলির প্রশ্ন-উত্তর বিষয়ের বিবেচনা করে বিশ্বজগতের স্রষ্টা-রক্ষাকর্তা-ভাগ্যনির্ধারক-মহাপ্রভু আল্লাহর সৃষ্টিকর্মের প্রতি সুনির্দিষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। এগুলোর কয়েকটি উদাহরণ উপরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদান করেছি। এখানে আরো একটি উদাহরণ প্রদান করা হল।

সুরা আত্-ত্বারিক্ব (৮৬):

১. শপথ আকাশের এবং রাত্রে আগমনকারী (তারকাপুঞ্জের)!

২. এবং কিসে তোমাকে বুঝাল যে রাত্রে আগমন কারী কি?

৩. এটা হল নক্ষত্র।

৪. কোথাও কোন আত্মা নাই যার উপরে একজন রক্ষক (ফেরেশতা) বিদ্যমান নাই।

আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আরো আলোচনা করেছি আল কুরআনে বারংবার উত্থাপিত দুই প্রকারের প্রশ্নমালা সম্পর্কিত কি(?) এবং কিসের কি(?)। তাতে সরল প্রশ্ন কি(?) এর উত্তর প্রদানের বিষয়টি মানুষের সাধারণ চিন্তা ধান্ধার আওতায় সোপর্দ করে, অপর প্রান্তেয় জটিল প্রশ্ন কিসের কি(?) এর উত্তর বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিতে প্রদান করতে আল কুরআন ব্যাপৃত হয়। এর

CamScanner

গভীরতর বিবেচনা আমাদেরকে ইসলামের প্রাথমিক যুগের বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের মুখোমুখি নিয়ে আসে।

মানবিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে ইসলাম একটি ধর্ম (দ্বীন), ইমান, Faith, প্রত্যয় ভিত্তিক, বিশ্বপালক মহাপ্রভু আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ/প্রত্যাদিষ্ট একটি অনন্য ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের শিক্ষা মূলে প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম ধর্মে 'শিক্ষা'-কে 'ইকরা'/ 'পড়' শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান করা হয়েছে, যা ইমান, Faith, প্রত্যয় থেকেও প্রাথমিক। আল্লাহ মানব জাতিকে একটি বিশেষ শিক্ষা প্রক্রিয়ায় সুপ্ত গুণাগুণ দ্বারা গুণান্বিত করেছেন; মানুষের মানবিক সত্তায় একটি সুপ্ত সামর্থ্য এঁটে দিয়েছেন; পরীক্ষা করার জন্য মহাপ্রভুর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিদর্শনসমূহ অধ্যয়ন (ইকরা) করে এবং সমগ্র বিশ্ব জগতের সমরূপতা, ঐক্য (uniformity of nature) উপলব্ধি ও অনুধাবন করে, সে স্বাধীন, স্বকীয় এবং যুক্তিসম্মত উপায়ে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও বিধাতা একমাত্র একক আল্লাহ'র প্রত্যয়ে, তথা দৃঢ়বিশ্বাসে, উপনীত হয় অথবা হয় না(?)অর্থাৎ তার ইক্‌রা/অধ্যয়ন এর সাথে ইমান প্রত্যয়, সৃষ্টি হয় কি হয় না(?) তা পরীক্ষা করার জন্য। আরো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি প্রক্রিয়ার uniformity/ সমরূপতা সম্পন্ন ঐক্য লক্ষ করে সে একক প্রভুর প্রত্যয়ে উপনীত হয় অথবা একক প্রভুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে অথবা অস্বীকার কর? সে স্বইচ্ছায় ইমানদার হয় কিংবা কাফের হয়- তা পরীক্ষা করার জন্য। তাই, ইমান ও কোফর, মহাপ্রভুকে স্বীকার করা ও অস্বিকার করা উভয়ই positive প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে, যা পুরস্কার ও শস্তির দিবসে positively বিবেচিত হবে।

ইসলাম প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বিশ্বাসের, ইমানের বিপ্লবের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বা ইকরার, বিপ্লব। তাই লক্ষনিয় যে, আল কুরআনে ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আহবান করার পূর্বে শিক্ষা প্রক্রিয়া, ইক্‌রা তথা সৃষ্টির নিদর্শন অধ্যয়নের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে, মানুষকে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উদ্‌গাতা আল্লাহর নামে সৃষ্টির প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্যময় নিদর্শনাদি অধ্যয়ন করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছেঃ ইকরা বিস্‌মি

রাব্বিকাললাজি খালাক, অর্থাৎ "তোমার প্রতিপালক প্রভুর নামে পড়/ পাঠ কর যিনি সৃষ্টি করেছেন"।

ইসলামের বিশ্বদর্শনে ইমান/Faith, মানব পিতা হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টির মত পুরানো ও সত্য। পক্ষান্তরে ইক্‌রা জ্ঞানান্বেষণ সার্বক্ষণিকভাবে নতুন, নবতর। অর্থাৎ ইমান আদম আ. সৃষ্টির মতোই পুরানো কিন্তু জ্ঞানান্বেষণ সার্বক্ষণিকভাবে নতুন ও নবতর। এক কথায়, ইমান ইক্‌রার পূর্বসুরী। জ্ঞানান্বেষণের ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ার চত্বরে জ্ঞানান্বেষণের স্বক্রিয়তার প্রমাণরূপে, আল কুরআন তা প্রতীয়মান করতে প্রয়াস পায়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সা.-কে আল্লাহ প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেন-'হে আমার প্রতিপালক প্রভু, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন/ আমাকে জ্ঞানে বর্ধিত করুন (রাব্বি যিদ্‌নী ইলমা)। অন্যথায় ইমান/Faith/প্রত্যয় স্থবিরতায় পর্যবসিত হয়। ইমান/Faith/প্রত্যয় যুক্তিনির্ভর এবং প্রোজ্জল হয়ে থাকে, কেননা এর ভিত্তিমূলে আল্লাহর সৃষ্টিরহস্যের নিদর্শন অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ এবং নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে মহাপ্রভুর এককত্ব ও প্রাকৃতিক জগতের uniformity ঐক্য উপলব্ধি। ইংরেজি ভাষার শব্দ 'belief' এবং বাংলা সংস্কৃত তৎসম 'বিশ্বাস' যা 'অবিশ্বাস' কে সূচিত করে, ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থায় ও ধর্মবিশ্বাসে এর কোনো স্থান নেই। এগুলো পৌত্তলিকতাভাবাপন্ন শব্দ, যা অযৌক্তিকভাবে, অজ্ঞানতাবশত ও জনপ্রিয় পরিভাষা রূপে যত্রতত্র মূর্খতা সুলভভাবে ইমান/Faith/প্রত্যয়' কে নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এই প্রচলন শুধু ইসলাম ধর্মে নয়, খ্রিষ্টান ও ইহুদি ধর্মেও প্রচলিত। 'ইমান/Faith/প্রত্যয়' শিক্ষা ও যুক্তির দিকে ঝোঁকে। অতএব, শিক্ষা, ইমান এর অগ্রবর্তী। 'ইমান/Faith/প্রত্যয়' সংস্কৃত 'প্রতীতি' সূচিত করে এবং conviction এ স্থিতিশীল হয়, যা নিছক belief ও বিশ্বাসকে বহুদূর অতিক্রম করে যায়। মানব ইতিহাসের চত্বরে ইসলাম ছিল এবং হয় একটি শিক্ষাবিপ্লব, মানবজাতির সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ভিত্তিক একটি মানবিক সম্পর্কের বিপ্লব এবং এতদসংগে বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে ভেদাভেদহীন ন্যায়তঃ

বিচারের বিপ্লব। অনুরূপভাবে, ইসলাম দুর্বল, সহায়হীন, অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত মানবতার বিশ্বজনীন সমঅধিকারের প্রবক্তা। জ্ঞানান্বেষণের এহেন নবুয়াতী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, মুসলিম জ্ঞান অন্বেষণকারীরা সর্বত্র বিচরণ করে, স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে গমন করে যত্রতত্র অবস্থিত শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্রগুলোতে জ্ঞান আহরণে ব্রতী হয়ে সত্য যেখানেই পাওয়া যায় সেখান থেকেই আহরণে মশগুল হয়। তাঁরা ভারতীয়, গ্রিক ও ইরানীয় বিজ্ঞানাদির এবং চৈনিক প্রজ্ঞা আত্নস্থ করতে সংস্কৃত গ্রিক, সিরিয়াক, আরামাইক, পেহলবি ও চৈনিক ভাষার থেকে আরবিতে ভাষান্তরিত করার মানসে এই সব ভাষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়। এবং এই সব ভাষায় শিক্ষণীয় ও দীক্ষণীয় মনিমুক্তা আহরণ করে আরবি ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করে। আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুন আর-রশীদের দরবারে বিদেশী জ্ঞান বিজ্ঞানের আরবিতে অনুবাদকারীদের পেশাগত সম্মাননা তৎকালীন বিশ্বে সর্বোচ্চ ছিল। তাঁদের লিখিত কাগজগুলো স্বর্ণের ওজনে পরিমাপ করা হত এবং এই স্বর্ণই সম্মাননা হিসেবে দেয়া হত।

নির্দেশিকা

১. প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২. ঐ ।

৩. উপরের ষষ্ট পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪. ঐ।

৫. ঐ।

৬. ঐ।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

CamScanner

নবম অধ্যায়

আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামি উলুম আত-তাজরিবিয়ার সম্পর্কের ব্যাপারে বিশ্লেষণ

(ইসলামি বিশ্বতত্ত্ব বনাম আধুনিক সৃষ্টিতত্ত্বের স্বরূপ অনুধাবন করার পশ্চাৎভূমি হিসেবে)

তৃতীয় সহস্রাব্দের আবির্ভাবে পূর্ববর্তী বিশ্বতত্ত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি বিশ্বতত্ত্বেরও যুগসম্মত কিছুটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সুদূর প্রসারী অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এবং এতদসময়ে যুক্তিতাত্ত্বিক দর্শনের প্রচুর পশ্চাদ্ধাবনের কারণে ইসলামের বিশ্বতত্ত্বের তুলনামূলক অনুধাবনের জন্য মৌলিক কুরআনী উৎস থেকে পুনর্গঠিত ও সংগতিপূর্ণরূপে পুনঃপ্রকল্পিতাকার সময়োপযোগী করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কারণ ইসলামি বিশ্বতত্ত্ব পূর্ববর্তীতে যেভাবে সূত্রায়ন করা হয়েছিল, তা যুক্তিতাত্ত্বিক দর্শন এর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের প্রথম যুগের ইলমুল আকায়েদ, তথা ধর্মীয় বিশ্বাস শাস্ত্রের ভিত্তিতে করা হয়েছিল, যা বর্তমানে কিছুটা সময়াতীত হয়ে গেছে।

পুনর্বিবেচনা করার ভাবটি মনে রেখে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারি, যথা- (ক) আল কুরআনের জোড়া সৃষ্টি তত্ত্ব (খ) বস্তুগত দ্রব্যসামগ্রীর সত্যিকারের অস্তিত্বের স্থায়ীত্বের তত্ত্ব, (গ) নিঃস্কলুষ চলমান বিশ্ব ব্যবস্থা, বিশ্ব প্রকৃতির সমরূপতা (Uniformity of Nature) এর তত্ত্ব এবং (ঘ) বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা মহাপ্রভু আল্লাহর এককত্ব ও অসীম-অনন্ত-চিরঞ্জীবী তত্ত্ব। এগুলো নিম্নে পর্যলোচনা করা হল।

(ক) আল কুরআনের জোড়াসৃষ্ঠি তত্ত্ব

ইসলামি বিশ্বতত্ত্ব জোড়াসৃস্টির তত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ হয়। আল কুরআন বলে, মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। অতএব, বিশ্বজগতে অবিচ্ছেদ্য জোড়ায় জোড়ায় আত্মীয়তার সম্পর্কের

CamScanner

বিপরীত জোড়া-বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বশীল কোনো বস্তু পাওয়া যাবে না। অথবা জোড়া-বিহীন একক বস্তু বা সরল, তথা অবিচ্ছেদ্য, একক, এমন কিছুই পাওয়া যাবে না। বিশ্বজগতে সব কিছু অস্তিত্বের দিক দিয়ে জটিল বৈপরীত্বের সমাহার, যুগ্মসত্তা, combination of male and female, of positve and nigative elements, আরবি ভাষায় বলা হয়, মুরাক্কাব (যৌথ), যা বছীত অর্থাৎ একক এর বিপরীত। অন্যভাবে বলা যায় যে, এ বিশ্বজগতে একক বলে কিছুই নাই, সবই একই জাতীয় বস্তুর বৈপরীত্বের সমাহার।

এরূপ যৌথ বা যুগ্ম অস্তিত্বসম্পন্ন সৃষ্টিজগতের বস্তুসত্তার বিপরীতে, সৃষ্টিকর্তা, মহাপ্রভু আল্লাহই একমাত্র একক, আরবি ভাষায়ঃ আহাদ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে একক, অদ্বিতীয়। শুধু তাই না- তিনি সত্ত্বাগতভাবে একক ও অনন্ত অসীম। বৈদিক ভাষায় বলা হয়েছেঃ এক মেবা দ্বিতীয়ম; অর্থ এক অদ্বিতীয় সত্ত্বা।

এরূপ অনন্ত অসীম একক বিশ্বপ্রভুকে মান্য করার পরিকল্পিত ধারণা বা প্রত্যয়কে আমাদের জানা মতে সর্বাধিক পুরনো প্রকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের 'বেদ' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'। অতঃপর ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের জনক হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস-সালাম) কর্তৃক প্রবর্তিত মহাপ্রভু আল্লাহর 'তাওহিদ' বা এককত্ববাদ, ইংরেজি ভাষায় যা 'unitarianism' নামে পরিচিত (Oxford Dictionary দ্রষ্টব্য)। আল্লাহর এককত্ব একাত্মবাদ তাওহিদই হল ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র। এহেন আল্লাহর এককত্ববাদই প্রকৃষ্ট ধর্মের সারবত্তা। বস্তুতঃ ইসলাম ধর্ম যথার্থ আল্লাহর একত্ববাদের প্রবক্তা, এর চেয়ে কোন অংশে বেশিও না কমও নয়।

বুদ্ধিতাত্ত্বিক সূত্রায়ণের ক্ষেত্রে, তাওহিদ, আল্লাহর এককত্ববাদ, খ্রিষ্টানদের কথায়, 'Unitarian Faith', এককত্ববাদী প্রত্যয় বা ইমান হলোঃ বিশ্বব্যাপী সৃষ্টিতাত্ত্বিক জোড়াসৃষ্টি, 'pair creation'-এর উল্টা দিক, counter-part, স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যকার প্রমাণসই বৈশিষ্ট্য, 'distinguishing trait', যা আল্লাহ ও সৃষ্টজগত এবং God ও world এর

CS CamScanner

মধ্যকার পার্থক্য সূচিত করে। আমরা এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন তুলতে পারি যে, আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞান, experimental science-এর দৃষ্টিতে জোড়া সৃষ্টির সূত্রটি পরীক্ষণীয়ভাবে কি পরিমাণ গ্রহণযোগ্য?

প্রথম প্রতিপাদ্য: পদার্থিক বস্তুর সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য ক্ষয়িষ্ণু

পদার্থিক বস্তুর স্বরূপ উদঘাটনে বলা যায়, তা হল একটি পদার্থিক সামগ্রী, ভৌতিক দ্রব্য, যাকে আরবি ভাষায় 'শাইয়্য' ('شَيّ'), বলা হয় এবং আল কুরআনের ভাষ্যে 'শাইয়্য' এর অর্থ জিনিষ, যেমন- আমরা বলি: কোনো জিনিষ, অথবা বলি 'কোনো কিছুই না'। যা কিছু আস্থিত্বশীল তা হল 'শাইয়্য': একটি জিনিস, বস্তু। আরবি ভাষায় 'শাইয়্য' এর বহু বচন 'আশয়্যা', অর্থ বস্তুসমূহ। আর আরবি ভাষায়, সত্যিকারের অস্তিত্ব বা reality কে বলা হয় 'হাকীকত' এবং এর বহুবচন 'হাকায়েক'।

লক্ষণীয় যে, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মূলত বস্তুসত্তার অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এটা সর্বজন বিদিত যে, বস্তু মাত্রই ক্ষয়িষ্ণু এবং ধবংসশীল। অতএব, বস্তুসত্তার স্থায়ীত্ব কল্পনাভিত্তিক হওয়ায় আধুনিক পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মৌল ভিত্তি বা স্থায়ীত্ব, কল্পনাভিত্তিক। সেহেতু আধুনিক পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মৌল ভিত্তি নড়বড়ে হতে বাধ্য। এহেন কারণে, এ ব্যবহারিক বিজ্ঞানে, experimental science এর প্রতিপাদ্যগুলো নিশ্চয়তা বিবর্জিত, hypothetical বা অনুমান সিদ্ধ। কাজেই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞায়ন বা definition অনুসন্ধান করা মানা, নিষিদ্ধ। আধুনিক পাশ্চাত্যের experimental sceince, ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে experimental methodology, তথা এক্সপেরিমেন্টাল পরীক্ষণ ভিত্তিক জ্ঞান রূপে কল্পনা করা হয়। এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টিকলে–হ্যাঁ; আর না টিকলে–না, বলে মনে করা হয়।

দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য: বস্তুসত্তার হাকীকত স্থিতিশীল

আলোচ্য বিষয়ে আমাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য, মুসলমানদের আল কুরআনের সূত্রে উদঘাটিত তত্ত্বঃ 'হাকায়েকুল আশয়্যা ছবিততুন'; অর্থাৎ বস্তুসত্তার

হাকিকতই স্থিতিশীল। সোজা কথায়, বস্তুসত্তা ক্ষয়িষ্ণু, বস্তু মাত্রই ধ্বংসশীল, কিন্তু বস্তুসত্তার অস্তিত্বের ভিত্তি হাকীকতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং হাকিকত যাথাযথভাবে স্থিতিশীল ও স্থায়ী। এক কথায়: বস্তু অস্থায়ী এবং বস্তুর হাকিকত স্থায়ী, তাই এ প্রতিপাদ্যে বলা হয়: 'হাকায়েকুল আশয়্যা ছাবিতুতুন', অতএব, হাকিকতের উপর ভিত্তির নিরিখে বস্তুর বিচার বিবেচনা করতে হবে।

অন্যভাবে বলা যায়, পদার্থিক বস্তুসত্তা সংশ্লিষ্ট হাকিকতের সাথে বিজড়িত হয়ে থকে এবং হাকিকত (realities) বস্তুটিকে স্থায়িত্ব প্রদান করে। পদার্থ ও হাকিকত একই মুদ্রার দুই পিঠ, যাতে পদার্থ হাকিকতকে নির্দেশ করে আর হাকিকত পদার্থকে স্থায়িত্ব প্রদান করে।

অধিকন্তু পদার্থ প্রকৃতিগতভাবে ক্ষয়িষ্ণু হওয়ায় নিজস্ব উপায়ে অস্তিত্বশীল থাকতে সক্ষম হয় না; তাই বস্তুসত্ত্বাগুলোর অস্তিত্ব এগুলোর সংশ্লিষ্ট হাকিকতের উপর নির্ভরশীল।

প্রতিপাদ্য হিসেবে বিষয়টি দর্শন শাস্ত্রের ধারনা: appearance and reality ও quality and substance এর সাথে তুলনীয়, তবে মনে রাখতে হবে যে, উক্ত দার্শনিক ধারণাগুলো অস্তিত্বের নিরিখে abstract, অন্যদিকে আমাদের আলোচ্য বিষগুলো concrete।

আরো একটি উদাহরণ টেনে আমরা প্রসিদ্ধ জারম্যান দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যান্ট এর রচিত Critique of Practical Reason এর নিরিখে phenomena and noumena এর সাথে 'বস্তুসত্তা ও হাকিকত' এর তূলনা করতে পারি, উপরে উক্ত একই কথা মনে রেখে যে, উক্ত দার্শনিক ধারণাগুলো abstract আর আমাদের আলোচ্য বিষগুলো concrete। কেননা, abstract কোনো বস্তু হতে পারে না; তা একটি বিশ্বজনীন ধারণা মাত্র এবং ধারণা দিয়ে কোনো concrete, নিরেট, বস্তু তৈরি হয় না।

আরো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, দার্শনিক ক্যান্ট এর 'Noumena' একটি ধারণা বা কনসেন্ট ও একটি বিশ্বজনীন ধারণা বা আইডিয়া; এটা তো 'reality-in-itself' বা 'reality *per se*' নয়, যা পক্ষান্তরে হাকিকতের

CamScanner

বেলায় যথার্থ সত্য। অতএব, আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানের hypothesis বা অনুমানঃ conservation of matter and conservation of energy'-র সাথে সবরাসরি সাংঘর্ষিত হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে পদার্থ ও ভৌতিক শক্তি, 'matter and energy' হল পদার্থিক সত্ত্বা, ভৌতিক বস্তুই বটে, যা সর্বদা ক্ষয়িষ্ণু, সার্বক্ষণিক পরিবর্তনশীল এবং সর্বসাকুল্যে ধ্বংসশীল, যাবত সংশ্লিষ্ট হাকিকত বা reality এটাকে স্থিতিশীলতা প্রদান করে। একমাত্র হাকিকতের প্রভাবে পদার্থ ও ভৌতিক শক্তি চিরক্ষয়িষ্ণুতার চত্বর থেকে উন্নিত হয়ে স্থিতিশীলতা লাভ করে। অতএব, হাকিকতের প্রভাব ছাড়া conservation এর কথাই অবান্তর।

এখানে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রমাণসই তথ্য উপাত্ত, proven facts–কে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি না। বরং আমরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জন্মলগ্ন বা উৎপত্তির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে, গোঁড়াতে বুঝাতে চাচ্ছি যে, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রথমেই বুঝতে হবে যে, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, তথা experimental science, আল কুরআনের তাজরিবী উলুম এর স্পিরিট থেকে মুসলিম জ্ঞান তাপষরা বের করেছিলেন; তাতে মৌল ধারণা ছিলঃ আল্লাহর হুকুম বা আদেশ ভিত্তিক হাকিকত, reality-র আদলে পদার্থ ও ভৌতিক শক্তির পদচারণা। আল কুরআনের ছত্রছায়ায় উদ্ভূত উলূম আত-তাজরিবীয়া-র প্রমাণসই কোনো তথ্য উপাত্তকে মুসলিম বিজ্ঞানীরা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। তবে কথা হল, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের তথ্যপ্রমাণ, কুরআনী বিজ্ঞানের সাথে সামনঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমরা কিঞ্চিত এদিকে মনোনিবেশ করব।

বিষয়টিকে অর্থবহ করে তোলার জন্য আমরা আল কুরআনের গঠনশৈলীর (structure) দিকে নজর দিতে পারি। আল কুরআনের এক-একটি বাণী বা বাক্যকে 'আয়াত', বহুবচনে 'আয়াত' বলা হয়। সম্পূর্ণ কুরআনে এরূপ ৬২৩৬টি আয়াত আছে। আরবি ভাষায় আয়াত (আয়াহ) মানে নিদর্শন, সূচিতকারী, প্রমাণসই চিহ্ন, প্রকৃষ্টপ্রমাণ ইত্যাদি। আর আল কুরআনের প্রেক্ষিতে আয়াত অর্থ যা মহান সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা, মহাপ্রভু

CamScanner

আল্লাহকে সূচিত করে, তথা আল্লাহর নিদর্শন। তদুপরি 'আল কুরআন' মানে পাঠ্য, পাঠনীয়, বাণী, কথা, এক কথায় কুরআন হল আল্লাহর কথা, আল্লাহর বাণী, যা আবৃত্তি করে, সুর করে পাঠনীয়।

স্মর্তব্য যে, আজকাল ইংরেজি ভাষার প্রভাব যেমন আমরা বাংলাভাষার উপরে দেখতে পাই, তদ্রূপ আরবি ভাষার প্রভাব ইংরেজি সাহিত্যের উপর খ্রিষ্টিয় চৌদ্দ, পনেরো, ষোল, সতেরো শতাব্দীতে লক্ষ্যনীয় ছিল। বিশেষতঃ ইংরেজ যাজকশ্রেণি খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল প্রচারে আরবিতে বহুল প্রচলিত আয়াতুল্লাহ (আল্লাহর আয়াত) কথাটিকে একই অর্থে 'sign of God' কথায় রূপান্তরিত করে ব্যবহার করার রীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'Sign' কথাটিকে তারা 'science' কথায় রূপান্তরিত করে চৌদ্দ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বহুল ব্যবহার করতে থাকেন (Oxford English Dictionary, Vol. ix, 1961, p. 221 পৃষ্ঠায় এর বিবরণ দেখা যেতে পারে)। অত্র Dictionary-তে মহাকবি সেক্সপিয়ারকে 'science' শব্দটি 'mysterical sign' অর্থে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। এতে ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে বলা হয়: "For God of science is Lord"-। আবার ১৪২৬ খ্রিষ্টাব্দের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায়: "Scyence the height and deepenes(?) of ryches of wysdome and science of God" "Divines suppose three kinds of sciences in God. The first science of mere knowledge, second a science of vision, third, an intermediate science." ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দের উদ্ধৃতি দিয়ে এতে সেক্সপিয়ারকে উদ্ধৃত করে বলা হয়: "Had not in natures mysterie more science than I have in this ring?"

উপরে উল্লেখিত ১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দের উদ্ধৃতি মূলে অনুমান করা যায় যে, আধুনিক ইউরোপের ভাষাগুলোতে খ্রিষ্টিয় আঠারো শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত 'science' শব্দটি বিজ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং বিজ্ঞান বুঝাতে পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞানীরা খ্রিষ্টিয় তের শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত 'natural philosophy' প্রতিশব্দ ব্যবহার করে আসছিল, এমনকি 'natural science' রূপেও এটাকে বর্ণনা করা হয়নি।

CamScanner

এখানে সঠিকভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন, আধুনিক পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা 'science' প্রতিশব্দের যে বহুল ব্যবহার করে আসছে, এ শব্দটির প্রকৃত হাদিস কি? প্রথমে সুনিশ্চিতভাবে জানা দরকার যে, 'science' Latin শব্দ নয়, Greek শব্দও নয়, অথবা এ দুই ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষা থেকে কোন প্রকারে উদ্ভূতও নয়। যা complex হয়ে থাকে, তার সন্ধিবিচ্ছেদ করা যায়। Science শব্দটি বুঝা যায় যে, এটা একটি English colloquial word, যা দুই-তিন শতাব্দী ধরে বহুল ব্যবহারের সাক্ষ্য-ছবুত দ্বারা প্রমাণিত-এটাকে 'sign' অর্থ বুঝাবার জন্য 'Divine sign of God' অর্থে ব্যবহার করেছে যেমন আমরা উপরে দেখিয়েছি। তবে আমাদের একটি বড় প্রশ্ন বিগত উনিশ ও বিশ শতকে (খ্রি.) পাশ্চাত্যের সব ভাষায় 'experimental science' এর ব্যহার দেখা যায়, তা কখন, কোথায়, কিরূপে এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে পাশ্চাত্যে প্রথমে ব্যবহার আরম্ভ হয়? এর তদারক করে দেখা।

আপাততঃ উক্ত প্রশ্নটি উহ্য রেখে, আমরা আমাদের পূর্ব কথায় ফিরে আসি। ইংরেজ ধর্ম যাজকরা 'sign of God' কে divine রূপ দেবার জন্য 'science of God' -এ রূপান্তরিত করেছেন, এ কথাটি ধরে নিয়ে আল কুরআনের বাকরীতির সাথে তুলনা করলে, দেখতে পাই যে, sign অর্থে science বুঝে নিলে, এ শব্দটি divine অর্থ দেয়ার কারণে আল কুরআনের 'আয়ত' ও 'আয়াত' এর সাথে ভাব মূর্তি ও অর্থগত দিক দিয়ে হুবহু মিলে যায়। লক্ষনীয় যে, science শব্দটি যেমনি উনিশ শতকের (খ্রি.) পূর্বে বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহার হয়নি, তেমনি 'আয়ত' এক বচন ও 'আয়াত' বহুবচন শব্দ কখনও বিজ্ঞান বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। আরবি ভাষায় বিজ্ঞানকে 'ইল্‌ম', বলা হয়, যার শাব্দিক অর্থ pointer to বা নির্দেশকারী, তাই বিজ্ঞানের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আরবি, ফার্সি, তুর্কী ও উর্দু ভাষায় ইল্‌ম এর বহুবচন 'উলুম' পরিভাষাটি বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, আয়াত শব্দটি আল কুরআনের বাক্যসংখ্যা গণনা করার ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য যে, আল কুরআনে শুদ্ধ গণনা মতে, ৬২৩৬ টি

CamScanner

আয়াত বিদ্যমান, যেগুলো ১১৪টি সুরা বা পরিচ্ছেদ-এ বিভক্ত। এখানে আয়াত এর অর্থ sign of Allah= science of God. আরবি ভাষায় ইলম শব্দটির শাব্দিক গঠনের সাদৃশ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়। আদতে ইংরেজি ভাষায় (অনুরূপভাবে অন্যান্য সব পাশ্চাত্য ভাষায়) এরই অনুবাদ রূপে বিজ্ঞান শব্দের আবির্ভাব! এর সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন রজার ব্যাকন খ্রিষ্টিয় বারো শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় 'scientia' ও বহু বচনে 'scientiae'। এটা একটি সন্ধি যুক্ত শব্দ, sciens+entis থেকে scientia, অর্থাৎ ইলম এবং বহুবচনে scientiae অর্থাৎ বহু বচনে 'উলুম' এর অনুবাদ।

আরবি 'ইল্‌ম' শব্দের নির্মাণ শৈলীর দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, মৌল শব্দ 'আলম্‌' থেকে এটার উৎপত্তি, 'আলম' অর্থ নিদর্শন, sign, আর 'ইলম্‌' অর্থ 'নিদর্শন দ্বারা জানা'। এর কর্তৃবাচক শব্দ 'আলিম' মানে, যে নিদর্শনের মাধ্যমে জানে। এ স্তরে 'আলম্‌' শব্দটি রজার ব্যাকন এর 'sciens' শব্দের সাথে সমার্থক প্রতীয়মান হয় এবং বাস্তবে হুবহু নাও হতে পারে।

ল্যাটিন শব্দ sciens + entis= scientia ইল্‌ম এর হুবহু সমার্থবোদক হয়ে দাঁড়ায়, যেমন আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে লক্ষ করেছি।

Knowledge-এর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধারণ ধারণা

প্রণিধান যোগ্য যে, বিদ্যা, জ্ঞান, knowledge, wisdom ইত্যাদি জ্ঞানীয় শব্দের বাহ্যিক গঠন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে যদিও একই রূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বুঝাবুঝি ও হৃদয়ঙ্গম এর বেলায় তা দুই অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, ইংরেজি ভাষায় know মানে জানা হলে knowledge মানে হবে 'যা জানা হয়' বা যাহা জানা গেল, তথা বিদ্যা, যেমনঃ যাদু বিদ্যা= knowledge of sorcery-। এটাকে জ্ঞান বলা যাবে না। 'জা' ও 'জ্ঞা' এর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ বিদ্যমান। তাই বুঝাবুঝির ব্যাপরে knowledge-কে জ্ঞান বলা যাবে না। জ্ঞানের ইংরেজি হবে, যা মানুষকে বিজ্ঞ করে, তথা to be wise, wiser, wisdom. তাই বিজ্ঞানের আসল রূপ

পাশ্চাতের আধুনিক পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। অবশ্য এটাও মনে রাখা দরকার যে, পাশ্চাতে আধুনিক বলতে বিশেষ করে প্রটেস্টেন্ট খ্রিষ্টানদেরকে বিশেষভাবে বুঝানো হয়। পাশ্চাত্যের বৃহত্তর খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী ক্যাথলিকদেরকে, এমনকি খ্রিষ্টান ধর্মগুরু পোপকেও আধুনিক বলা যাবে না। আর প্রটেস্টেন্ট তো কোন ধর্ম হয় না; তাই ক্যাথলিকরা এদেরকে খ্রিষ্টান বলে স্বীকারও করে না। তাদের মধ্যে ধর্মীয় পর্যায়ে এতই বৈরী ভাব যে, কোন ক্যাথলিক প্রটেস্টেন্টকে মেয়ে বিয়ে দেবে না; এরা আল্লাহ বা God এ বিশ্বাস করে না; বরং Big-bang Theory- তে বিশ্বাস করে। (আমরা পরবর্তিতে একটি প্রমাণসহই প্রবন্ধ রচনা করার আশা রাখি, যাতে Big Bang Theory অলিক বলে প্রমাণিত হবে)।

বিজ্ঞান মানে wisdom; বি= বিশেষ, জ্ঞা= অন্তরে উপলব্ধি, ন= প্রবিষ্ট হওয়া, অর্থ্যাৎ যেরূপ যানা অন্তরে (soul) প্রতিষ্ট হয়ে উপলব্ধি (realization) সৃষ্টি করে, তদ্রূপ বিশেষ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। বিশেষতঃ যা তাজরিয়ার মাধ্যমে অকাট্য প্রমাণিত হয়, তাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানুষকে কেবল শিক্ষিত করে না, বরং বিজ্ঞ করে। তাই প্রাচ্যের ভাব ধারণা, বিজ্ঞানের সাথে knowledge এর খাপ খাবে না। বিশেষতঃ প্রাচ্যের মুসলমানদের আবিষ্কৃত উলুম বা বিজ্ঞান হলে, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের wisdom এর দোর খুলতে হবে। কিন্তু এখানে আরো একটি বিভ্রাট আছে।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষত: উর্ধতন চিন্তা চৈতন্যে প্রাচীন গ্রিক দর্শনের অনুসরণ করে। গ্রিক দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব ধারণামূলক, conceptual; যাকে বলা হয় abstract-অর্থাৎ বস্তুজগতের, material world এর বস্তুগত, বাস্তবতা বা material প্রকৃতির উর্ধে যা কল্পলোকের 'কল্পনায়' স্থিত।

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে বাস্তবতা বিবর্জিত abstract idea-র কোনো স্তর নাই। ইসলামের দৃষ্টিতে এ বিশ্বজগতে যা কিছু বিদ্যামান সবই বাস্তব concrete, সৃষ্ট এবং এগুলোর জ্ঞান মহাজ্ঞানী বিশ্বস্রষ্টার বাস্তব সৃষ্টিমূলে বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত।

CamScanner

সুতরাং যেখানে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জ্ঞান মুখামুখি দাঁড়ায়, সেখানে গ্রিকদের abstract কল্পনারাজ্যের conceptual knowledge, প্রকৃত অর্থে 'ধারাণামূলক বিদ্যা'-র মুখামুখি প্রাচ্যের বাস্তব সম্মত জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে, অধিকন্তু মুসলিম জ্ঞানতত্ত্বের সম্মূখীন হলে মুসলমানদের বাস্তবসম্মত concrete, experimental science তথা উলুম আত-তাজরিবিয়া, তাজরিবী বিজ্ঞানের সাথে মোকাবিলা করে দেখতে হবে। এক কথায়, গ্রিক ভাবাপন্ন পাশ্চাত্যের abstract concept কে মুসলমানদের concrete পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসূত তাজরিবী বিজ্ঞানের মুখামুখি বৈপরীত্বে দাঁড় করাতে হবে।

অতএব, বিশেষভাবে এক্ষেত্রে অনুধাবন করতে হবে যে, এরূপ মুখামুখি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মুসলমানদের ইল্‌ম ও উলুম যা ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা তাজরবী বিজ্ঞানকে সূচিত করে, এর মুখামুখি গ্রিকভাবাপন্ন পাশ্চাত্যের দর্শনতাত্ত্বিক conceptual knowledge কে দাঁড় করাতে হবে, যা abstract knowledge এর উপর দন্ডায়মান হয়। ফলে উভয়ই পারস্পরিক বিপরীত মুখি দাঁড়ায়ে জ্ঞানতত্ত্বকে দ্বিখণ্ডিত করে, পাশ্চাত্যকে universal এর স্তরে ও মুসলিম জ্ঞানতত্ত্বকে particular এর পদে দন্ডায়মান করায়। অন্য কথায়, উভয়কে পারস্পরিক বিপরীতমূখি abstract ও concrete এর দোরগোড়ায় মুখামুখি অবস্থান করায়। সারকথা: abstract concept মানুষের কল্পনায়, আর মুসলমানদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান সৃষ্টিকর্তার concrete সৃষ্টির বর্ণনায় অবস্থিত।

আরো অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, উপরে আমরা যেমন দেখেছি, পূর্বকালে ইংরেজি কথায় উচ্চারিত science or syence শব্দ abstract ও theoretical অর্থ বহন করে; তা হলে বর্তমানে প্রচলিত science শব্দ কিরূপে ব্যবহারিক, experimental বিজ্ঞানের concrete বা বাস্তব ঘটনার অর্থবহ বৈশিষ্ট্য আহরণ করল? এ সাদামাটা 'নিদর্শন' এর অর্থবহ শব্দটি কখন থেকে এবং কিরূপে experimental science বা বিজ্ঞানের মত জটিল অর্থবহ হয়ে উঠল। আর বিভিন্ন উচ্চারণে পাশ্চাত্যের দেশে দেশে এ

CamScanner

science রূপীয় শব্দ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অর্থবহ রূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় গৃহীত হল এবং এ নিছক ইংলিশ যাজকীয় কথ্যভাষার শব্দটিকে ল্যাটিন রূপেও প্রতীয়মান করা হল? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেতে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

কুরআনে বার্ণিত বিশ্বজগতের নিখুঁত চলমান বিশ্বব্যবস্থা বনাম আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের কল্পিত Uniformity of Nature

আল কুরআন বারে বারে বিশ্বজগতের নিখুঁত সৃষ্টি এবং প্রাকৃতির স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধিব্যবস্থা, অপরূপ সৌন্দর্য, গ্রহ নক্ষত্রের চলাচলের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছেঃ

> তোমার চারিপাশে বিশ্বচরাচরের দিকে চেয়ে দেখ, মাটির দিকে দেখ, আকাশের দিকে দেখ, গাছপালার দিকে দেখ, বৈচিত্র্যময় ফুলের দিকে দেখ, ফলের দিকে দেখ, চলমান নদীর দিকে দেখ, স্থির দন্ডায়মান পাহাড় পর্বতের দিকে দেখ, উটেরপীঠে কুজের দিকে দেখ, নদীর ও সমুদ্রের জোয়ার ভাটার দিকে দেখ, সকল বস্তুর দিকে দেখ, প্রত্যেক জিনিষের দিকে দেখঃ তুমি সৃষ্টিকর্মের মধ্যে কোন খুঁত দেখতে পাও কি? এগুলোর সাজ সজ্জায়, ব্যবস্থাপনায় ও কার্যকলাপে? এ সবের দিকে তাকিয়ে দেখ, পুনরায় দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখ! তোমার দৃষ্টি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে (সুরা মূল্ক, ৬৭ঃ ৩-৪)।

এটা আল কুরআনের উদ্ধৃতি, যাকে বিজ্ঞানীরা Unifornity of Nature, 'প্রকৃতির সমরূপতা' নামে আখ্যায়িত করে থাকে, যা সুনিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানীদের একটি প্রমাণবিহীন কল্পিত মৌলিক বিশ্বাস বা hypothesis, অনুমান, যা তারা হাতে কলমে প্রমাণ করতে অক্ষম। কিন্তু এ মৌল বিশ্বাস ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান এক পদও সামনে বা পেছনে চলতে পারেনা। আল কুরআনের বেলায় এটা হল একটি doctrine, ঐশী বিধান,

CS CamScanner

নিছক অনুমান বা hypothesis নয়। আল কুরআনে মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকর্মের বর্ণনা দিচ্ছেন, যা দিব্য, বাস্তব, conceete এবং হুবহু তথ্য-তত্ত্বগত পরিচয়। এখানে আল্লাহ বলছেন, Allah speaking, God speaking!

আল কুরআনের সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ, ওয়াহী, revelation- এ, প্রত্যাদিষ্ট রসুল, প্রেরিতপুরুষ, prophet-কে বলা হয়েছে: পড়, read, ইকরা, অধ্যয়ন কর, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। এখানে পড়তে বলা হচ্ছে। হযরত মুহাম্মদ সা.-কে, যিনি লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই, জানেন না, তাই উদ্দেশ্য হল: আল্লাহর হিকমত, divine technique, সৃষ্টি কৌশল অধ্যয়ন কর: কিরূপে তোমার মহান সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, মহাপ্রভূ মানুষ 'সৃষ্টি' করেছেন 'আলক', zygote, শুক্রানু-ডিম্বাণুর নিষিক্ত লট্‌কানো বস্তু থেকে, যা বাচ্চাদানী বা uterus-এর দেয়ালে লটকে থাকে।

সুনিশ্চিত ধারণা করা যায় যে, আল্লাহর রসুল সা.-কে মাতৃগর্ভে শিশু পালনার পর্যায়ক্রমিক অন্যূন ১৪টি সৃজনশীল অবস্থা, প্রত্যক্ষ করানো হয়ে থাকবে, যে গুলো পরবর্তীতে প্রকাশিত সুরাগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন আমরা Maurice Bucaille এর গবেষণামূলক পুস্তিকায় দেখতে পাই (*The Bible, the Quran and Science*: http://www.quranic studies.com lprintout 83. html. শিশুর জন্ম বৃত্তান্তের আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে, দেখুন: Keith Moore and V.N. Persoud: *The Developing Human, Clinically Oriented Embriology*, 5th edn. Philadelphia, W.E. Sounders So. USA 1993; Keith L Moore and E.Marshall Johnson: *Human Development as Described in the Quran and Sunnah*, Saudi Arabia, 1992).

আল কুরআনের প্রত্যাদেশ, সৃষ্টিকর্মের 'হিকমা' বা ঐশী কৌশলের জ্ঞান নিয়ে অবতীর্ণ হয়, যাতে, মহান আল্লাহ নিজেই মানুষকে নবিজী মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেন: পড়া, লিখা শিক্ষা করার জন্যে এবং সৃষ্টিকর্মের খোদায়ী, divine, ঐশী কৌশল, হিকমত, technology অধ্যয়ন করার জন্যে; অতপর বলেন: মহা সম্মানি ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আল্লাহ

"মানুষকে কলম দিয়ে লিখার কৌশল শিক্ষা দিলেন (এবং পড়া ও লিখার মাধ্যমে অনুধাবন করে) অজানাকে জানার কৌশল শিক্ষা দিলেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিলেন জানতে, যা সে জানতো না" (উপরে উক্ত সুরা)। 'অজানাকে জানার প্রক্রিয়া-কে 'ilm' বা জ্ঞান বলা হয়েছে। এটা 'জ্ঞা,' 'জা' নয়। ইংরেজি ভাষায় know. মানে 'জানা' এর থেকে knowledge মানে সাদামাটা 'জানা'; এতে অজানাকে জানার কথা নাই; অতএব, knowledge মানে, যা জানা গেল। জ্ঞান হবে অজানাকে জেনে। তাই ilm বা জ্ঞান মানে knowledge না, wisdom, তথা wise বা বিজ্ঞ হওয়ার মাধ্যমে যা আয়ত্ব করা হয়। সুতরাং বিজ্ঞান, তথা বিশেষ জ্ঞান এর ইংরেজি অর্থ knowledge না, বরং wisdom; বলা যেতে পারে। knowledge মানে সাদামাটা 'বিদ্যা'।

এক কথায়, 'অজানাকে জানার জ্ঞান'ই হল ইসলামের জ্ঞানীয় ঐতিহ্যের মূল ধারা। আরবি ভাষায় ইসলামি ঐতিহ্যে বিদ্যাকে 'ইলম' নয়, 'ফন্' বলা হয়। উপরে উদ্ধৃত সুরা আলক এর প্রথম পাঁচ আয়াতেঃ খোদায়ী বা ঐশী সৃষ্টিকর্মের বিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আরবি ভাষায় জ্ঞান অর্থে 'ইল্‌ম' শব্দটি উভয়বিদ 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান' এর পরিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। 'ইলম' এর বহুবচন 'উলুম' যা সাধারণভাবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অর্থবহ। ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যেহেতু একাধিক বিষয় সম্বলিত হওয়া ছাড়া চালু করা যায় না; যেমন- পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারেনা, তেমনি উভয়েই অঙ্ক শাস্ত্র ছাড়া অচল; তাই ব্যবহারিক বিজ্ঞান সর্বদা বহু বচনে 'উলুম' নামেই পরিচিত। পাশ্চাত্যে পণ্ডিতগণ ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আঁচ করতে সক্ষম হয় খ্রিষ্টিয় দশম শতকের প্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক-বিজ্ঞানী আবু নসর আল-ফারাবীর (৮৭০-৯৬০ খ্রি.) রচিত গ্রন্থ "আল-ইহসা-উল-উলুম" (ব্যবহারিক বিজ্ঞানাদির তালিকা) এর ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে। এ গ্রন্থটি ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের অধিবাসী ডমিনিকান গুন্ডাসালভি ও ক্রিমুনার জেরার্ড কর্তৃক ল্যাটিন ভাষায়: "De

CamScanner

Scientiis" শিরোনামে অনূদিত হয় (দেখুনঃ Ralph Lenner and Muhsin Mahdi ed. *Medieval Political Thought: A source book,* Canada, 1963 p. 22)। তাঁরা আরবি 'উলুম' এর অনুবাদ করেন 'scientiis' বহুবচনে, যা ইংরেজি ভাষ্যে "sciences" হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইংরেজি "sciences" শব্দের তখনও (খ্রিষ্টিয় বারো শতকে) উদ্ভব হয়নি। ইংরেজি ধর্মযাজকরা তখনও 'sign of God' হিসাবে এর ব্যবহার আরম্ভ করেনি। তাঁরা এর ব্যবহার করেন, সর্বদা একবচনে, সর্ব প্রথম ১৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে (Oxford Dictionary op. cit. দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে ল্যাটিন ডিকশনারীতে 'scientiis' শব্দ বিদ্যমান নেই। Charlton: Latin Dictionary, Oxford, N.Y. 1879, p. 1642-43 তে, বিজ্ঞানকে বলা হয় 'scientia' এবং এর মৌল হিসেবে 'scien+entis' নির্দেশ করা হয়, যা আমরা উপরে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি যে, 'scientia' এর সাথে 'ae' যোগ করে এটাকে বহুবচনে 'scientiae' করা হয়- আরবি উলুম, তথা বিজ্ঞানের অনুবাদ হিসেবে। অতএব, এটা নিশ্চিত যে, ইংরেজি 'scientiae' এবং 'science' ল্যাটিন একই মূল বা root থেকে উদ্ভূত হয়নি।

আবার science এর প্রান্তিক 'ce', sciens+entis এর প্রান্তিক 's' এর সাথে গড়মিল দেখা যায়।

তবে ভাগ্যচক্রে, 'scientiae' ও 'scientia' পারিভাষিক আলোচনা আমাদেরকে ইউরোপের মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ট বিজ্ঞ পণ্ডিত Roger Bacon (1214-1292 A.D.)-এর মূখামুখি নিয়ে আসে, যিনি 'Opus Majus' শিরোনামের একটি বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি ইউরোপের ধর্মীয় অঙ্গনে theological education-এর ধারনা ও পদ্ধতি, mode and methodology-র চত্তরে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পূর্ণ মাত্রা শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ, grounding,-এর ব্যবস্থা করে, আমূল পরিবর্তন, drastic change, এর জন্য সুপারিশ করেন। তাঁর এই বৃহৎ গ্রন্থে, তিনি 'এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্টিয়ে'-এর উপর একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেন, যা ছিল আরবীয় ধাঁচে লিখা এবং এর নাম করণ করেনঃ 'scientiae

CS CamScanner

experimentalis' যা ছিল 'ulum at-tajribiyah', এর হুবহু অনুবাদ (Ref. Poul Eduards ed. *The Encyclopedia of Plilosophy*, 1967, Vol. 1-2, pp. 240-242)।

উল্লেখ্য যে, রজার ব্যাকন ছিলেন জাতিতে একজন ইংরেজ। তাঁর Opus Majus সম্বন্ধে পরবর্তী বিজ্ঞপণ্ডিতরা বলেন: এটা ছিল "an astonishing, all comprehensive Encyclopedia, একটি চমকপ্রদ বিষদ পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ, যাতে তার সময়কার জানা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, Natural Sciences, এর প্রসঙ্গ বিদ্যমান ছিল"। এ গ্রন্থটি পোপ ক্লিমেন্ট-এর সমীপে খ্রিষ্টিয় ১২৬৭ সালে পেশ করা হয় (ibid)।

উপরিউক্ত বিশ্বকোষ এর জ্ঞানগর্ভ বর্ণনায়ঃ ব্যাকনের সুনাম, বিশেষতঃ তার লেখনীর নাতিদীর্ঘ একাংশ 'এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্সের' রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল (ibid). আরো উল্লেখযোগ্য যে, পরবর্তী কালের বিজ্ঞ পণ্ডিত Francis Bacon তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন, এবং রজার ব্যাকনের লিখা থেকে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। অন্যান্য উৎসসমূহের সূত্রে জানা যায় যে, রজার ব্যাকনের ধর্মীয় শিক্ষার সংস্কার আন্দোলন ভীষণ বাধার সম্মুখিন হয়, যেহেতু উগ্র খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা তাঁর মধ্যে ইসলামের পক্ষপাতিত্ব আঁচ করেন এবং ধর্মীয় বিদ্রোহীতা heresy'র অভিযোগ উত্থাপন করেন ও তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে তাঁর রচিত Opus Majus এর বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকরা রুখে দাঁড়ান এবং পোপের সান্নিধ্যে ধর্ম বিদ্রোহীতার বিচার করে, তাঁকে ১৪ বছরের জেল দেয়া হয় (Ref. Oxford English Dictionary, Vol. 19, p. 221, World University Excyclopedia Vol. 2. pp. 528-29)।

মুসলমানদের নিকট থেকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান আহরণ করার ক্ষেত্রে রজার ব্যাকনের পূর্ববর্তী অন্য একজন প্রবক্তা ছিলেন মহাপণ্ডিত Robert Grosseteste (১১৮৮-১২৩৩ খ্রি.) যিনি First Lecturer ছিলেন Oxford University-র এবং Franciscan Bishop of the Diocene of England ছিলেন। তিনি তার যুগের সর্বোচ্য শিক্ষাবিদের স্থান অধিকার করে Oxford

University-র Chancellor নিযুক্ত হন। উপরে উক্ত The Encyclopedia of Philosophy (Vol. 3-4, p. 391) তাঁকে English scientific tradition এর জনক বা progenitor আখ্যায় ভূষিত করে বর্ণনা করে যে, তিনি মুসলিম জ্ঞান চর্চার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, বিশেষতঃ ইবনে সিনার দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি শিক্ষক হিসেবে এবং আরবি ভাষা থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি মুসলমানদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও দার্শনিক বিষয়াদির ইউরোপের জ্ঞানীয় ক্ষেত্রে পাচার (transmission) করার কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন (ibid)।

তবে যথাযথভাবে বিবেচনা করলে, রজার ব্যাকনকেই ইউরোপে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আসল উদ্যোক্তা ও পাশ্চাত্যে আধুনিকতার সত্যিকার জনক হিসাবে গ্রহণ করতে হয়, তিনটি কারণে: (ক) প্রথমত, তাঁর আরবি ভাষা থেকে 'উলুম আত-তাজরিবিয়ার' হুবহু অনুবাদ ল্যাটিন ভাষায় 'scientiae experimentalis' করে পাশ্চাত্যের স্বাধীনচেতা পণ্ডিতদের মনে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি উদগ্র আগ্রহ সৃষ্টি করায় এবং দ্বিতীয়ত, তৎকালে প্রচলিত ইউরোজীয় জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গ্রিক যুক্তি তত্ত্ব ভিত্তিক inferential পন্থায় চর্চিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুসলমানদের scientiae experimentalis, তথা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নত পদ্ধতির দ্বারা রদবদল করার সুপারিশের কারণে, আর তৃতীয়ত, আরবি সংখ্যাতত্ত্ব, Arabic numeral ও মুসলমানদের অঙ্ক বিদ্যা mathematics-কে ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি রূপে গ্রহণ করার জন্য তাঁর জোরালো সুপারিশ। প্রসিদ্ধ *A History of Plilosophy*-র প্রণেতা Frank Thilly বলেন: রজার ব্যাকন ছিলেন 'a curious mixture of medieval and modern scholar' অর্থ্যাৎ এক মধ্যযুগীয় ও আধুনিকতার কৌতুহল সংমিশ্রন সম্মত পণ্ডিত। Frank Thilly তাঁকে খ্রিষ্টিয় ১৩ শতকের আদলে ইউরোপে যারা অঙ্ক ও পদার্থ বিজ্ঞানবিদ, mathemathics and physical science চর্চায় ব্যাপৃত ছিল তাদের মধ্যে সর্বাদিক মৌলিক ও স্বাধীনচেতা রূপে মূল্যায়ন করেন (ibid p.185)।

CamScanner

ইউরোপে মধ্যযুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে Robert Grosseteste ধ্রুব তারার মত দীপ্তিমান ছিলেন। তবুও Roger Bacon উদীয়মান সূর্যের ন্যায় এক্ষেত্রে দীপ্তিমানতায় তাঁকে অতিক্রম করেন, যাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ পরিকল্পনা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্মত নির্দেশনা এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যকার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করার চক্করে, যথা inferential বনাম experimental জ্ঞানের পার্থক্য যথাযথভাবে বুঝে নেয়ার চক্করে, তাঁকে মধ্যযুগীয়, এমনকি আবু সিনার পরবর্তী যুগের মুসলমানদের জ্ঞানচর্চার ও খ্রিষ্টানদের জ্ঞানচর্চার তুলনায় অধিকতর অগ্রবর্তী গবেষক রূপে চিহ্নিত করা যায়।

রজার ব্যাকনের 'scientiae experimentalis' সাইন্টে এক্সপেরিমেন্টালিস, পরিভাষা উদ্ভাবন, যার অর্থ হল ব্যবহারিক তাজরিবী বিজ্ঞানাদি, আরবি ভাষার 'উলুম আত-তাজরিবিয়া' এর অনুবাদ স্বরূপ এবং এটাকে প্রকৃত বিজ্ঞানচর্চার আধার হিসেবে চিহ্নিত করেন, objective verified knowledge, 'বস্তুগত পরীক্ষিত জ্ঞান'-এর বস্তুগত ধারণার জ্ঞানের উদ্ভব হয়, যা বাস্তব, বৈজ্ঞানিক ও objective এবং এটাকে গ্রিক দর্শন ভাবাপন্ন এ্যারিস্টটলীয় যুক্তি বিদ্যা, Aristotelian logic সম্মত subjective, মানুষের কল্পনা প্রসূত, কাল্পনিক theoretical, সূত্রায়িত জ্ঞান, তথা inferential knowledge-এর মুখামুখী দাঁড় করায়। এটা ছিল একটি radical, বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, যা বুঝে হোক বা না বুঝে হোক, পশ্চাত্যের চক্করে spirit of scientific modernism, বৈজ্ঞানিক আধুনিকতার ভাবধারার জন্ম দেয়। রজার ব্যাকনের সারগর্ভ জ্ঞানের পরিসরকে দ্বিখন্ডিত করে, একদিকে কাল্পনিক জ্ঞানতত্ত্ব, তথা subjective inferential knowledge-কে অন্যদিকের experimental এর, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের objective scientiae, scientiaefic knowledge, তথা বস্তুগত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পারস্পরিক মুখামুখি দাঁড় করানোর ব্যাপারটি অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। এর দ্বারা তিনি এমনকি মুসলিম বিজ্ঞানীদেরকেও কিছুটা ছাড়িয়ে গেছেন।

CamScanner

আমার ধারনায় রজার ব্যাকনের দ্বারা inferential vs experimental, যুক্তিতাত্ত্বিক বনাম তাজরিবী (ব্যবহারিক) জ্ঞানের মুখামুখি দ্বিখন্ডিত করণ এর ব্যাপারটি মধ্যযুগে আধুনিকতার উদ্ভবের জন্য, বিশ শতকের এটম, পরমাণুর খণ্ডিত করণের মাধ্যমে nuclear, পরমানবিক যুগের উদ্ভবের মতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এমনকি সম্ভাবনার দিক দিয়ে তা অধিকতর গুরত্ব বহন করে।

নিঃসন্দেহে, মৌলবাদী গোঁড়া ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের দ্বারা আরোপিত ধর্মদ্রোহিতার অপবাদের শিকার হয়ে, বিতাড়িত, এমনকি আমরণ বন্দীত্বের নির্যাতনে নিষ্পেশিত হয়েও, তিনি তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলকে জলাঞ্জলি দেননি, অনুশোচনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করেননি, যার ফলে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান মনষ্ক পণ্ডিতবর্গ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘাড়ে নিয়ে, ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে, সুদীর্ঘ ছয়-সাত শত বছর ধর্মযাজকদের হাতে গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞান গবেষকরা হত্যা, বন্দিত্ব, হেয়জ্ঞান ও অজস্র নির্যাতনের শিকার হয়েও, 'natural philosophy'-র মেকী নামকরণ করে বিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে যান এবং খ্রিষ্টিয় উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যপ্ত, অসম সাহাসে ভর করে, তথাকথিত 'natural philosophy' কে 'experimental science' তথা ব্যবহারিক বিজ্ঞান নামে অভিহিত করার প্রয়াস পায়। তবুও তারা এটাকে 'experimental scientiae' নামকরণ করতে ভীত শঙ্কিত হয়ে ইংলিশ ধর্মযাজকীয় কথ্যভাষার sign of God অর্থে ব্যাবহৃত, উচ্চারনে সাদৃশ্য, 'science' শব্দটি বেছে নেয় এবং এটাকে 'experimental science' নামে অভিহিত করে বিজ্ঞান গবেষণা চর্চায় এগিয়ে যায়।

আরো মজার ব্যাপার হলঃ ইত্যবসরে বারো থেকে উনিশ শতকের মধ্যবর্তী ছয়-সাত শত বছর ধরে, বিজ্ঞানচর্চাবিদরা রজার ব্যাকনের 'scientiae experimentalis' পরিশব্দের মূখ্য উদ্দেশ্য ও প্রকৃত অর্থের স্বরূপ নিয়ে বহুমুখী তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়। কেউ কেউ তাঁকে অপবাদ-মুক্ত করার জন্য বলেঃ তিনি 'expermentalis' শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'experiencial' অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুঝাবার জন্যে। তিনি যখন বলেনঃ

'nothing can be known with certainty without experiment', তিনি বুঝাতে চেয়েছেন without experienece, তথা অভিজ্ঞতা ছাড়া। স্যামুয়েল জেব নামক এক ব্যক্তি, এমনকি তাঁর Opus Majus-এর এক নূতন সংস্করণ "Pus Majus" নামে ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বের করেন, যাতে 'scientiae experimentalis'-এর পরিচ্ছেদটি বাদ দেয়া হয়, যার দ্বারা তাঁর 'good intention', ভালো উদ্দেশ্য প্রমাণ করার প্রয়াস ছিল। এতদসত্ত্বেও সে যুগের ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুশ যুদ্ধ (জিহাদ অর্থে Crusading যুদ্ধ ভাবাপন্ন) কালিন সময়ে ব্যবহারিক বিজ্ঞান এর মুসলিম জ্ঞান চর্চার ঘনিষ্টতা সম্পর্কের কারণে, খ্রিষ্টান পণ্ডিতগণ একে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিলেন না, এই ভয়ে যে, পাছে তাঁরা ইসলামি infidelity, বিশ্বাসহীনতার দ্বারা কলুসিত হয়ে পড়েন (Ref. Paul Edwards ed: *The Eneydopedia of Philosophy*, 1976, vol. 1-2 pp, 240-42; Frank Thilly: *A History of Philosophy* pp. 230-38; Joseph Laffan Morse ed.: *Standard Reference Eneyclopedia*, New York, 1959, Vol-3 pp. 896-97)। যাই হোক, খ্রিষ্টান ক্যাথলিক ধর্ম যাজকদের তীব্র বিরোধিতার দরুন রজার ব্যাকন চৌদ্দ বছর কারারুদ্ধ হন।

এতদসত্ত্বেও ইউরোপীয় বিজ্ঞানচর্চাবিদরা তাঁকে অনুসরণ করতে ক্ষান্ত হননি। Nicholus Copernicus (1453-1543), Johans Kepler (1571-1630) Francis Bacon (1511-1626) এবং Galilio Galileio (1564-1642) একের পর এক তাঁকে অনুসরণ করে, এর গবেষণায় লিপ্ত হন, কিন্তু সতর্করূপে বিষয়বস্তুর নামটি পাল্টিয়ে তারা এটাকে 'প্রাকৃতিক দর্শন' নামকরণ করে। এ ধারা খ্রিষ্টিয় উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলে। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের প্রতি তথায় সন্দেহের চোখে দেখা হত এবং তাদের জীবন ও সম্মানের তেমন এতটুকু নিরাপত্তা ছিলনা। সবার জানা আছে যে, বিজ্ঞানী কপার নিকাসকে জীবন্ত আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। যা stake-এ জ্বালানো বলা হয়। অর্থাৎ ফাঁসি কাষ্টের মত দুইটি খুটির উপর ধর্মদ্রোহীতার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লটকিয়ে দিয়ে, তার বইপত্র নিচে স্থাপন

CS CamScanner

করে, কাঠের স্তুপের নীচে আগুন জ্বালিয়ে, পুড়ে মারার বিচার্য শাস্তি প্রদান। অনুরূপভাবে গ্যালিলিওকে ৩৬ বছর অবরুদ্ধ বন্দী রূপে রাখা হয়েছিল। কেননা, এরা মুসলিম বিজ্ঞানীদের প্রতি তাদের সম্প্রীতি গোপন রাখতে পারেননি। অবশেষে ইউরোপের বিজ্ঞানচর্চাবিদ্‌রা scientiae-র বদলে, উপরে যেমন আমরা বলেছি, ইংলিশ ধর্মযাজকদের sign of God অর্থে ব্যবহৃত এবং বর্তমানে প্রচলিত 'science' শব্দটি গ্রহণ করে বিজ্ঞানকে 'experimental science' নামে আখ্যায়িত করে ধর্মযাজকদের রোশ থেকে রেহাই পায়।

CamScanner

দশম অধ্যায়

উপসংহার

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

উপসংহারের প্রারম্ভে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোর রেশ টেনে, বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দকে অবহিত করতে চাই যে, খ্রিষ্টিয় সপ্তম শতকের প্রথম দশকের মাথায় ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াব্যাপী মানব সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে আদেশ-নির্দেশ ও কথা-বার্তাকে সহজবোধ্য করার লক্ষে ব্যাখ্যা পদ্ধতির প্রসার ছিল। তা আমরা তৎকালীন প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলোর চত্তরে দেখতে পাই, যেমন- ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণদের ধর্মগ্রন্থ বেদ গ্রন্থের 'ব্যাখ্যাশাস্ত্র', ইহুদিদের র্ধমগ্রন্থ বাইবেল এর ব্যাখ্যা শাস্ত্র Exegesis। তৎকালে অধুনা প্রচলিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল না। ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমানরা, তাদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের বাণীসমূহের অর্থ ও উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বিশ্লেষণ, analysis, তাফসির পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রচলন করে। এর বিশেষ কারণ ছিল, ইসলাম ধর্মের প্রচারক, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ, আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সা. একটি হাদিস, বাণী, Message-এ বলেছেন: "যে কেউ নিজের মতামত, Opinion দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করে সে যেন (পরকালে) তার ঠিকানা দোজখ, নরক, hell- এর মধ্যে খুঁজে নেয়"।

আদতে আল কুরআন হল বিশুদ্ধ আল্লাহর বাণী, ওয়াহী, প্রত্যাদেশ, revelation; এতে আল্লাহ বলেন, তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষকে সততা, সত্য, তথ্য, তত্ত্ব ইত্যাদি সহজ সরলভাবে বুঝাতে বাণী প্রদান করেছেন। তা আরো সহজতর করে, ব্যাখ্যার মাধ্যমে অধিকতর বোধগম্য করে বলবে কার সাধ্য? তাই আল কুরআনের 'ব্যাখ্যা' করা নিষিদ্ধ।

প্রণিধান যোগ্য যে, আল্লাহর ওয়াহী, প্রত্যাদেশ, revelation দুই প্রকার; (এক) ওয়াহী মাতলু, আবৃত্ত প্রত্যাদেশ, recited revelation এবং (দ্বিতীয়) ওয়াহী গাইর মাতলু, অনাবৃত্ত, unrecited revelation. রসুল সা.-

CamScanner

এর রিসালাত, নবুয়াত, prophethood প্রাপ্তির পর থেকে, তাঁকে মহান আল্লাহ এ উভয় প্রকার ওয়াহী প্রদান করেছেন; প্রথম প্রকার বাণী, আবৃত্তি, ক্বিরাতের, recitation-এর মাধ্যমে, কুরআন; যাতে আল্লাহ নিজেই বলেন; আর দ্বিতীয় প্রকার বাণী নীরবে, নিস্তব্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল সা.-এর অন্তরে ইল্‌কা, নিক্ষেপ করে প্রদান করেন, যা থেকে উত্থিত হয়েছে রসুল সা.-এর বাণী, হাদিস, prophetic saying, prophetic tradition। তাই একমাত্র রসুলই প্রয়োজনে হাদিসের মাধ্যমে কুরআনের 'ব্যাখ্যা' করতে পারেন। সাধারণ লোকের জন্য আরো বোধগম্য করার প্রয়োজনে বিজ্ঞ জ্ঞানীরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে 'বিশ্লেষণ' করতে পারেন, যাকে বলা হয় 'তাফসির'। 'তাফসির' শব্দটি আল কুরআন থেকে নেয়া সুরা ফূরকান ২৫, আয়াত ৩৩-এ মহান আল্লাহ বলেন: "(হে রসুল) আপনার নিকট তারা (অবিশ্বাসীরা) যখনি কোন দৃষ্টান্ত, (মেছাল) নিয়ে আসে, তখনি আমি আপনার নিকট সত্য ও সুন্দরতম তাফসির নিয়ে উপস্থিত হই"। তাফসির হল বিশ্লেষণ।

'তাফসির' শব্দটি 'ফাস্‌সারা', 'ইউফাস্‌সেরু' থেকে উদ্ভুত; কোন বস্তুকে আলোকোজ্জ্বল করার অর্থবহ, যেমন আজকের আধুনিক যুগে এক্সরে'র ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছবিকে ইলেক্ট্রিক প্লেইটে বৃহদায়ন ও আলোকিত আকারে দেখা যায়। তাই কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করে তাৎপর্যমূলক অর্থ উদঘাটন করাকে তাফসির বলা হয়। আরবি ভাষায় ব্যাখ্যার প্রচলন সর্বত্র। ব্যাখ্যাকে 'শরাহ' বলা হয় এবং আরবি সমস্ত বিষয় আষায় এর 'শরাহ' হয়, ব্যাখ্যা, Explanation হয়, একমাত্র কুরআনের তাফসির, বিশ্লেষণ, analysis হয়, ব্যাখ্যা হয় না। এমনকি হাদিস'রও 'শরাহ' হয়, তাফসির হয় না। সার কথা, তূলনামূলে ব্যাখ্যা হয় এবং অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিপাতে বিশ্লেষণ হয়। আরো অন্যভাবে বলতে গেলে, ব্যাখ্যার আধার হল মস্তিস্ক, চিন্তাধাঁন্ধা, আর বিশ্লেষণের আধার হল, অন্তর, হৃদয়, আত্মা। ব্যাখ্যা, চিন্তায় বোধগম্য হয়; আর বিশ্লেষণ, হৃদয়ঙ্গমে উপলব্ধি হয়, যাকে ইংরেজিতে understanding বলা হয়, যা নেহাত নিম্ন মানের শব্দ।

CamScanner

মুসলমানরা তাফসির-এর পাশ ধরে বিশ্লেষণ পদ্ধতি বের করে, যা আধুনিক পাশ্চাত্যে analysis, analytical methodology, রূপে গ্রহণ করা হয়। এ জ্ঞানীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে মুসলমানরা 'তাজরিবী' বিজ্ঞান, experimental science, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করে।

অত্র উপসংহার অধ্যায়ের মূল কথায় আসতে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলোর আলোকে আমাদের বিশেষ ভাবধারাটি এই মর্মে উপস্থাপন করতে চাই যে, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে, বিশ্বজোড়া বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে, কথা-বার্তা, ভাব ধারণার অস্পষ্ট ও অবোধগম্যতা দূর করার জন্য এবং অর্থ সম্প্রসারণের জন্য সর্বত্র ব্যাখ্যা, explanation পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কোথায়ও বিশ্লেষণ, analytical, পদ্ধতির ব্যবহার ছিল না। আল কুরআনই সর্বপ্রথম 'তাফসির' নামের এ বিশ্লেষণ পদ্ধতি নিয়ে মহান আল্লাহর সন্নিধ্য থেকে, আল্লাহর রসুল হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতীর্ণ হয়। 'তাফসির' শব্দটি আমরা উপরে যেভাবে দেখছি তাতে একটি চারপ্রস্ত আঙ্কিক পদ্ধতি সুচিত হয়, যথা-

১	২	৩	৪
রিওয়ায়াত তথ্য সংগ্রহ Callection of data	দিরায়াত বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রায়ন Interlectus formulaton	তাজরিবা /এক্সপেরিমেন্ট তাজরিবিয়া / এক্সপেরিমেন্টকরণ Experimentation	তা'দীল ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত justifiable synthesis

চার প্রস্তী আংকিকসূত্র

মুসলিম বিজ্ঞানীরা এই নবনূতন চতুর্প্রস্তী জ্ঞানান্বেষীয় পদ্ধতি আঙ্কিক সূত্রে বের করে, 'তাজরিবা'-কে তৃতীয় প্রস্তে স্থাপিত করে এবং তাজরিবার পরীক্ষণ নিরীক্ষণের মাধ্যমে এ চুতর্প্রস্তী পদ্ধতির তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎপাদন করেন, উন্মেষ সাধন করেন। বলা বাহুল্য, ইসলামপূর্ব যুগের জ্ঞান চর্চার ব্যাখ্যাজনিত পদ্ধতিকে পেছনে ফেলে, ইসলাম ধর্ম বিশ্লেষণমূখী পদ্ধতি নিয়ে মানব সমাজে অবতীর্ণ হয়। অতএব, বিশ্লেষণ পদ্ধতি হল মানুষের সম্মুখে নবনূতন সাজে উপস্থাপিত বাস্তবমুখী ভাবধারা,

CS CamScanner

আদর্শ, সত্য, যা সহজ বোধ্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যা হাতেনাতে ধরা যায়। এক কথায়, ইসলামপূর্ব জ্ঞান চর্চা ছিল: অনুভূতি ও যুক্তিবিদ্যক, যা theoretical, conceptual, inferential পুষ্ট; পক্ষান্তরে ইসলাম এক নবনূতন ধরণের বিশ্লেষণভিত্তিক ফলিত বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানীয় পদ্ধতির অবতারণা করে, যা experimental (science), scientiae, তাজরিবী বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের জন্ম দেয়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের (৬১০-৭১৫ খ্রিষ্টাব্দের) শত বছরের সামাজিক বিপ্লব, যা রাজনৈতিক বিজয় অভিযানের চত্বরে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে পরিচালিত হয়। এর শেষ প্রান্তে আরব, ইরানীয় ও তুর্কি মুসলিম বিদ্যৎসাহী গবেষকরা শিক্ষা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সত্য অনুসন্ধানে দিগ্‌বিদিগ্ ছুটে চলে, যেখানেই যে কোন জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানেই তারা তড়িৎগতিতে উপস্থিত হয়। তারা পর্যায়ক্রমে ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে সদ্য বিজিত সিন্ধু দেশ তোলপাড় করে। সিরিয়া এবং আলেক্সজান্দ্রিয়া বিজয়ের মাধ্যমে গ্রীক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান ভান্ডার হস্তগত করার জন্য কনষ্টানটিনেপলের বাইজানটাইন রোমান সম্রাটদের সাথে সন্ধি করার চত্বরে ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের দ্বারা ধর্মদ্রোহী বিবেচিত নিষিদ্ধ বইপত্র তাদের নিকট হস্তান্তেরের শর্ত আরোপ করে। ইরান বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্ব বিখ্যাত জুন্দেশাহপুরের শিক্ষা কেন্দ্র তাদের হস্তগত হয়, যাতে গ্রীক, নেস্টোরিয়ান, নিউপ্লেটোনিক এবং ইরানী শিক্ষার চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছিল এবং সর্বশেষ তুর্কিস্থান বিজয়ের মাধ্যমে চীন নিয়ন্ত্রিত মা-ওয়ারাউন-নাহার বা ট্রান্সওক্সিয়ানা তাদের হস্তগত হয়,যাতে কাগজ তৈরী ও চিনি প্রস্ততকরণের চীন দেশীয় প্রযুক্তি তাদের হাতে আসে। অন্য দিকে, তাদের জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা বর্হিবিশ্বের সাথে যথা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও চীন দেশের কেন্টন ইত্যাদির অধিবাসীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সর্ম্পক প্রতিষ্ঠা করে। তৎকালীন মুসলমানেরা

জ্ঞান-চর্চার বিশ্ব কেন্দ্রগুলির বিজয়, দেশ দেশান্তর বিজয়ের এবং বিজাতীয় ধন-সম্পদ বিজয়ের চেয়েও বেশি মূল্যবান বিবেচনা করত।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, খলীফা আল-মানুনের পিতামহ খলীফা আল-মনসুর বাগদাদের বিশ্বপ্রসিদ্ধ অনুবাদকেন্দ্র 'বায়তুল হিকমা' প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞানচর্চায় আকস্মিকভাবে তিনি গ্রীকপ্রেমী ছিলেন। তিনি গ্রীক পুস্তকাদির আরবি অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। খলীফা মামুনের পিতা খলীফা হারুনুর রশীদ ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁকপ্রবন ছিলেন এবং সংস্কৃত পুস্তকাদির আরবি অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বলা হয়, তিনি নিজেও সংস্কৃত ভাষা শিখতে আরম্ভ করছিলেন।

চতুর্প্রস্তী উচ্চ শিক্ষার ধারা

মুসলিম জ্ঞান অন্বেষণকারীরা আকাশ পাতাল তোলপাড় করে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সূত্র থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্রময় বিষয়বস্তু আহরণ করে বায়তুল হিকমায় একত্রীভূত করে এবং এগুলিকে পদ্ধতিগতভাবে একইসূত্রে গ্রথিত করে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি নবতর বিশ্বজনীন জ্ঞানচর্চার ধারার সূচনা করে। উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তারা জ্ঞানচর্চাকে চতুর্প্রস্তে বিভক্ত করে, যাতে তাদের সুবিন্যস্ত শিক্ষা ক্রমের আওতায় শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা যায়। এগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

ক. ইবতিদায়ি'য়াহ

খ. আওয়ালিয়্যাত

গ. নযরিয়্যাত ও দ্বীনিয়্যাত

ঘ. তাজরিবিয়্যাত

শিক্ষাক্রমের এই পর্যায়ক্রমিক বিভক্তি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাক্রমের সাথে কাছাকাছি তুলনীয়। আদতে এই পাশ্চাত্য শিক্ষাক্রম বাগদাদ ও স্পেনের মুসলিম আমলে আরবিয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে উদ্ভব হয়েছে। উক্ত পরিভাষা গুলো নিম্নরূপে ইংরেজীতে অনুবাদ করা যায়ঃ-

a. Elementary
b. Secondery
c. Philosophical *cum* religious
d. Experimental

ক. ইবতিদায়িয়াহ, যাতে Elementary পর্যায়ে, পড়া, লেখা ও গণনার প্রাথমিক বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া হত।

খ. আওয়ালিয়্যাত/Secondary পর্যায়ে, শুদ্ধভাবে পড়া, শুদ্ধভাবে লেখা ও শুদ্ধভাবে চিন্তা করা শিক্ষা দেয়া হত।

গ. তৃতীয় ধাপে, নযরিয়াত দার্শনিক বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া হত যেগুলিকে বলা হয় 'আকলী আল মহয' purely intellectual, নিখাদ বুদ্ধিবৃত্তিক)। এতদসংগে শিক্ষা দেয়া হত নকলি আল মহয (purely religious, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম)। নিখাদ বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষাক্রম (আকলী আল মহয) শুরু হত গ্রীক/ইউনানী যুক্তিবিদ্যা থেকে এবং তাতে সম্বলিত হত অংক, জ্যামিতি, অ্যালজেবরা, এ্যাস্ট্রোনমী, আকাশবিদ্যা/জ্যোতিষশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি, যথা পরিবেশ বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং গ্রীক, ভারতীয় ও ইরানীয় পদার্থ-অতীত দর্শনাদি। ধর্মীয় শিক্ষাক্রমে, হাদীদ শাস্ত্র, উলুম আল-হাদিস, তাফসির আল কুরআন, ইসলামি ফিকাহশাস্ত্র/আইনশাস্ত্র, ইসলামি ধর্ম দর্শন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শনাদি অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ঘ. চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ে উলুম-আত-তাজরিবিয়াহ/experimental sciences (scientiae experimentalis) শিক্ষা দেয়া হত, যাতে অংকশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান/কিমিয়া, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, রাজনীতিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র, সূফীতত্ত্ব/ইল্‌মে তাছাউফ ইত্যাদি।

মুসলিম জ্ঞান অন্বেষণকারীরা সংজ্ঞায়নের বিজ্ঞান শিক্ষক্রমের চতুর্প্রস্থী বিভাজনের তৃতীয় প্রস্তকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিজ্ঞানদি রূপে শ্রেণি বিভক্ত করে

CamScanner

এ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার আরোহ ও অবরোহ যুক্তিপ্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করেন। এখানে মুসলিম জ্ঞান অন্বেষণকারীরা এ্যারিস্টটলীয় সংজ্ঞায়ন বিজ্ঞানের প্রচলন করেন, যাকে তাঁরা ইলমুত-তারীফরূপে (science of definition) আখ্যায়িত করেন। এই সংজ্ঞায়ন/definition তারীফ এর প্রক্রিয়াকে এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সরল মাহিয়া চতুর প্রশ্ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেন। তবে মুসলিম জ্ঞান অন্বেষনকারীরা এহেন সরল চার প্রশ্ন' মালার প্রশ্নকে 'আল উলুম আত-তাজরিবিয়া, তথা experimental scientiae/sciences এর সাথে যুক্ত করে নতুন সূত্রে 'মা-দেরাইয়া'/ কিসের কি/what of what, মুসলিম গবেষকরা তাদের উদ্ভাবিত নব নতুন বৈজ্ঞানিক চার মাত্রিক জটিল প্রশ্ন মালার সাথে যুক্ত করেন।

সরল কথায় এ্যারিস্টটলের দর্শন ভিত্তিক inferential knowledge এর সরল প্রশ্নমালা-what, why, how, what for(?), কি, কেন ,কিভাবে এবং কিসের জন্যে(?)-কে সম্পূর্ণরূপে নাকচ না করে, বরং প্রথম দু'টি প্রশ্নকে, যথাক্রমে what of what এবং what makes you undesrstand what of what? – এ রূপান্তরিত করে, তৃতীয় স্তরীয় প্রশ্ন 'কিভাবে'(?) প্রশ্নটিকে বৈজ্ঞানিক সূত্রে রূপান্তরিত experiment-এ প্রতিস্থাপন করে নব উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক ধারণা 'তা'দিল', সমন্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে, বিজ্ঞান গবেষণার স্তরে সংজ্ঞায়নের প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেন, যা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ভাবধারা, যথা 'বিজ্ঞানের কোন সংজ্ঞায়ন হতে পারেন', ধারণার সাথে সংঘর্ষিত। এককথায়, এ্যারিস্টটলীয় inferencial knowledge এর পরিপ্রেক্ষিতে সরল সংজ্ঞায়নের সাদৃশ্য মুসলিম বৈজ্ঞানিক গবেষকরা, জটিল বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায়ন/scientific definifion এর প্রবর্তন করেন। অতএব, মুসলিম বিজ্ঞান গবেষকদের 'চার মাত্রিক জটিল প্রশ্ন পবিত্র কোরআনের 'মা'দিরইয়া', what of what/কিসের কি, প্রশ্নের সম্প্রসারিত রূপ পরিগ্রহণ করে, এহেন নব উদ্ভাবিত 'তজরিবী বিজ্ঞান' পবিত্র কোরআনের ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

CS CamScanner

স্মর্তব্য যে, এ্যারিস্টটল সরল what, why, how এবং what for প্রশ্নমালা উত্থাপন করে, তা থেকে 'চার প্রকার কারণ'-এর বন্ধনের আওতায় মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুনিচয়ের ব্যাখ্যা করেন। তাঁর এই চার প্রকার কারণ হল material cause, formal cause, efficient cause এবং final cause/ বস্তুগত কারণ, গঠনগত কারণ, চালিকাশক্তিগত কারণ এবং চূড়ান্ত কারণ। অতঃপর এই অনুক্রমিক প্রশ্ন চতুর্থয়ের প্রেক্ষিতে তিনি একদিকে বিচক্ষণতার সাথে 'syllogistic methodology of definition of things' 'বস্তু নিচয়ের সংজ্ঞায়নের যুক্তিতাত্ত্বিক পদ্ধতি' উদ্ভাবন করেন এবং অন্যদিকে কারণ চতুর্থয়ের ভিত্তিতে তিনি মহাবিশ্বের সমগ্র কার্যক্রম ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এটিই হল গ্রীক দার্শনিকদের সরলীকৃত বিশ্বদর্শনের আদ্যান্ত। তারা conceptnal knowledge, ধারণামূলক জ্ঞানকে যাকে তারা গ্রীক দর্শন ও পদার্থিক জ্ঞান হিসেবে আখ্যা দেন। Classical Age, তথা আদিকালে একেই সর্বোপরি বিশ্বতাত্ত্বিক জ্ঞানরূপে অভিহিত করা হত।

এই সরল প্রশ্ন চুতর্থয়ে যা মানুষের জীবনধারার জটিল বাস্তবতার দিক, objective problems কে সম্বলিত করতে পারে না, এর বিপরীতে মুসলিম জ্ঞান গবেষকরা what of what / 'মা' দেরাইয়াহ', 'কিসের কি' চারমাত্রিক জটিল প্রশ্নমালার উদ্ভাবন করেন, যেগুলি নিম্মরূপ:

hal, ma, lima এবং aiyu. 'Hal' এমন একটি আরবি পরিভাষা যেটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করে, যার অর্থ প্রকাশে বলা যায় 'whether or not? (অর্থাৎ এরূপ হবে কি হবে না? ইহা একই সাথে ডাবল উত্তর তালাশ করে, যেমন- hal Allahu khaliq ul-alami? (হাল আল্লাহু-খালেকুল আলামে)/Is Allah the Creator of the universe/ আল্লাহ কি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা?, Is the 'A' challenger of 'B',/ 'ক' কি 'খ' এর প্রতিদ্বন্দ্বী? Are all the Presidents holders of the powers of the State?/ সকল প্রেসিডেন্ট কি রাষ্ট্রের ক্ষমতাধারী?

'Ma' ও 'hal' জটিল প্রশ্ন উত্থাপনকারী আরবি পরিভাষা। যেটি যাহা কি, যাহা কিছু, যে রকমই হোকনা কেন, কোথেকে ইত্যাদি অর্থবোধক। It

CamScanner

means which, what, that which, whatsoever, why, wherefore। এই শব্দটি 'মা-দেরাইয়ার' আওতায় এসে 'হাল' এর অনুক্রমে কিসের কি অর্থের উপরে দাঁড়ায়। অর্থাৎ কিনা: তোমাকে কিসে বুঝাল যে, সেটা কি? what makes you undertand what is it? উদাহরণ স্বরূপ উপরে উল্লেখিত আল্লাহ সম্পর্কীয় প্রথম ডাবল প্রশ্নের সূত্র ধরে আরো প্রশ্ন করা যায়। কিসে তোমাকে বুঝাল যে আল্লাহ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা? What makes you undersdend that Allah is the Creator of the universe? কিসে তোমাকে বুঝাল যে 'ক' 'খ' এর প্রতিদ্বন্দ্বী/ (what makes you undesstand that 'A' is the challenger of 'B'. 'lima' অর্থে ফিসের জন্য? উপরোক্ত অনুক্রমের প্রেক্ষিতে ইহার অর্থ হয়: *'লিমা-যা'*/ lima dha' অর্থাৎ কি কারণের জন্য? মানে কি কারণে ইহা এরূপ হল? For what reason? why? for what it is so?.

অতঃপর, তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তরে বলা যায়; বিশ্ব জগতের যদি একাধিক স্রষ্টা, প্রতিপালক, নিয়ন্তা, প্রভু (Rabb) থাকতেন তাঁদের ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিশ্ব প্রকৃতির সমরূপতা সম্মত ঐক্য, uniformity of Nature, ধ্বংস হয়ে যেতো, এবং সৃষ্ট জগতের বস্তুসমূহের সমরূপতা সম্মত কার্যক্রম বিনষ্ট হয়ে যেতো। অতএব, নিশ্চিতরূপে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দাঁড়ায়: বিশ্বজগতের রব্ব (Rabb) স্রষ্টা, প্রতিপালক, নিয়ন্তা, প্রভু হলেন এক এবং একক আল্লাহ।

সহজবোধ্য করে বলা যায়: উপরোক্ত প্রশ্ন চুতুর্থয়ের উত্তর বিশ্লেষণ করে বলা যায়, পদার্থিক বাহির্জগতের প্রত্যেক বস্তুর চারটি মাত্রা আছে, যথা- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ব্যাস ও উচ্চতা। তুলনামূলকভাবে উপরে উল্লেখিত চার প্রশ্নের 'hal' দৈর্ঘ্য 'ma' প্রস্থ, 'lima' ব্যাস এবং 'aiyu' উচ্চতা বুঝায়' আরবি ভাষায় Khaliq/স্রষ্টা, খালিক্ব হলেন দৈর্ঘ্য, Rabb/ প্রতিপালক, রব্ব হলেন প্রস্থ, সমরূপতাসম্মত ঐক্য হল ব্যাস এবং মহাপ্রভু আল্লাহ উচ্চতা, যা সৃষ্টির নিদর্শন স্রষ্টাকে নির্দেশ করে। 'Aiyu' অর্থ whoever, whatsoever, who, which, what? যে কেহ, যা কিছু হোক, যে, যাহা,

CamScanner

কি? উক্ত অনুক্রমে ইহা 'liaiyu shaiyin' এর অর্থবোধক, অর্থ- কিসের জন্য ইহা করা হল? ইহা কিসের কি (for what is done? what it is that?) প্রকৃত পক্ষে এটি পরিসমাপ্তিমূলক প্রশ্ন ও উপসংহার। যথা- অতঃপর তোমার চূড়ান্ত উপসংহার অথবা যুক্তিযুক্ত গন্তব্য বা থিসিস/ *তা'দিল*। Then what comes out of your final conclusion or justified goal or thesis/tadil.

পরিশেষে, প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে যদি বলা হয়: 'হ্যাঁ, আল্লাহ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা'; তবে দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর হবে: 'কেননা বহির্জগতের অগণিত সৃষ্টির নিদর্শন (ফিল আফাক) এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে অন্তস্থিত বিশ্ব জগতের সমরূপতাসম্মত ঐক্যের উপলব্ধি (ফি আনফুসিকুম), বিশ্বজগতের একক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

তারিফ বনাম হদদ

গ্রীকদের প্রাচীন গুণগত inferential definition/ *তারিফ*/সংজ্ঞায়ন এর মুখোমুখি মুসলিম জ্ঞান অন্বেষণকারীরা পরিমাপগত সংজ্ঞায়ন, তথা 'হদ্দ' আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ গ্রীক দার্শনিক সংজ্ঞায়ন, গুণগত তারিফ এবং মুসলিম গবেষকদের আবিষ্কৃত পরিমাণগত সংজ্ঞায়ন হল 'হদ্দ'। এটাকে পরিমাপ বা সীমাগত বা প্রস্থগত সংজ্ঞায়ন বলা হয়। Inferential definition দর্শন যা philosophy-র উপর প্রযোজ্য, অন্যদিকে প্রস্থগত (হদ্দ) সংজ্ঞায়ন 'experimental scientiae' এর উপর প্রযোজ্য; তবে মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞানঅন্বেষণের ক্ষেত্রকে উপরে উল্লেখিত দুই সংজ্ঞায়নের নিরিখে, বিষয় বস্তুকে দ্বিভাগে বিভক্ত করেন নাই বরং তাঁরা inferential definition বা তা'রিফকে বস্তুর গুণগত প্রকৃতি নিরূপণের জন্য প্রয়োগ করেন এবং পর্যায়ক্রমে প্রস্থগত সংজ্ঞায়ন *(হদ্দ)* বা '*তাহদিদ*'কে বস্তুটির বস্তুগত প্রকৃতি নিরূপণের জন্য প্রয়োগ করেন। সুতরাং তাঁদের নিকট উলুম-*আত-তাজরিবিয়াহ* (experimental scientiae) দর্শনের ধারাবাহিকতায় বোধগম্য ছিল; দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে পৃথকীকরণ বা ছেদন ছিল না; কার্যত: তাঁদের যুক্তিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, তা'রিফ/inferential defintion,

CS CamScanner

তাহদিদ /dimensional definition-এর পূর্বসুরী ছিল এবং দর্শন experimental scientiae' এর পূর্বসুরী ছিল। মহান মুসলিম বিজ্ঞানীরা একই সাথে মহান দার্শনিকও ছিলেন, যেমন- সর্বকালের ও সর্বযুগের বিশ্ববরেন্য প্রাজ্ঞ গবেষক আল-কিন্দি, ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদের জীবন সাধনায় আমরা দেখতে পাই।

চার প্রস্থীয় সংজ্ঞায়নের প্রক্রিয়ায়, তথা 'তাহদিদের' চত্বরে, মুসলিম গবেষকদের হাতে, বিশ্ব প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যথা:

ক) Collection of information or data, রেওয়ায়েত, তথ্য সংগ্রহ

খ) Rational verification and classification of data দেরায়েত/ তথ্যের যৌক্তিক যাছাই-বাছাই এবং শ্রেণিবিভক্তকরণ

গ) পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক সমীক্ষা(তাজরেবাহ)/experimental testing

ঘ) যাঁচাইকৃত সূত্র বা থিসিস, তা'দিল/verified formaula or thesis এর উদ্ভব হয়।

আরবি ভাষায় 'হদ্দ' শব্দের অর্থ কোন বস্তুর চতুর-সীমা, নিরূপণ করা; পবিত্র কুআনের পরিভাষায় 'হদ্দ' দ্বারা (বহুবচনে 'হুদূদ'), আইনের সীমা বুঝানো হয়, যা লংঘন করা যাবে না।

দর্শনের পরিভাষায়, 'হদ্দ' মানে সংজ্ঞায়ন। এটা কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাগুণ বুঝায়। বলা হয়ে থাকে, তাহদিদ/definition/সংজ্ঞায়ন সম্পূর্ণরূপে তখনই হয় যখন একটি বস্তুকে তার নিকটতম প্রজাতি থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথকীকরণ করা হয় এবং একইসাথে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাগুণ বর্ণনা করা যায়; যেমন- একজন মানুষের সংজ্ঞায়ন হয় 'হদ্দ' দ্বারা তাকে এমনভাবে বর্ণনা করা যায়, যেমন- মানুষ বিবেকসম্মত প্রাণী।

আরেক প্রকারের 'হদ্দ' হল কোন জিনিসের শেষ সীমা এবং অন্য জিনিসের প্রারম্ভের সীমা নির্দেশ করে। অর্থাৎ কোন জিনিসের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি কে 'হদ্দ' বলে। তদুপরি, বিভিন্ন বিজ্ঞানাদির প্রারম্ভিক বিন্দুকে 'হদ্দ' বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রতিপাদ্যসমূহ 'হদ্দ' রূপে পরিচিত।

CamScanner

ইমাম গাজ্জালি 'হদ্দ'কে তিন পর্যায়ে বিভক্ত করেন; যথা: আক্ষরিক/literary, প্রচলিত ধারার/ conventional, প্রয়োজনীয়/essential, অতপর তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, প্রথম প্রশ্ন 'হাল' অস্তিত্বের ভিত্তি *(আছল আল-ওজুদ)* এবং অস্তিত্বশীল বস্তুর অবস্থা ও গুণাবলী অনুসন্ধান করে। দ্বিতীয় প্রশ্ন 'ma' পরিভাষায় বিশ্লেষণ তলব করে বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্যাস ও সার অনুসন্ধান করে।

তৃতীয় প্রশ্ন 'lima' বস্তুটির যৌক্তিক বাস্তবতা ও সাক্ষ্য-সবুত তালাশ করে। চতুর্থ প্রশ্ন 'Aiyu' বস্তুটির পৃথকীকরণ, বিশ্লেষণ, কোত্থেকে, কোনদিকে এবং কখন, বিষয়াদি অনুসন্ধান করে। ইমাম গাজ্জালি এগুলিকে হদ্দের পূর্বশর্ত হৃদয়ংগম করার প্রক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেন। (al-du'amatul hadd;) এবং তদুপরি তিনি হদ্দের ছয়টি নীতি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, এই নীতিগুলি বিজ্ঞানাদির অধ্যয়নের সাধারণ নীতিমালা, যাতে এগুলি ভালরূপে হৃদয়ংগম করা ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষে বিজ্ঞানাদির সমস্যাবলীর পর্যালোচনা করা নিষ্ফল, ধর্মীয় বিজ্ঞানাদি বা পদার্থিক বিজ্ঞানাদি যাই হোক না কেন।

ইমাম গাজ্জালির মতে ধর্মীয় বিজ্ঞানাদির ব্যতিক্রমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি প্রাথমিকভাবে বহির্জগতে অস্তিত্বশীল বস্তুগুলির প্রতি লক্ষ্য করে। অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহ দুইভাগে বিবেচ্য: চিরস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী। অতঃপর ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমূহকে সারবত্তা ও গুণাবলীর প্রেক্ষিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। আবার, গুণাগুণগুলিকে বিভক্ত করা হয় ঐসব বস্তুতে যেগুলী জীবনের সাথে অবস্থিত হয়, যেমন জ্ঞান, ইচ্ছা, স্বাধীনতা, কথাবার্তা, শ্রবণ, দেখা ইত্যাদি এবং অন্যাদিকে যেগুলি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যেমন-রং,আর্দ্রতা,স্বাদ ইত্যাদি। অধিকন্তু সারবত্তা গুলিকে বিভক্ত করা হয়: যথা, প্রাণবন্ততা, উদ্ভিদ, নিষ্প্রাণ বস্তু ইত্যাদিতে।

তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে জ্ঞানকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন, যথা: (ক) জ্ঞানের সারবস্তু ও (খ) যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করা হয়। যেমন- বিদ্যা ও জ্ঞান; প্রথমটি অর্জিত হয় ও দ্বিতীয়টির অন্বেষণ করা হয়। অতঃপর তিনি

CamScanner

জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, যথা 'নাযারিয়াত', 'থিওরিটিক্যাল', সূত্রগত এবং মা'রিফা, মারেফত, প্র্যাকটিক্যাল, যেমন আমরা বলে থাকি: দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিগত ও ব্যবহারিক, যেগুলি আয়ত্ত্ব করতে একদিকে পরিমাপের আশ্রয় নিতে হয় এবং অন্য দিকে প্রমাণসই স্বাক্ষ্যসবুত উপস্থিত করতে হয়, তথা একদিকে 'হদ্দ' পরিমাপ এর আশ্রয় নিতে হয় এবং অন্যদিকে বুরহান বা এভিডেন্স উপস্থিত করতে হয়। এভাবে আমরা এই কথায় উপনীত হই যে, বিজ্ঞান পরিমাপে আরম্ভ হয়।

অতএব, হদ বা পরিমাপের আদলে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দর্শনের যেখানে শেষ বিজ্ঞানের সেখানে প্রারম্ভ এবং বুরহান বা যুক্তি প্রমাণ এর প্রেক্ষিতে আমরা ধারণা করতে পারি যে, বিজ্ঞান objective experiment, বস্তুগত পরীক্ষনের দ্বারা নিজেকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে এবং অন্যদিকে দার্শনিক যুক্তি সম্মত ভাবধারণা দ্বারা দর্শন, শিল্পকলা ও সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়।

Scientiae vs. Science

অতএব, খ্রিষ্টিয় উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে রজার ব্যাকনের 'scientiae' experimentalis, ইংরেজি খ্রিষ্টান ধর্মযাজকীয় শব্দ science শব্দ যোগে, জনপ্রিয় রূপে পরিচয় লাভ করে, যা আজ পর্যন্ত প্রচলিত হয়ে আসছে। এটাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইতিহাস।

অবশ্য আজকাল experimental science কে পাশ্চাত্য আধুনিক জ্ঞানের আধার রূপে বিবেচনা করা হয়। মনে করা হয় যে, এটা পাশ্চাত্যেই জন্ম লাভ করে, উদাহরন স্বরূপ উপরে উল্লেখিত Paul Edwards ed.; *The Encyelopedia of Philosophy* (Collier & Macnillan, U.K. 1967, Vol. 7-8, p. 339) গ্রন্থে বলা হয়। John F. Herschell ছিলেন 'Originator of the Scienctific Analytical Methodology, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির উদাগাতা। তবে তিনি তাঁর গ্রন্থাদির নামকরণ করেন: 'Preliminary Discourse on the Study of

Natural Philosophy' অর্থাৎ কিনা অন্তত: Natural Science না বলে, সরাসরি Natural Philosophy নাম অবলম্বন করেন এবং গ্রন্থটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে যখনও 'Science' পরিভাষা পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ভাষ্যে চালু হয়নি। অতএব, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের, experimental science এর methodology-র উদগাতা হিসেবে, তাঁকে, চিহ্নিত করা অবান্তর। বস্তুত: হারশেল এর এ বক্তব্য বেশ কিছুটা বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। জনৈক Mr. Wolter এ নিয়ে দীর্ঘকালীন বিতর্কে লিপ্ত হন। তিনি বলেন: রজার ব্যাকন 'Scientiae experimentalis' দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন 'knowledge through experience', অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞান, যা inferential বা rational knowledge, যুক্তিবাদী জ্ঞানের বিপরীত (Ref. Joseph? Lafan ed.: *Standard Reference Encylopedia*, Vol. 3, ph. 896-97 and Poul Eduards ed.: *Encyclopedia of Philosophy* Vol. 1-2, ph. 240-42)।

জ্ঞাতব্য যে, Experimentalis, experiment, *tajribah* এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'হাকীকত' বা বাস্তব সত্যজ্ঞান এর সম্পৃক্ততা, যা পদার্থ বা বস্তুকে স্থায়িত্ব প্রদান করে, sustain করে। এটা দার্শনিক Dilthey এর Love, Chance and Reason গ্রন্থের দর্শন internalization and externalization'র সাথে তুলনীয়। তাঁর মতে, যখনই পদার্থিক বস্তুকে internalize, অভ্যন্তরীণ করা হয়, তখন ইহা reality সত্যসত্ত্বায়, পরিণত হয়। এটাই হল 'হাকীকত'। আর যখনই reality-র অস্তিত্বকে বাহ্যিকীকরণ করা হয়, তখন তা পদার্থিক বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ডিলথাই এর দর্শনে-এ গুলি হল concept বা কল্পনা প্রসূত ধারণা, idea, যেগুলির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। পক্ষান্তরে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, হাকীকত, realities-এ সত্যিকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান, যেগুলি বস্তুত পদার্থিক বস্তুসত্ত্বাকে ধারণ করে।

CamScanner

পূর্বাঞ্চলীয় জীবন ব্যবস্থায় অস্তিত্বকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়,

যথা-	১	২	৩	৪
বাংলা ভাষা	তথ্যজ্ঞান	যুক্তিতত্ত্ব	হাকিকত সত্যজ্ঞান	দিব্যজ্ঞান
আরবি ইসলামি	মাইসুসাত	মা'কুলাত	হাকীকত	মা'রিফত
বৌদ্ধ ধর্মীয়	বিভু	তৈজস	প্রজ্ঞা	তূর্য

এর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি জ্ঞানতত্ত্বের তৃতীয় হাকীকত, reality-র স্তরে সত্য জ্ঞানের উদয় হয়, যা পাশ্চাত্যের জ্ঞানতত্ত্বের (১) perceptual knowledge, অনুভূতির তথ্য জ্ঞান ও (২) conceptual knowledge, ধারণামূলক জ্ঞানের অতীতে (৩) তৃতীয় স্তরে, reality-র স্তরে উদিত হয়। এ তৃতীয় বিষয়টি পাশ্চাত্যের আধুনিক-পূর্ব যুগে reality নামেই পরিচিত ছিল, যাতে খ্রিষ্টিয় ধর্মপন্থী ক্যাথলিক খ্রিষ্টানরা এখনও বিশ্বাস করে।

এ গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনার কার্যক্রমে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের, যা আদতে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান ধর্মের দাবিদার Protestant, প্রটেস্টেন্ট জনগোষ্ঠীর ভাবধারার চত্বরে অবস্থিত, যাদের সাথে মূল খ্রিষ্টান গোষ্ঠী রোমান ক্যাথলিকরা বহুলাংশে একমত নয়, তাদের বৈজ্ঞানিক চমকপ্রদ পরিসর থেকে আমরা দেখতে পাই যে, পাশ্চাত্যের এ আধুনিক বিজ্ঞানীরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের 'উৎপত্তি' সম্পর্কে ওয়াকেবহাল নয়; পরন্তু তারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের 'বিকাশ' নিয়েই ব্যাপৃত হয় এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, তারা বিজ্ঞানের প্রকৃতি অনুধাবন ও বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন-এর বিষয়াদি পেছনে রেখে, বিজ্ঞানের প্রযুক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়ে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উন্নতি সাধনের প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগ প্রদান করে।

শুরুতেই একটি প্লীহা চমকানো ঘটনায় আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে হতভম্ব অনুভব করি, যখন বিগত ১৯৬০ এর দশক থেকে আমার প্রায় অর্ধশত বছর বিজ্ঞানের ইতিহাস গবেষণার চত্বরে, চলতি শতকের দশকের পর্যায়ে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে, আধুনিক পাশ্চাতের বিজ্ঞানচর্চাবিদদের 'বিজ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত বিশ্বজনীন মূল পরিশব্দ 'science', সায়েন্স, শব্দটি বিজ্ঞান অর্থে রূপকথার চেয়েও অধিক কাল্পনিক। জীবনভর কুরআন গবেষক

হিসেবে, আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, বিজ্ঞান অর্থে বিজ্ঞান পরিশব্দ ও science, ইত্যাদির মূল উৎস আল কুরআনের 'ইলম' ও 'উলুম' শব্দের মধ্যে নিহিত এবং এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হবার জন্য অদম্য প্রয়াসে আমি আকাশ পাতাল তোড়পাড় করেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমার এ সুদীর্ঘ গবেষণা প্রক্রিয়ার শেষ প্রান্তে যখন আমি 'science' পরিশব্দটির etymological analysis, philosogical analysis and morphological analysis (শব্দতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও শব্দবিন্যাসতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ) করে (প্রারম্ভিক তিন পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), এই দেখে স্তম্ভিত হলাম যে, 'science' শব্দের মৌলিক অর্থ 'sign', 'চিহ্ন' এবং ইংরেজ ধর্মযাজকদের ব্যবহারে 'insignia', নিদর্শন। আরো বিস্ময়ে দেখতে পেলাম যে, science শব্দটি ইংলিশ ধর্মযাজকীয় ভাষায় insignia, নিদর্শন অর্থে শত শত বছর ধরে, আল্লাহ, তথা God-এর সাথে সংযুক্তরূপে 'science of God' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ 'science' শব্দটি 'sign'-এর বর্ধিত অর্থে ব্যবহার করে, তাঁরা বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয় ইসলামি কুরআনী শব্দ 'আয়াতুল্লা' অর্থাৎ আল্লাহর নিদশর্নের সাথে তাল মিলাতে চেয়েছেন, অথবা তাঁদের প্রাচীন ইঞ্জিল শরিফের ঐতিহ্য, তাঁদের সামাজিক সংস্কৃতিতে চলে আসছিল। ইংলিশ ব্যাকরণ এর প্রেক্ষিতে আমি 'science' শব্দটিকে একক, monolithic হিসাবে পেয়েছি, যা Roger Bacon-এর উদ্ভাবিত scientia ও scientiae এর সাথে কোনোরূপে সম্পৃক্ত নয়। কেননা 'science' হল একটি ইংলিশ কথ্যভাষা, আর scientia হল Aryan Latin ভাষার ঐতিহ্য মূলে একটি সন্ধিযুক্ত শব্দ, তথা scien+entis =scientia এবং এর বহুবচন scientiae, এ শব্দটি রজার ব্যাকন নিজে তৈরি করেছেন, ইতোপূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

Roger Bacon আরবি ভাষার 'ইলম' ও বহুবচনে 'উলুম' শব্দের অনুবাদ রূপে শব্দদ্বয় Latin ভাষায় তৈরি করেছিলেন, অর্থ হল যথাক্রমে 'জ্ঞান' ও 'বিজ্ঞান'। আর উলুম আত-তাজারিবিয়াকে, তিনি অনুবাদ করেছিলেন 'scientiae experimentalis' খ্রিষ্টিয় তের শতকে। ইংরেজি science এবং scyence শব্দ মহাকবি Shakespeare, রহস্য mystery

অর্থেও ব্যবহার করেছেন, এই বলে: Had not in natures mysterie more science, than I have in this Ring?[১]

রজার ব্যাকনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামি আরবি 'উলুম' আত-তাজরিবিয়া'-র প্রবর্তন করা, যাকে বর্তমানে experimental science বলা হচ্ছে। আরবি রীতিতে বিজ্ঞানকে যেহেতু বহুবচনে 'উলুম' বলা হয়, তাই তিনি এর ল্যাটিন অনুবাদও বহুবচনে scientiae করেছিলেন, যা দ্বারা তিনি গ্রিক যুক্তিতাত্ত্বিক ভাবাপন্ন inferential knowledge-কে রদবদল করতে চেয়েছিলেন, যেমন আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দেখেছি।[২]

রজার ব্যাকনের ল্যাটিন শব্দ 'scientiae' এবং ইংরেজি শব্দ 'science'-এর সঠিক অর্থ বের করতে আমাকে আকাশ পাতাল তোলপাড় করতে হয়েছে এবং অবশেষে বৃহৎ আকারের Oxford English Dictionary তে পাওয়া গেল যে, ইংলিশ যাজকীয় কথ্য ভাষার শব্দ 'science'কে খ্রিষ্টিয় উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ল্যাটিন শব্দ experiment এর সাথে যুক্ত করে, experimental science রূপে 'scientiae experimentalis'-এর অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা ইতো পূর্বে খ্রিষ্টিয় ১৪ শতক থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 'natural philosophy' তথা 'প্রাকৃতিক দর্শন' রূপে ব্যবহার হয়ে আসছিল। পরবর্তীতে দেখা যায় experimental science রূপেই 'উলুম আত-তাজবিয়া'-কে আধুনিক পাশ্চাত্যের সর্বত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

একজন গবেষক হিসেবে আমি বলতে চাই, রজার ব্যাকনের উদ্ভাবিত 'Scientiae experimentalis' একটি আশ্চর্য্যজনক পরিশব্দ ছিল, যা প্রথমত, natural philosophy নামে এবং পরবর্তীতে experimental science রূপে খ্রিষ্টিয় তের শতক থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আধুনিক উদীয়মান ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষত: যার চালিকা শক্তির বদৌলতে আধুনিক পাশ্চত্য সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং চলমানতা প্রাপ্ত হয়।

CamScanner

Scientiae Experimentalis-এর জন্মদাতা

পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি সভ্যতার মধ্যযুগীয় স্থবিরতা থেকে আধুনিকতার উন্নত শিখরে আরোহণের প্রক্রিয়ায় দুই জন ইংরেজ ব্যক্তিত্বের অবদান অবিস্মরণীয়। এঁদের উভয়ই ইউরোপের অঙ্গনে 'scientiae experimentalis' (Experimental Science)-এর জনক হবার দাবি রাখে। এদের উভয়ই খ্রিষ্টিয় তের শতকে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের সংস্কৃতি সভ্যতার চত্বরে খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন এবং উভয়ই ইসলামি আরবি সভ্যতার দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, তাঁদের মতে, ইসলামি ভাবধারার দ্বারা কলুষিত হবার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ ছিল। তা সত্ত্বেও তারা উভয়ে তৎকালীন ইউরোপীয় দেশগুলোর শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদতা এবং জীবন যাপন ব্যবস্থায় স্থবিরতা দর্শনে বিব্রত অনুভব করেন। উভয়েই গভীরভাবে উপলব্দি করেন যে, জ্ঞান গরিমায় উন্নত ও চলমান জীবন যাপন পদ্ধতিতে অগ্রসর মুসলিম সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে আরবি সংখ্যাতত্ত্ব, মুসলিমদের অঙ্ক শাস্ত্র এবং তাজরিবী বিজ্ঞান আহরণ করা ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন। তাঁরা মনে করেন যে, এ ছাড়া ইউরোপের সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতি বিধান করা দূরে থাক, তা বাঁচিয়ে রাখাও হবে দুষ্কর।

এদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন Robert Grosseteste (1168-1253 CE), যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ Chancellor পদে উন্নিত হন এবং First Lecturer of Oxford ও এরই সাথে ইংল্যান্ডের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় Dioscene, চার্চ প্রতিষ্ঠানের Bishop ছিলেন।[৩]

অন্যজন ছিলেন Roger Bacon (1214-1292 C.E), তিনি ছিলেন মূলত একজন Franciscan Monk, খ্রিষ্টান ধর্মীয় ফ্রান্সিমকান সন্ন্যাসী, তবে অঙ্কশাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ ছাত্র, অক্সফোর্ড ও প্যারিস এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।[৪]

এদের প্রথম জন রোবার্ট গ্রসেটেস্টকে ইংলিশ বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের জনক বলা হয় এবং অন্যজন রজার ব্যাকনকে সমগ্র পাশ্চাত্যের জন্য

ব্যবহারিক বিজ্ঞান, experimental science-এর প্রধান উদ্যোক্তা রূপে কল্পনা করা হয়।

তাছাড়া আরো বলা যায় রজার ব্যাকন ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি উপলব্ধি করেন যে, গ্রিক-রোমান যুক্তিতাত্ত্বিক inferential knowledge, দার্শনিক অনুমানসিদ্ধ পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের উচ্চতর জ্ঞানকে মুসলমানদের 'উলুম আত-তাজরিবিয়া' শ্রেণিগতভাবে, categorically অতিক্রম করে গেছে, ফলে ইউরোপের জ্ঞানচর্চা, out-dated সেকেলে হয়ে পড়েছে এবং মুসলমানদের যুগোপযোগী ব্যবহারিক বিজ্ঞান রপ্ত করা ছাড়া গত্যান্তর নাই। তিনি তাঁর দেশবাসীর নিকট অকুণ্ঠচিত্তে আবেদন করেন যেন তারা দেশের দশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার খাতিরে গ্রিক যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক Inferential গবেষণা পদ্ধতিকে রদবদল করে মুসলমানদের এক্সপেরিমেন্টাল গবেষণা পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং এর নতুন ভিত্তিতে ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্যক্রম সংশোধন করেন, যাতে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয় ও পিছিয়ে না পড়ে। দেশবাসীর সম্মুখে যুগধর্মী ব্যবহারিক বিজ্ঞান আয়ত্ত্ব করার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরার এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার বিষয়ে ওয়াকেবহাল করার লক্ষে, রজার ব্যাকন 'Opus Majus' শিরোনামে একটি বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন।[৫] এতে তিনি ইউরোপে প্রচলিত গ্রিকপন্থী inferential knowledge এর ত্রুটি ও দৈন্যতাসমূহ তুলে ধরেন এবং scientiae experimentalis এর গুণ ও মহাত্ম্যসমূহ প্রদর্শন করেন।

ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দ্বারা ইনফারেন্সিয়্যাল নলেজ-এর রদবদল করার লক্ষ্যে তাঁর এ প্রচেষ্টা প্রথমদিকে ইউরোপীয় সুধীমন্ডলীর মধ্যে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি করে; কিন্তু পরবর্তীতে রক্ষণশীল খ্রিষ্টান ক্যাথলিক পণ্ডিতদের তা নজরে আসলে, তাঁর সংস্কারের ধারণাগুলো কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং তাঁর ভাবধারাকে ধর্মবিরোধী heretic আখ্যায়িত করে ও তাকে শেষ

পরিণতিতে একটি চার্চের মধ্যে নজরবন্দী করা হয়, যাতে তিনি ১৪ বছর যাবত বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করেন।

এর পরবর্তী ইতিহাস সবার জানা আছে যে, তাঁর অনুসারী গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কি প্রকার অত্যাচার ও দুরবস্থার শিকার হতে হয়েছিল।

যাই হোক, অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতে হবে যে, রজার ব্যাকনই মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক পরিশব্দ 'উলুম আত-তাজরিবিয়া'কে ল্যাটিন ভাষায় scientiae experimentalis রূপে সঠিক অনুবাদ করেছিলেন, যা খ্রিষ্টিয় তের শতক থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত 'natural philosophy' নামের ছদ্মাবরণে সংগোপনে ইউরোপের বিজ্ঞান প্রেমীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, উনিশ শতকের মধ্যেভাগে 'experimental science'-এর মেকী নাম ধারন করে অধ্যাবধি ব্যবহারিক বিজ্ঞানচর্চার কেন্দ্রীয় পরিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তবুও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান প্রেমীরা তখনও রোমান ক্যাথালিন খ্রিষ্টানদের রক্তচক্ষু এড়িয়ে এর যথাযথ পরিশব্দ 'scientiae experimentalis' বা 'experimental scientiae' গ্রহণ করার সাহস পায়নি। কেননা, তারা ভয় করেছে, পাছে ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা তাদেরকে জ্ঞানের ইসলামি করণের অপবাদ দিয়ে ex-communicate' বা ধর্মচ্যুত একঘরে করে না বসে।

তবে লক্ষণীয় যে, বিজ্ঞান অর্থে scientiae, scientiaefic-এর বদলে science, scientific-এর পরিভাষা প্রচলিত করায়, পাশ্চাত্যের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ধারণায় কিছু মেকী ভাবধারার জন্ম দিয়েছে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে এখনও inducative knowledge বা গ্রিক ভাবাপন্ন induction থেকে উৎপন্ন বা প্রত্যুৎপন্ন রূপে কল্পনা করে থাকে, যাতে তাদের ব্যবহৃত পূর্বেকার 'natural philosophy'-র গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু বুঝতে হবে যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে, inferential ও experiment এর মধ্যে গ্রিকদেশীয় ঘোড়া ও আরবি উটের মত তফাৎ। এ তফাৎ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তারা আজকাল 'philosophy of science' নামের এক নতুন বিদ্যা বের

CamScanner

করেছে, যা নেহাত অবান্তর। তাদের এ confusion, ঝাপসা ধ্যান-ধারণা, তাদেরকে scientific knowledge-এর সমকক্ষ রূপে empirical knowledge-কে কল্পনা করতেও উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমাদের আলোচনার শেষ প্রান্তে ফের ভাষাতত্ত্বের প্রতি নজর দিয়ে আমরা হাতে নাতে দেখাতে চাই, ল্যাটিন শব্দ sciens আরবি (عَلَم) আলম এর সমার্থ বোধক; অর্থাৎ scien মানে 'আলম' বা চিহ্ন এবং ল্যাটিন sciens+entis= scientia এর সমতুল্য আরবি (عِلْم) ইলম অর্থাৎ জ্ঞান; শব্দ দুটির বহুবচনে scientia+ae=scientiae উলুম, ইলম এর বহুবচন এবং তাজরিবার ল্যাটিন experimentalis, তাই scientiae experimentalis উলুম আত-তাজরিবিয়া; কিন্তু ইংলিশ science এর অর্থ 'চিহ্ন' ও 'নিদর্শন', যার অর্থ কিছুতেই জ্ঞান অথবা বিশেষ জ্ঞান, তথা বিজ্ঞান হতে পারে না। তদুপরি ইংরেজি know থেকে knowledge মানে যা জানা গেল, তথা বিদ্যা, তাহা জ্ঞান নয়। অতএব, ভাষাতত্ত্বের নিরিখে science বিজ্ঞান নয় ও scientific knowledge কোনোমতেই বিজ্ঞানের অর্থবহ নয়।

আরো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, আরবি তাজরিবাহ, (تجربه) শব্দটি মূলত (جرب) থেকে নির্গত, যা বাংলা ভাষায় 'জরিপ' (জরীব/জরীপ) অর্থাৎ পরিমাপ, ইংরেজিতে survey। অতএব 'তাজরিবী' শব্দের অর্থ serveyed, জরিপকৃত, যেরূপ ভূমি জরিপ করা হয়। তাই experimental মানে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেৎ, উচ্চতা সম্বলিত, হাতেনাতে পরিমাপকৃত যে অর্থ, তা experimental science থেকে নির্গত হয় না।

আমরা উপরে দেখেছি যে, মুসলমানরা চারপ্রস্তী যুক্তিবিদ্যার 'বুরহান' evidential logic এর স্তর থেকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেছে, যা 'কিসের কি?' জোড়া প্রশ্ন থেকে উদ্ভব হয়।[৬] আমরা আরো বলতে পারি, ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি, আরোহ-অবরোহ যুক্তিবিদ্যার আদলে-এক, দুই, তিন প্রস্থী চিন্তাধারায় পর্যবসিত ছিল, যথা (১) কথাবার্তা, (২) তর্ক-বিতর্ক, চিন্তা-ভাবনা, নাটক, সাহিত্য ইত্যাদি (৩) দর্শন।

CamScanner

পক্ষান্তরে ইসলামের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ন হল একটি নবনূতন ধাঁচের চতুরপ্রস্তী যুক্তিতত্ত্বের আদলে; যথা- রিওয়ায়ত-দিরায়ত-তাজারিবা-তা'দীল। এর তৃতীয় প্রস্তে, বুরহান যুক্তিতত্ত্ব অবস্থান করে।[৭]

এখানে আমরা বলতে চাই, আল কুরআনের প্রেক্ষাপটে মানুষ একটি চার প্রস্তী কার্যক্রমের মধ্যে জীবন যাপন করে, যথা-

১. একপ্রস্তী খবরাখবর, মতামত, যে সব কেহ গ্রহণ বা প্রত্যাখান করতে পারে, কিন্তু সংশোধন করতে পারেনা। খবর information।

২. দুইপ্রস্তী কথাবার্তা, তর্ক-বিতর্ক, যুক্তিবিদ্যা, কলা, সাহিত্য যেগুলো পারস্পারিক, বাস্তব, তথ্যগত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা যোগ্য। তথ্য, data, পরীক্ষিত খবর, নিরিক্ষিত সংবাদ।

৩. সূত্রগত, দার্শনিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, বিশ্বজনীন মূল্যবোধ, ধারণামূলক মূল্যায়ন ইত্যাদি।

৪. তা'দীল, চতুর্প্রস্তী সমন্বয়, four digital synthesis, তাজরিবী ধর্মতত্ত্ব, তাজরিবী জ্ঞানতত্ত্ব প্রচ্যের ধর্মীয় সূত্রাদি, যেগুলো জ্ঞানকে সত্য ও প্রজ্ঞার দিকে নিয়ে যায়।

এর ৪র্থ প্রস্তের সত্য, অন্তরে অন্তরাত্মায় soulfully উপলব্ধি করা যায়, এক্সপেরিমেন্টাল পদ্ধতিতে, যা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের দিকে নিয়ে যায় এবং আরো একপ্রস্ত সম্মুখে এগিয়ে reality তে উপনীত হওয়া যায়। ধর্মীয় আবেশে, 'মা-রিফাতে', আল্লাহর সাথে ফানা হওয়া ও বক্বা প্রাপ্ত হওয়া অবস্থায়, যা প্রাচ্যের ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য দ্বীন, ধর্ম, তথা-ধ= ধারন করে, মর্মবাণী, বিবেকের বাণী, morality যা মহাপ্রভুর ফুঁকে দেয়ার ফসল।।

প্রচ্যের ধর্মীয় আবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে বা কুরআনের প্রেক্ষিতে, আধুনিক পাশ্চাত্যের জ্ঞানকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তের যুক্তিবাদী আকারে, frame work-এ, গ্রিক যুক্তিতত্ত্বের particular and universal-পর্যায়ে অবস্থিত দেখা যায়। চতুর্থ প্রস্ত এই এ্যারিসস্টলীয়

CamScanner

বিশ্বজনীনতার দেয়াল ভেদ করে- সত্যে পৌছাতে- Covunion with God, মহাপ্রভু আল্লাহর সাথে ফানা-বাক্কায়, মানুষকে ধর্মবোধে আত্মউৎসর্গিত আত্মবিলীন পর্যায়ে উপনীত করে।

এক কথায়, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, এক প্রস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ, কিরূপে(?) প্রশ্ন থেকে উদ্ভব হয়নি, অথবা গ্রিক দার্শনিক কারণবাদী বিদ্যা বা জ্ঞান থেকে উদ্ভব হয়নি। বরং আল কুরআনের 'কিসের কি(?)' দ্বিপ্রস্তী প্রশ্নের আদলে উপস্থাপিত, উত্থিত, প্রকাশ, বিকাশ ও উদ্ভূত হয়েছে।

কোনো একটা বস্তু সম্পর্কে তজরিবী বৈজ্ঞানিক জ্ঞান/ experimental knowledge/ ব্যবহারিক বিজ্ঞান এর জ্ঞান অন্বেষণের জন্য মুসলিম বিজ্ঞানিরা দুই প্রকার সংজ্ঞায়নের আশ্রয় গ্রহণ করে। যথা- (ক) ধারণামূলক সংজ্ঞায়ন তা'রিফ, (ডেফিনিশন), যদ্দারা তাঁরা বস্তুটির গুণাগুণ নিরূপন করেন; এবং (খ) চতুর্প্রস্থী পরিমাণমূলক সংজ্ঞায়ন (তাহদিদ, হদ, Measurement) যদ্দারা তাঁরা বস্তুটির প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা নিরূপণ করেন।

ফলে তাজরিবী বিজ্ঞান দৃঢ়পদে দন্ডায়মান হয় এবং গ্রিক দর্শনের ধারণামূলক জ্ঞান (Inferenial Knowledge) থেকে বিকীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে, এরই ধারাবাহিকতায় সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে, তাতে দর্শনকে বুদ্ধিগত জ্ঞানাদি সম্বলিত (আল উলুম আল-নযরিয়াত) রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং তজরিবী বিজ্ঞানাদিকে (আল উলুম আত-তযরিবিয়াত) রূপে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়; অর্থাৎ গ্রিক জ্ঞান প্রসূত ধারণামূলক, subjective তথা inferenial জ্ঞানের বিপরীতে, তজরিবী বিজ্ঞানগুলোকে objective, বাস্তব অনুসন্ধিৎসার জ্ঞান, experimental wisdom, ব্যবহারিক বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

গ্রন্থকারের ১৯৫২ থেকে ২০১৫ খ্রি. সালের এ ষাটোর্ধ বছরের কষ্ঠসাধ্য গবেষণালব্দ পুস্তকের পরিসমাপ্তিতে আমি ইসলাম ধর্মের দিক্ দীশারী উলামা, মাশায়েখ ও বিজ্ঞ আধুনিক স্কলারগণকে বিনীতভাবে আহ্বান জানাব তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে 'রিওয়ায়াত-দিরায়াত-জরাহ্-

CS CamScanner

তাদীল'-এর মতানুসারে এ গ্রন্থটি 'রিওয়ায়াত-দিরায়াত-তজরিবা-তাদীল' হিসেবে গ্রহণ করেন। যেমনটি বিগত চৌদ্দশত বছর ইসলামি আইন আদালতের ঐতিহ্যে মামলা-মকদ্দমার ফয়সালায়: ক) বাদীপক্ষের সাক্ষ্য সবুত, খ) বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য ছবুত, গ) জেরা, ঘ) রায়ের চতুর্প্রস্তী কার্যক্রম চলে আসছে। আমীন!

নির্দেশিকা

১ Oxford English Dictionary, 1961, Vol. ix, p. 221.

২ উপরের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

৩ উপরের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

৪ উপরের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

৫ উপরের প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রঃ।

৬ ঐ।

৭ ঐ।

পরিশিষ্টঃ ১

Typology of Knowledge in the East and the West
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান প্রকরণ
ক. জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া

আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি। আমাদের চক্ষু, নাশিকা, শ্রবন, জিহবা ও ত্বক বস্তজগতের জানার সিংহ দ্বার এই ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীন এবং বহির্জগতের বস্তসমূহকে এক এক করে অথবা সামষ্টিকভাবে অনুভব করি। অতএব, মানুষের অনুভূতি অন্তরজগত এবং বহির্জগতকে জানার প্রাথমিক উৎস। জানার এই প্রাথমিক উৎসকে আমরা অনুভূতির জ্ঞান নামে অভিহিত করতে পারি।

অনুভূতিকে ইংরেজি ভাষায় বলে পারসেপশন (perception) এবং আরবীতে বলে ইহ্সাস্। আর অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকে ইংরেজিতে বলে পরসেপ্ট (percept) এবং আরবিতে বহুবচনে বলে মাহসুসাত। তাই আমরা বলতে পারি মানুষের মানুষের জ্ঞানের প্ররম্ভ অনুভুতির চত্বরে, পারসেপশনে বা মাহসসাতে নিহিত। কিন্তু অনুভূতির জ্ঞান অপূর্ণ। ইহা পূর্ণতা লাভ করে যখন ইহা মস্তিস্কের চত্বরে প্রবেশ করে একটি 'ধারণায়' পরিণত হয়। যেমন একটি চতুষ্পদ জন্তু দেখে, আমার মনে একটি গরুর ধারণা সৃষ্টি হয়। যখন হাতের ত্বকে গরম অনুভব করে আমার মনে আগুনের ধারণার উদ্ভব হয়। আযানের শব্দ শুনে সালাত বা নামাযের ধারণা, উলুধবনি শুনে পূজার ধারণা, খুশবু শুকে আতরের ধারণা ইত্যাদির উদ্ভব হয়। অতএব, অনুভূতি ধারণায় পূর্ণত্ব লাভ করে।

সুতরাং আমরা সাধারণ ভাবে বলতে পারিঃ অনুভূতি ধারণায় পূর্ণত্ব লাভ করে, perception, conception এ ও percept, concept-এ পূর্ণত্ব লাভ করে। অনুরুপভাবে ইহ্সাস মাহ্সুসে এবং বহুবচনে মাহসুসাতে পূর্ণত্ব লাভ করে। শরীরবৃত্ত (physiology) এবং মনোবিজ্ঞান (psychology)

CamScanner

বলে: যখন আমার চোখে কোন একটি বস্তু দৃষ্টি হয়, তখন বস্তটির প্রতিচ্ছবি আমরা চোখের রেটিনায় ছায়াপাত করে এবং ওই ছায়া পাত বা reflection টির বার্তা রেটিনার শিরা উপশিরার মাধ্যমে আমার মস্তিস্কে পরিচালিত হয়। মানুষের মস্তিস্কে বিগত অভিজ্ঞতার পরিমাপক একটি মহাশক্তিশালী কম্পিউটার রয়েছে যা তাৎক্ষনিকভাবে বলে দেয় আমার দৃষ্ট বস্তুটি কি ও এর নাম ধাম ইত্যাদি। তাতে আমরা জানতে পারি আমাদের অনুভূত বস্তটি একটি লাঠি, একটি সাপ, গরু, কুকুর, ইদুঁর ইত্যাদি। অতএব অনুভূতির জ্ঞান, ধারণামূলক জ্ঞানের পরিপক্ক হয়। সুতরাং ধারণামুলক জ্ঞান conceptal মানে ধারণা আর conceptal মানে ধারণামূলক জ্ঞান, তথা মাহসুস থেকে মাহসুসাতের জ্ঞানি, দ্বিতীয় প্রস্তি জ্ঞান। যথা,প্রথম প্রকার জ্ঞান অনুভূতির জ্ঞান, যার দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান ধারণামূলক জ্ঞান।

মানুষের ধারণামূলক জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধারণামূলক জ্ঞান মানুষের জীবন যাপনের প্রধাণ সোপন। ধারণামূলক জ্ঞান মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একমাত্র বাহন।

আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বাস্তবে অস্তিত্বশীল বস্তুকে অনুভব করতে পারি।কিন্তু আমাদের অনুভূতি আমরা অন্যকে বুঝাতে পারিনা। অন্যের নিকট ব্যক্ত করতে পারিনা, communicate করতে পারিনা। অনুভূতির বার্তা পরিবেশন বা communicate করার একমাত্র বাহন হল 'ধারণা' ধারণাকে ইংরেজিতে বলা হয় Comcept, idea, news, interpretation ইত্যাদি। মানুষের যাবতীয় কথাবার্তা ধারণা বাচক। আমরা ধারণা পরিবেশনের মাধ্যমে আমাদের অনুভূতি এক অন্যের নিকট ব্যক্ত করি। তবে স্বীকার করতে হবে, অনুভূতির পরিধি, ধারণা থেকে অধিকতর ব্যপক এবং আমাদের ধারণা, অনুভূতিকে নির্মমভাবে কাটসাঁট করে ব্যক্ত করে, তাতে আমাদের ধারণা, অনুভূতিকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে অসমর্থ হয়। তবুও ধারণার মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে আমাদের অনুভূতি বক্ত করা যায় না। আমাদের ব্যবহারিক জীবন বার্তা পরিবেশন করার এরূপ

CS CamScanner

সীমাবদ্ধতা কাটিয়া ওঠার জন্য আমরা নিত্যাতুন ধারণা সৃষ্টি করতে ব্রতী হই এবং তাতে কল্পনার সাহায্য গ্রহন করি।

কল্পনা জ্ঞান মাহরণের একটি বিকল্প উৎস। কিন্তু ধারণা যেখানে বাস্তব অস্তিত্বশীল, সেখানে কল্পনা অবাস্তব। তবুও কল্পনা অনুভূতির অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারে না। কেবল অনুভূতিকে কাটসাঁট করে বা জোড়াতালি দিয়ে,নতুন ধারণা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন, মানুষের অবয়ব ও পাখির পাখার সমন্বয় করে উড়ন্ত জ্বীন পরির ধারণা আমরা তৈরি করি।অধিকন্তু অনুভূতি মানুষের একান্ত ব্যক্তিক। একজনের অনুভূতি অন্যজন অনুভব করতে পারে না। এর ব্যতিক্রমে ধারণা সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক হওয়ার তা পারস্পরিকভাবে বোধগম্য হয়। অতএব এককভাবে ধারণাই মানুষের কথাবার্তা ও ভাব আদান প্রদান করার মাধ্যমে রূপে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং ধারণার মাধ্যমে আমরা কথাবার্তা বলি,ভাবের আদান প্রদান করি, তর্ক বিতর্ক করি এবং সর্বোপরি আমরা যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে ভুত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ, তথা বিগত সময়ের ঘটনাবলী, বর্তমান পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে যাছাই বাচাই করে যথোপযুক্ত ধারণায় উপনীত হতে চেষ্টা করি।আর শেষোক্ত প্রচেষ্টাকে যুক্তিবিদ্যা নামে অভিহিত করা যায়। এতে বিষদভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রথমত পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং দ্বিতীয়ত যুক্তিবিদ্যা মানুষের জ্ঞান অর্জনের প্রকৃষ্ট উৎস।

তবে ইন্দ্রিয়লব্দ জ্ঞান ও যুক্তি লব্ধ জ্ঞানকে বাংলা ভাষায় জ্ঞান বলা হয় না,বরং প্রথমটিকে নিছক অনুভূতি ও দ্বিতীয়টিকে যুক্তি বিদ্যা বলা হয়। ইংরেজি ভাষায়ও প্রথমটিকে অনুরূপভাবে Knowledge না বলে কেবল Sense perception বলা হয়। আরবি ভাষায় অনুভূতি লব্ধজ্ঞান কে ইলম বা জ্ঞানই বলা হয় এবং যুক্তিলব্ধ জ্ঞানকে ও ইলম বলা হয়, কিন্তু ওই উভয় প্রকার জ্ঞানকে অর্জিত জ্ঞানরুপে বাহ্যিক জ্ঞানের শ্রেণি ভুক্ত করা হয়।

বাহ্যিক জ্ঞানকে আরবীতে বলা হয় 'ইলমে যাহিরী' তথা জাহেরী জ্ঞান। ইংরেজিতে জাহেরী ইলমকে ল্যাটিন পরিভাষায় exoteric Knowledge বলা হয়। আর জাহেরী জ্ঞানের বিপরীতে অভ্যন্তরীন আন্তরিক

CS CamScanner

বা বাতেনী জ্ঞানকে 'ইলমে বাতেনী' বলা হয়। ইলমে বাতেনী বা অভ্যন্তরীন, জ্ঞানকে ইংরেজিতে ল্যাটিন পরিভাষায় esoteric Knowledge বলা হয়।

আমাদের আলোচ্য বিষয় typology of knowledge জ্ঞান প্রকরণের বিভক্তি সরলভাবে বোঝানো জন্য আমরা আরবী ভাষার রীতি দিয়ে আরম্ভ করি। আরবী ভাষার বলা হয়, ইলম বা জ্ঞান ব্যবহারিক দিক দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত, যথাঃ ইলমে যাহিরী এবং ইলমে বাতিনী, অর্থাৎ জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্তি, যথা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন। আবার বাহ্যিক বা জাহেরী জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্তি, যথা: ইলমে মাহসুসাত এবং ইলমে মাকুলাত, অর্থাৎ অনুভূতির জ্ঞান এবং যুক্তির জ্ঞান। এ দুটি জ্ঞানকে আরবি রীতিতে অর্জিত জ্ঞান বা তাহ্সীল বা অর্জন করার জ্ঞান রুপে বিবেচনা করা হয়।

অন্যদিকে বাতেনী জ্ঞানকে ও দুই ভাগে বিভক্তি করা হয়, যথা: হাকীকত এবং মা'রিফাত, অর্থাৎ সত্য জ্ঞান ও দিব্য জ্ঞান।

অতএব, আরবি রীতিতে জ্ঞান চার প্রকার। দুই প্রকার জাহেরী এবং দুই প্রকার বাতেনী। এই প্রকারভেদ ইসলাম ধর্মের নিরিখে মুসলমানরা সৃষ্টি করেছে। চার প্রকার জ্ঞানের ছক নিম্নরূপ:

মাহাসুসাত–মা'কুলাত- হাকীকত–মারিফত

এর প্রথম দুই প্রকার জাহেরী জ্ঞান, যা অর্জিত জ্ঞান। আর শেষের দুই প্রকারকে বলা হয় প্রাপ্ত জ্ঞান, যাকে আররী রীতিতে লাদুন্নী, অর্থাৎ আল্লাহর কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞান বলা হয়।

জ্ঞানের অনুরুপ চতুর্ভাগে বিভক্তি বাংলা ভাষার ও প্রচলিত আছে, যথা:

অনুভূতি– যুক্তিবিদ্যা সত্য জ্ঞান-বিদ্যাজ্ঞান

বাংলা রীতিতে এর প্রথম দুইভাগ বিদ্যার স্তরে পড়ে এবং শেষের দুইভাগ বিদ্যার স্তরে পড়ে এবং শেষের দুইভাগ জ্ঞানের চত্বরে পড়িত হয়। বাংলা রীতিতে এর প্রথম দুইভাগ বিদ্যার স্তরে পড়ে এবং শেষের দুই ভাগ জ্ঞানের

CamScanner

স্তরে পতিত হয়। বাংলা ভাষায় জ্ঞানকে বিদ্যা থেকে পৃথক করা হয়। বিদ্যা মানে যা পড়ে পড়ে, শুনে শুনে, দেখে দেখে, করে করে, বলে বলে অর্জন করা হয়, যেমন ক্রীড়াবিদ, কৃষিবিদ, শিক্ষাবিদ, জ্যোতির্বিদ, বিদ মানে বিষারদ। এসব অর্জিত জ্ঞানকে বলা হয় বিদ্যা, যা বাইরে থেকে মানুষের অন্তরে ঢোকে। আর হাকিকত ও মারিফাতকে বলা হয় জ্ঞান, যা মানুষের অন্তরে পরিপক্ক হয়ে ভেতর থেকে বের হয়। হকিকত হল অনুপ্রেরণামূলক আর মা'রিফাত হল ওয়াহীমূলক প্রত্যাদিষ্ট।

এক কথায় বিদ্যা আহরণ করা হয় এবং জ্ঞান বিকাশ লাভ করে। বিদ্যার দ্বারা মানুষের অন্তর আলোকিত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা মানুষের অন্তর বিকাশিত হয়।

বাংলা ভাষার অনুরুপ সংস্কৃত ভাষায় এ চার বিভক্তিকে বলা হয়:

বশ্যনর-তৈযস-প্রজ্ঞা-তূরিয়

হিন্দু ধর্মাচরণ এ চাতুবিভক্তি অনুসরন করে পরিচালিত হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এর প্রথম দুই বিভক্তিকে বিদ্যা এবং শেষের দুই বিভক্তিকে জ্ঞান রুপে বিচার বিবেচনা করে।

বিভু– তৈযস: প্রজ্ঞা– তূর্য

বৌদ্ধ ধর্মালম্বীরা অনুরুপভাবে প্রথম দুই বিভক্তিকে বিদ্যা এবং শেষের দুই বিভক্তিকে জ্ঞান রূপে আখ্যায়িত করে তাদের ধর্মাচারণে যথাযোগ্য রুপে বিদ্যা ও জ্ঞানকে ব্যবহার করে।

স্মরন করা যেতে পারে যে, মহান ধর্মগুলির ইহুদীধর্ম বা Judaism এবং খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যে উৎপত্তি ও বিকাশ প্রাথমিক স্তরে প্রাচ্যেই সংঘটিত হয়েছে। এগুলির প্রাচীন ঐতিহ্যে আমরা উপরে উল্লেখিত চর্তুস্তরে জীবনাচরণ দেখতে পাই। কিন্তু ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের মত ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মাচারণে বা জীবন যাপন প্রণালীতে চতুরস্তরীয় জ্ঞান বিভক্তির

CamScanner

সুস্পষ্ট ছক দেখতে পাইনা। তারা পর্থিব ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ ভিত্তিক যথাক্রমে Secular এবং Spiritual জনিত জ্ঞানের দুই বিভক্তির উপর সর্বাধিক জোর দিয়ে থাকে। এমনকি এ দুই বিভক্তিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে বিচার করার প্রয়াস পায়।

পক্ষান্তরে প্রাচ্যের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম জীবনাচরণে জ্ঞানের চতুর্বিভক্তি পরস্পর সংযুক্ত রুপে প্রতিভাত হয়, যথা মানুষের অনুভূতি স্বভাবত চিন্তা ও যুক্তিতে রুপায়িত হয় এবং যুক্তি বিদ্যা প্রজ্ঞার স্তরে পরিপুষ্ট হয় ও দিব্য জ্ঞানে চুড়ান্ত উৎকর্ষ লাভ করে। অতএব, আলোচ্য চারটি জ্ঞানের স্তর কোনভাবেই এসে অন্যের থেকে বিছিন্ন নয়। কিন্তু পাশ্চত্যের গ্রীক রোমান Seculor knowledge এবং Spiritual knowledge এক সাথে একই সূত্রে গ্রথিত নয়, বরং পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বিগত দুই হাজার বছরের গ্রীক ও রোমান ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের জ্ঞান চিন্তা 'secularism-spiritualism' dichotomy বা শ্রেণি বিভাজন এর চত্বরে নিপতিত হয়। তাতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের জ্ঞান চিন্তা মুসলিম হিন্দু বৌদ্ধদের জ্ঞানের প্রকরণের সমন্বিত চিন্তা থেকে পৃথক হয়ে যায়।

বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার জন্য পাশ্চত্যের জ্ঞানীয় ঐতিহ্যর পর্যালোচনা করা যাক। পাশ্চত্যের জ্ঞান চর্চা আরম্ভ হয় গ্রীস দ্বীপপুঞ্জে খ্রিস্ট পূর্ব ৬০০ অব্দের চত্বরে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ছাবিবশ শত বছর পূর্বে। তা অবশ্য গ্রীস দেশের সর্বত্র নয়, দু-একটি বড় সড় দ্বীপে, যেমন এথেন্স, স্পার্টা ইত্যাদি। গ্রীকদের জ্ঞান চর্চার প্ররম্ভ নৌপথে অধিকতর পুরাতন সভ্যতা ইরান, মিশর, মেসোপটোমিয়া, বেবীলন, এবং ইরানের জুন্দেশাপুরস্ত বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে। গ্রিক খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল। খাদ্যের অন্বেষণে গ্রীকরা সামুদ্রিক বাণিজ্যে দক্ষতা অর্জন করে। জুন্দশাপুরে তারা সম্ভবত ভারতীয় ও চীনদেশীয় জ্ঞানীগুণীদেরও সাক্ষাৎ পায়। ঐ সব সভ্যতায় জ্ঞান চর্চা আরো দুই তিন হাজার বছরের পুরাতন ছিল।

CS CamScanner

সে যাই হোক, প্রায় ২৬০০ বছর পূর্বে মাইলেটাস নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে চিন্তাবিদ থেলিস বিশ্বের উৎপত্তি চিন্তার পাশ ধরে জ্ঞান চর্চার সুচনা করেন এবং ৩০০ বছরের মধ্যে গ্রীকরা সাহিত্য, কলা, শরীরচর্চা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এবং বিশেষভাবে দর্শন চিন্তায় অভুতপূর্ব উন্নতি সাধন করে বিশ্বের ইতিহাসে দর্শন বা ফিলোসফীর শ্রেষ্ঠতম সক্রেটিস যুগের উন্মেষ ঘটায়।

মহাদার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, ও এ্যাসিটটল এর দর্শন চিন্তার মাধ্যমে গ্রীক দর্শন বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করে। সক্রেটিস এর যুক্তি দর্শন, প্লেটোর আকাশচুম্বী চিন্তাজ্ঞান এবং এ্যারিসটটলের যুক্তিবিদ্যা দুনিয়াব্যাপী গুণী সমাজ জ্ঞানালোকে অভিভূত করে। সক্রেটিক যুগের গ্রীক দর্শনের ভাবধারায় বিশ্বব্যাপী মানুষ জ্ঞানের নবনূতন আলোক ধারার সন্ধান পায়। এমনকি বিশ্বব্যাপী জ্ঞানীগুণী মানুষ এই ত্রিরত্নের শেষ জন এ্যারিসটটলকে প্রথম শিক্ষক নামে বরণ করে নেয়।

সক্রেটিস ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর (দুই হাজার চারশ বছরের পূর্বেকার) মহাজ্ঞানী চিন্তাবিদ। তার দু'টি কথা আমাদের আলোচ্য বিষয়। প্রথম কথাটি হল, তিনি বলেন: 'Knowledge is conceptual', অর্থাৎ 'জ্ঞানধারণামূলক'। আর দ্বিতীয় কথাটি হল 'know thyself' অর্থাৎ নিজেকে জানো', যেটিকে তিনি তাঁর মর্মবাণী রূপে উল্লেখ করেন। আলোচ্য প্রথম কথাটি বলে মহাজ্ঞানী সক্রেটস গ্রীস দেশের প্রথম দার্শনিক থেলিস থেকে আরম্ভ করে তার পূর্ববর্তী গ্রীকদের জ্ঞানীয় ঐতিহ্যের ভাবধারা ব্যক্ত করছিলেন। বিশেষত এ কথাটি তাঁর সমসাময়িক সফিস্টদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল।এর মমার্থ হল: আমরা যখন একটি জিনিস দেখি ও তার গুণাগুন অনুভব করি, তখন আমাদের মনে একটি ধরনার সৃষ্টি হয় এবং আমরা একটি ধারণাকে অন্য একটি বা একাধিক ধারণার সাথে সম্পর্কিত করে পরস্পর কথা বলি। যেমন 'আমি' একটি ধারণা, 'বাজার' একটি ধারণা, 'মাছ' একটি ধারণা, ধারণা তিনটিকে সর্ম্পযুক্ত করে বলা হয় আমি মাছ কিনতে বাজরে যাই। অতএব, আমাদের সমস্ত কথাবার্তা ধারণা মূলক এবং

এরূপ কথাবার্তার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব ব্যক্ত করি ও ভাবের আদান প্রদান করি, যা থেকে জ্ঞাণের উন্মেষ হয় ।তাই জ্ঞান হল ধারণা মূলক।

সক্রেটিসের শহর এথেন্স নগরীতে জ্ঞান সাধক সফিস্টরা ব্যবসা বানিজ্য, দর্শন, কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নাট্যকলা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছিল, যেমনটি আজকাল আমরা বাংলাদেশের শহরে নগরে কোচিং সেন্টারের ছাড়াছড়ি দেখে থাকি। এগুলি ছিল গ্রীকদের উন্নতি ও উন্নয়নের সোপান। এঁদের মধ্য থেকেই সক্রেটিসের উত্থান। তিনি সফিস্টদের সাধারন জ্ঞান এবং পেশাগত

দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র থেকে উর্ধ্বে সত্যজ্ঞান ও পরম সত্যের অনুসন্ধানের দিকে মানুষের দৃষ্টি আর্কষন করতে চেষ্টিত হন।

তার জীবনী পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সত্যজ্ঞান অনু সন্ধানের ক্ষেত্রে কোনো এক প্রকার অধ্যাত্মিক সাধনার নিমগ্ন হয়েছিলেন। তিনি বিগত বিংশ শতাব্দীর ভারতের মহাত্মা গান্ধীর মত একটি ইনার ভয়েসের (inner voice) কথা বলতেন এবং তার বক্তব্য ছিল, তিনি তাঁর ইনার ভয়েসের সায় পাওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন, সায় পেলেই কোন কাজে ব্যাপৃত হতেন। তিনি রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে লোক জমা করে বক্তৃতা দিতেন। তার সত্যসন্ধানী বক্তব্য-বক্তৃতার ধারায় গ্রীকদের দেবদেবী পূজার এবং নানা প্রকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম বিশ্বাসের অসারতা প্রতিপন্ন হয়। তদুপরি তিনি বিশ্বের একক প্রভুর দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তার জীবনের শেষ দিকে তিনি Conceptual knowledge এর সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেন, তা আমাদেরকে তার দ্বিতীয় কথায় উপনীত করে।

দ্বিতীয়ত তিনি প্রকৃত জ্ঞানকে অন্তরদৃষ্টির নিরিখে চিহ্নিত করে বলেনঃ know thingself, অর্থাৎ আত্নকে জানো। আত্ন জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আত্নজ্ঞান হল সাধনালব্ধ জ্ঞান। এতে সক্রেটিসের 'inner voice'-এর সন্ধান মিলে। অতঃপর তিনি আত্নজ্ঞান প্রতিষ্টা করার জন্য গ্রীক সমাজে

নৈতিকতার উন্মেষ ঘটানোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তিনি এতে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। পৌত্তলিকতা ভিত্তিক সনাতন গ্রীক ধর্মের বিরুদ্ধাচরন করে যুবক শ্রেণিকে বিপথগামী করার অভিযোগে তাঁকে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়। ফলে হেমলক বিষপানে বাধ্য করে তাঁর মৃত্যু দন্ড কার্যকর করা হয়।

সত্যের সন্ধানে এবং নৈতিকতার বিবেচনায় সক্রোটিসের ক্ষুরধার তর্ক-বিতর্কে, যুক্তিতত্ত্বের বীজ বপিত হয়, যা তার শিষ্য প্লেটো এবং প্লোটোর শিষ্য এ্যারিস্টটলের হাতে একটি পুর্ণাঙ্গ যুক্তিবিদ্যায় বিকশিত হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ্যারিসটটলের যুক্তি বিদ্যা বা র‍্যাশনালিজম পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ জ্ঞানের ধারক বাহক রূপে পরিগনিত হয়ে আসছে।

প্লেটো সক্রেটিসের ধারণা মূলক জ্ঞান এবং আত্নজ্ঞানকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে মানুষের জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্তি করেন, যথা particular ও universal অর্থাৎ ব্যষ্টিকএবং বিশ্বজনীন।

অর্থাৎ জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ায় আমরা এক একটি বস্তু দেখি; কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর একটি সামগ্রিক রূপ আছে, যা বিশ্বজনীন, যা দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। তাঁর মতে, প্রকৃতপক্ষে একক বস্তুগুলি বিশ্বজনীন বস্তুসামগ্রীর একটি বিশেষরূপের ধারণা, কল্পিত ধারণা, তথা idea রূপে চিত্রিত করেন এবং idea কে বিশ্লেশণ করার জন্য Nous (নাউস) শব্দের অবতারণা করেন Nous কে soul-এর অর্থে বুঝা যেতে পারে। তখন পর্যন্ত soul শব্দের উদ্ভব হয় নাই। তাই তিনি Nous শব্দ দ্বারা soul বা আত্মা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি এক প্রকার গভীর চিন্তার দার্শনিক প্রক্রিয়ায় Nous কে the idea of the Good অর্থাৎ মঙ্গলময় ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করে, বিশ্ব জগতে সর্বোচ্চ মঙ্গলময় ধারণা বা the idea of the Good থেকে বিশ্বের সব কিছুর উৎপত্তি প্রতিপন্ন করেন। idea মানে কল্পিত ধারণা, idea মানে কল্পিত ভালো, উত্তম, মঙ্গলময় ধারণা, সর্বোচ্চ মঙ্গলময় ধারণা, যা প্লেটোর 'The Good' ভাষায় বিশ্বসৃষ্টির একক উৎস ও পরম সত্য; তাই

CamScanner

প্লেটোর ভাবধারাকে বলা হয় idealism ভাববাদ। তিনি এ সব আবিস্কার করেছেন চিন্তার মাধ্যমে। তাই সক্রেটিসের আত্মজ্ঞান এবং inner voice-এর তিনি সন্ধান পাননি। আর পরিশব্দ Nous দ্বারা সক্রেটিসের আত্মা আত্মার সান্নিধ্যে তিনি উপনীত হতে পারেননি।

প্লেটোর শিষ্য এ্যারিসটটল, আত্মজ্ঞান ও Nous থেকে পূর্বতন গ্রীক ঐতিহ্যের conceptual knowledge বা ধারণা মূলক জ্ঞানের চত্বরে প্রত্যাবর্তন করে, বস্তুকে জানবার জন্য তাঁর বিশ্বপ্রসিদ্ধ সীলোলিজম-এর Logic বা যুক্তি বিদ্যার উদ্ভাবন করেন।

Syllogism মানে ন্যায় অনুমান, যুক্তি দেখানো। তা perception (অনুভূতি) থেকে আরম্ভ হয়, conception (ধারণা গঠনে) এ পরিপক্ক হয়। perception -এর অনুভূত বস্তুকে বলা হয় hercept এবং conception এর ধারণাটিকে বলা হয় concept; আর concept বা ধারণার চত্বরে যুক্তি প্রদর্শণের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে বলা সীলোজিজম। যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে যেহেতু এ জ্ঞানটি আয়ত্ব হয়, তাই এ জ্ঞানকে বলে যুক্তিলব্ধ বা reason থেকে rational জ্ঞান। আর এই সমগ্র প্রতিক্রিয়াকে বলে Rational বা যুক্তিবাদ।

এ যুক্তিবাদই গ্রীক সভ্যতার প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্যে সর্বোচ্চ জ্ঞান রূপে পরিচিত হয়ে আসছে। বর্তমান যুগে এক মাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই আধুনিক পাশ্চাত্যে র‍্যাশনালিজমকে অতিক্রম করার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছে।

অতএব প্রাচ্যের জ্ঞানীয় পরিমাপে পাশ্চাত্যের জ্ঞান প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান আধুনিক যুগ পর্যন্ত দুই প্রস্তে অবস্থিত, যথা পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতি percept বা এবং concept বা ধারণামূলক জ্ঞানের যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক rationalism পাশ্চাত্যের লোকেরা আজ পর্যন্ত প্রাচ্যের সত্যজ্ঞান এবং দিব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নয়।

CamScanner

পরিশিষ্টঃ ২

মাণ্ডুক্য শ্রুতির আলোকে আত্মতত্ত্ব বিচার

ড. ভুবন মহোন অধিকারী

উপোদ্‌ঘাত

অথর্ববেদীয় মাণ্ডূক্যশ্রুতি প্রণবতত্ত্বের আধারে আত্মতত্ত্ব নিরূপণে যে অপূর্ব মনীষা ও অলৌকিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছে, তা জগতে অতুলনীয়। যে সত্যের সন্ধানে আমরা বিশ্বজগৎ খুঁজে খুঁজে দিশেহারা হই, যে সত্যের আরাধনায় ধ্যানী জ্ঞানী, যোগী ঋষি, মুনি সাধক, তাত্ত্বিক দার্শনিক তথা সামাজিক, সর্বদা উন্মুখ, যে সত্যের ধ্যানে দর্শন, অধিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, অথর্ববেদীয় মান্ডূক্যশ্রুতি সে সত্যকে আমাদের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানের তথা অনুভবের গোচরীভূত করেছে।

শ্রুতি হচ্ছে পরব্রহ্ম বা পরতত্ত্ব স্বরূপ শুদ্ধ জ্ঞানরাশি। এ জ্ঞানরাশিই করূণা করে বাণীরূপে, নির্দেশরূপে নেমে এসেছে ভূমা থেকে, পরব্যোম থেকে ঋষির বোধিলোকে। তাই এ বানী ব্রহ্মময়ী বা ব্রহ্মের বাঙায় কায়স্বরূপ। কামধেনুর মত এ বানী সর্বদা ব্রহ্মকে, আত্মাকে দোহন করছে। সুতরাং শ্রুতির এ উদাত্ত বাণী সম্বন্ধে আর্য মনীষার বাঙায় প্রকাশ হচ্ছে,

গৌ গৌঃ কামদুঘা ব্রহ্মদুঘা গৌঃ
ব্রহ্মদুঘা গৌঃ সনা ব্রহ্মদুঘা গৌঃ।
ব্রহ্মদুঘা গৌঃ হা হা ব্রহ্মদুঘা গৌঃ
গৌ গৌঃ কামদুঘা গৌ।।
-চিরন্তনোক্তি, ব্যা. দ. ই, পৃষ্ঠা[১] ১।

প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যচারী ঋষিযুগ থেকে যুগযুগান্ত সঞ্চিত আর্যকৃষ্ঠির প্রজ্ঞানঘন রূপ হচ্ছে শ্রুতি। সুতরাং প্রাচ্যকে যদি জানতে হয়, দেশমাতাকে যদি চিনতে হয়, তবে শ্রুতির কথা অবশ্যই শুনতে হবে। শ্রুতি ছাড়া প্রাচ্যহৃদয়ের ঐতিহ্যপূর্ণ মণিকাঞ্চনের সুপ্রাচীন খনির তিমির গর্ভে প্রবেশের

CamScanner

অন্য উপায় নেই। প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণ যেখানে ব্যর্থ, তাকে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে শ্রুতি এবং এতেই শ্রুতির শ্রুতিত্ব। তাই মনীষিগণ বলেনঃ

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এবং বিদন্তি বেদন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।[২]

আর্য সভ্যতার উষালগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত অধ্যাত্ম সাধনায় প্রাচ্যমনীষা যে ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি সুসংহত, সুমার্জিত ঐক্য বিরাজমান। এ ঐক্য পরব্রহ্মনিঃশ্বসিত শ্রুতিশাসিত। শ্রুতি অপৌরুষেয় অনাদিনিধন বাগব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম।

শ্রুতি বা উপনিষদেও দার্শনিক প্রকাশ ব্রহ্মসূত্রে যারা আধুনিক নাম বেদান্ত দর্শন এবং সাহিত্যক প্রকাশনা শ্রীমদ্ ভগবদগীতায়। উপনিষদকে বলা হয় শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্রকে বলা হয় ন্যায় প্রস্থান এবং ভগবদগীতাকে বলা হয় স্মৃতিপ্রস্থান। সীমাহীন জীবন সমুদ্রে দিশেহারা জীবনের দিঙ্‌নির্ণায়ক ধ্রুবতারা এই উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা। জীবনের এই ত্রিভেদৈকগম্য ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রেখে জীবন সমুদ্র পার হয়ে গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করতে হয় বলে ইহাদিগকে বলা হয় প্রস্থানত্রয়ী।

গীতা অসমোর্ধ দার্শনিক সাহিত্য ও সনাতন ধর্মাবলম্বীর জীবনসংবিধান। ব্রহ্মসূত্র ভারতীয় দর্শনের শিরোরত্ন ও সর্বমান্য অধ্যাত্ম দর্শন। উপনিষদ ব্রহ্মসূত্র ও গীতা উভয়ের জননী, বুদ্বি নয়, বোধিপ্রসূত অপূর্ব অধ্যাত্ম শাস্ত্র। উপনিষদ[৩] পাঠ করে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার অমৃত পানে মুগ্ধ হয়ে পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত দার্শনিক Schopenhauer উচ্ছ্বাসের সাথে বলেছেন, সমগ্র বিশ্বে উপনিষদের মত কল্যাণকর ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলজনক স্বাধ্যায় আর কিছু নেই। ইহা আমার জীবনে দিয়েছে তৃপ্তি, মরনে দেবে শান্তি।

In the whole world there is no study so beneficial and so elavating as that of the Upanisads. It has been the

CamScanner

solace of my life, it will be the solace of my death.[8] - Arthur schopenhauer.

সমগ্র উপনিষদরাশি যে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে, যে অধ্যাত্ম বিদ্যার উপাসনায়, যে আত্ম তত্ত্বের সাধনায় সমাহিত, স্বল্পকায় মাণ্ডূক্যশ্রুতি সেই আত্মতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু। সুধার সমুদ্রে, হিরণ্ময় দ্বীপে, মণিখচিত মন্ডপে, রত্নবেদীতে, মাণিক্যের সিংহাসনে যেমন দেবী চন্ডী সমাসীন, তেমনি তত্ত্বদর্শী মাণ্ডূক্য ঋষি বেদসিন্ধুর অর্থব দ্বীপে, উপনিষদরূপ মনিমন্ডপে, মাণ্ডূক্যশ্রুতির রত্নবেদীতে, প্রণবের মনিমঞ্জুষায় দেবমুনীন্দ্রগূহ্য আত্মতত্ত্ব স্থাপন করেছেন। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ বলেন, একমাত্র মাণ্ডূক্য পাঠেই ব্রহ্মবিদ্যার জীবনস্বরূপ আত্মতত্ত্ব অবগত হয়ে কৈবল্যমুক্তি লাভ করা যায়। মুক্তিকোপনিষদের ঋষি সে কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

ইয়ং কৈবল্যমুক্তিস্তু, কেনোপায়েন সিধ্যতি।

মাণ্ডূক্যমেকমেবালং মুমূক্ষুণাং বিমুক্তয়ে।

- মুক্তিকোপনিষদ, মন্ত্রসংখ্যা[৫] ২৬।

মাণ্ডূক্যশ্রুতি ঔপনিষদিক আত্মতত্ত্বের নির্যাস স্বরূপ এবং এই আত্মতত্ত্বই অধ্যাত্ম সাধনার প্রাণ। আত্মতত্ত্ব না জানলে ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবৎ তত্ত্ব কিছুই জানা যায় না। তাই আর্য সভ্যতার প্রত্যুষে ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে "আত্মানং বিদ্বি"। আত্মাকে জান, নিজেকে চেন। শুধু প্রাচ্যে নয়, পাশ্চ্যত্যেও সেই একই উপলব্ধি "Know theyself' নিজেকে জান।

আধুনিক দর্শনের জনক পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ডেকার্ট আত্মার সন্ধান করতে গিয়ে বিশ্বজগতের সব কিছুকে সংশয় করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি সংশয়ের কর্তাকে আর সংশয় করতে পারলেন না। তখন তিনি সংশয়ের কর্তার মধ্যে আত্মার সন্ধান পেয়ে ঘোষণা করলেন, আমি চিন্তা করি। অতএব আমি আছি 'Je Pence donce Je sui[৬] তার সেই বিখ্যাত উক্তি।

স্বামী বিবেকানন্দও ঈশ্বরকে জানার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন এবং সর্বত্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছেও ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ঠাকুর রামকৃযের কাছে অসংকোচে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?" রামকৃষ্ণের প্রত্যুওরটি আরো স্পষ্ট। তিনি বললেন, "দেখিনি মানে? এই তোকে যা দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট করে দেখেছি এবং তোকেও দেখাতে পারি।" উত্তর শুনে বিবেকানন্দ স্তম্ভিত হলেন এবং সেদিন থেকে তার প্রকৃত সাধকজীবন আরম্ভ হল।

ঋষিগণ বলেছেন, শাস্ত্র লক্ষ্য নয়, লক্ষন মাত্র। সুতরাং শাস্ত্র দিয়ে আত্মাকে জানা যায় না। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" কঠ (১/২/২৩)।[৭] আত্মা শ্রুতি দ্বারা লভ্য নয়, মেধা দ্বারাও লভ্য নয়। আমি বিজ্ঞাতা, আমাকে আবার কে জানাবে? "বিজ্ঞাতারম অরে কেন বিজানীয়াৎ (বৃহারণ্যক উপনিষদ)।[৮] 'আমি আছি' এই অনুভূতিই সকল প্রমাণের শিরোমনি। ইহাই শাস্ত্রীয় ভাষায় "অহমস্মি ইত্যাদ্যনুভবাৎ।" অর্থাৎ আমি হই বা আছি এই অনুভব থেকেই আত্মার সাক্ষাৎ অস্তিত্ত্ব জানা যায়। তাই নৈয়ায়িকগণ বলেন "অহং প্রত্যয়বিষয়ত্বাদ্ আত্মা তাবৎ প্রত্যক্ষঃ।" ন্যায় বার্তিক (৩/১/১)।[৯] 'আমি' জ্ঞানের বিষয় বলে আত্মা প্রত্যক্ষ। সূর্যকে যেমন হেরিকেন বা টর্চ দিয়ে দেখান দরকার পড়ে না বা দেখান যায় না, আত্মাও তেমনি স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃসিদ্ব, নিত্যবস্তু। আত্মার আলোকেই সব কিছু প্রকাশ পাচ্ছে।"তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" -কঠ (২/২/১৫)।[১০]

মুণ্ডক শ্রুতির প্রথমেই (১/১/৩) গৃহস্থপ্রদান শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট সর্বজীবের জিজ্ঞাসা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। শৌনক জিজ্ঞাসা করেছেন, হে ভগবান, কী জানলে সমস্ত কিছুই জানা হয়। অথাৎ জীব মাত্রেরই একমাএ জ্ঞাতব্য পরম বিষয়টি কী?

শৌনকো হবৈ মহাশালো অঙ্গিরসং বিধিবৎ উপসন্নঃ পপ্রচ্ছ, কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি ইতি?[১১]

CS CamScanner

এই সর্বজীবের পরম জ্ঞাতব্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বীয় ভার্যা মৈত্রেয়ীর এক প্রশ্নে। মৈত্রেয়ীর সেই বিখ্যাত প্রশ্নটি হচ্ছে, যা দিয়ে আমি অমর হব না, তা দিয়ে আমি কী করবো? আপনি অমৃতত্ব সম্বন্ধে যা জানেন, তাই আমাকে বলুন।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যেনাহং নামৃতা স্যাং কিম অহং তেন কুর্যাম্? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রুহীতি। (৪/৫/৪)।[১২]

তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, হে মৈত্রেয়ী, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য। এই আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করে জানালেই সব কিছু জানা হয়।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ মৈত্রয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদতম।

ব্রহ্ম, ভগবান বা পরমাত্মাকে জানতে হলেও প্রত্যগাত্মার মধ্য দিয়েই অর্থ্যাৎ স্বীয় আত্মার বা নিজের মধ্য দিয়ে জানতে হবে। কারন, ব্রহ্ম, ভগবান বা পরমাত্মা প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। প্রত্যক্ষের বিষয় হচ্ছে জীবাত্মা। তাই উদয়নাচার্য তার বিখ্যাত কিরণাবলী গ্রন্থে বলেছেন, "যথা পরাত্মা অনুমীয়তে, তথা প্রত্যক্ষতো হ'প্যহংপ্রত্যয়েন আত্মা বিষয়ীক্রিয়তে।"[১৪] অথাৎ যেমন পরমাত্মা অনুমিত হয়, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে 'আমি' জ্ঞান দ্বারা আত্মা বা জীবাত্ম প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। আর ঈশ্বরকে যে চোখে দেখা যায় না, তা গীতায় ভগবান নিজেই অর্জুনকে বলেছেন, তুমি আমাকে চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে সমর্থ হবে না। আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করেছি, সে চোখ দিয়ে আমাকে দেখ। ইহাই গীতার ভাষায়ঃ

> ন তু মাং শক্যতে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
> দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃপশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।[১৫] (১১/৮)

চক্ষুর মণিবিন্দু যেমন জগৎ দর্শনের হেতু, তেমনি আত্মদর্শনই সমস্ত সাধন রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। আত্মদর্শন ছাড়া যোগ, ধ্যান, জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত সাধনাই

CamScanner

অর্থহীন। তাই মুন্ডুকোপনিষদের ঋষি বলেছেন, অন্য কথা বাদ দিয়ে অমৃতের সেতু সেই একমাত্র আত্মাকেই জান। ইহহি মুন্ডুকের ভাষায়ঃ

তমেবৈকং জামনথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।[১৬] (২/২/৫)

উপনিষদের এ বাণী পরব্যোম বা বোধিলোকের বানী কেন? ঐপনিষদিক চিন্তা শ্রেষ্ঠ কেন? কী সত্য নিহিত বা কী মাধুরী লুকানো রয়েছে উপনিষদ মন্ত্রে? এ বাণীর এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কেন? এ বাণী শ্রেষ্ঠ কেন? এভাবে আমরা সে বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করব।

আমরা জলকে কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিন আকারে দেখতে পাই। তা বরফ, জল ও ধোঁয়ার আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। বাষ্প আর সূক্ষ আকার ধারন করলে তা আর দেখাই যায় না। উত্তাপের তারতম্যে বস্তুর এই যে বিভিন্ন মায়াময় আকার ধারণ, এদের মধ্যে তার প্রকৃত আকার কোনটি? জগতের সব পদার্থই তো এমনি মায়াময় বা পরিবর্তনশীল। এ জন্যই এর নাম জগৎ বা সংসার। একে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয় মায়া।

আর একটি ব্যাপার হচ্ছে আমরা যে ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে জগৎ দেখছি, সে ইন্দ্রিয়ের রঙেই তো রঙিন চশমায় কোন কিছু দেখার ন্যায়, অরূপবস্তু রূপময় হয়ে উঠছে। তাই কোন কিছু ভালো করে দেখতে হলে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখলে চলবে না।

ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা তো বস্তুর অপমান করা। তা দেখতে হবে ইন্দ্রিয়ের চশমা খুলে রেখে শুদ্ধ জ্ঞাননেত্রে। এ জ্ঞাননেত্রের নামান্তরই দিব্যচক্ষু। দীক্ষা মন্ত্রের সময় গুরু শিষ্যকে এই দিব্যচক্ষু দান করেন। অজ্ঞান রূপ তিমির রোগে অন্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞান রূপ কাজলের শলাকা দ্বারা যিনি চক্ষু উন্মীলিত করে বা খুলে দেন তিনিই গুরু, তাকে নমষ্কার। ইহাই গুরু প্রনামের মন্ত্র। মন্ত্রটির ভাষা নিম্নরূপঃ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।[১৭]

আত্মা নিজে জ্ঞানময় এবং তাকে দেখতেও হবে জ্ঞাননেত্রে। বাইরের মায়াময় রূপ নয়, ভিতরের স্বরূপ, যা কান্টের ভাষায় "the thing as it is in itself." সেই স্বরূপ দেখাই প্রকৃত দর্শন বা তত্ত্বদর্শন। তত্ত্বের দৃষ্টিতে ঋষি জলকে দেখেছেন 'জ্যোতি, রস, অমৃত, ব্রহ্ম, ভূ, ভুব, স্বঃ, ওম' রূপে। তাই ঋষি বলেছেন, "আপো জ্যোতিঃ রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃস্বরোম্।' শান্ডিল্য ঋষি বস্তুর মায়াময় রূপ বা অবভাস অতিক্রম করে স্বরূপ দর্শন করেই বলেছেন, 'সর্বং খলিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।' (ছা.৩.১৪.১.)। এইরূপে দিব্য কর্ণে শ্রবণ করলেই শব্দের 'ভদ্র' বা ভাল অর্থাৎ সর্বোত্তম (the thing as it is in itself) রূপটি শ্রবন করা যায় এবং দিব্য নেত্রে দেখলে 'ভদ্র' বা ভালো অর্থাৎ সর্বোত্তম (the thing as it is in itself) রূপটি দর্শন করা যায়। তাই অথর্ববেদীয় মাণ্ডূক্য শ্রুতির শান্তি মন্ত্রে ঋষির প্রার্থনা, হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণে ভদ্র শ্রবণ করি। হে যজনীয়গণ, আমরা যেন নয়নে ভদ্র দর্শন করি। দৃঢ় প্রত্যঙ্গযুক্ত দেহে স্তব করে আমরা যেন ঈশ্বরবিহিত যে আয়ুষ্কাল তা ভোগ করি। ইহাই অর্থবেদীয় মাণ্ডূক্য উপনিষেদের শান্তি মন্ত্রেও ভাষায়ঃ

ও ভ দ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভ দ্রং পশ্যেমাক্ষতির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈ রঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসঃ তন্বীভর্
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।[১৮]

ঋষির প্রার্থণা পরম করুনাময়ের অনুগ্রহে আমরা দৃঢ় শরীরে সমগ্র আয়ুষ্কাল যেন ভালো দেখি, ভালো শুনি। অর্থাৎ নীরোগ দেহে সমগ্র জীবন যেন চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে ঈশ্বরের মঙ্গলময়, কল্যানকর রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সম্ভোগ করি। আমার প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেন সর্বদা দিব্য আনন্দ উপভোগ করে। আমি যেন লোকোত্তর আনন্দে মগ্ন থাকি। বৈষয়ীক আনন্দ নয়, দিব্য আনন্দ-আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ঐশ্বরিক আনন্দ। এই যে বিষয়ানন্দ তাও সেই দিব্য আনন্দেরই অংশ বা ছিটে ফোঁটা মাত্র। 'অথাত্র বিষয়ানন্দো

CamScanner

ব্রহ্মানন্দাংশল্দপভাক।'[১৯] ব্রহ্মানন্দ সিন্ধু, আর বিষয়ানন্দ তারই বিন্দু বা ক্ষুদ্র একটি কণা মাত্র। বিষয়ানন্দ মলিন; আত্মনন্দ, ব্রহ্মনন্দ, ঐশ্বরিক আনন্দ সুনির্মল।

যিনি সেই অলৌকিক আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন, তিনি আর ক্ষুদ্র, মলিন ও কলহশঙ্কুল লৌকিক বিষয়ানন্দে ব্যাপৃত থাকতে চান না। শান্তিমন্ত্রে ঋষির প্রার্থনায় আমরা সেই আত্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ভগবদানন্দ লাভ করতে চাই। এ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে আর কোনো দুঃখ স্পর্শ করতে পারে না। যিনি আত্মবিৎ, তিনি শোক উত্তীর্ণ হন। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ।' আত্মতত্ত্ব জেনে আত্মার গভীরতম রাজ্যে প্রবেশ করলে, আমরা কর্ণে ভদ্র শ্রবণ করি, নয়নে ভদ্র দর্শন করি। বৈদিক ঋষি আত্মার সেই আনন্দলোকে প্রবেশ করে জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে সর্বত্র মধুর সিঞ্চন দেখতে পেয়ে আনন্দে বলে উঠলেন,-

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির মধুমা অস্তু সূর্যঃ
মাধীর্গাবো ভবন্তু নঃ।। ---ঋক্ সংহিতা (১।৯০।৬-৮)।[২০]

জীবের জীবন সীমাহীন দুঃখ পরিপূর্ণ। সেই দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ত্রিতাপদগ্ধ জীবনকে যদি কেউ চির মধুময় করতে পারে, যদি কেউ ক্রমবর্ধমান উচ্ছ্বাসময় আনন্দোচ্ছল করতে পারে, তার চেয়ে মর জীবের আর বেশি কি চাওয়া বা পাওয়া থাকতে পারে? এই জন্যই উপনিষদের বাণী শ্রেষ্ঠ। উপনিষদ এ হেন বাণীর খনি। এ কারণেই উপনিষদমন্ত্রের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

শুধু বৈদিক ঋষি নন, লৌকিক ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ও ধ্যানতন্ময়তায় আত্মনন্দের তুরীয় লোক প্রবেশ করে ভূলোক, দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত মূর্তিমান

CamScanner

আনন্দ দেখতে পেয়ে জীবনকে সুধায় পূর্ণ করলেন। তাই তিনিও আনন্দোচ্ছল ভাষায় বলে উঠলেনঃ

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভুলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজ টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।
চেতনা আমার কল্যাণ রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।[২১] - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈদিক ঋষির ধ্যানপ্রাপ্ত ঋকমন্ত্রের ন্যায় কবির এ বাণীও বোধিলোকের। উহা বৈখরী বাক নয়, পরা বাক্। বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যন্তীর স্তর অতিক্রম করে অপপায়িনী পরা বাকের দেশ ব্রহ্মলোকে তাই এ বা নী ব্রহ্মময়ী। এবাণী ব্রহ্মলোকে বা বোধিলোকে আত্মার তুরীয় স্তরে অবস্থিত। বৈখরী, মধ্যমা ও পশ্যন্তীর ন্যায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির স্তর পেরিয়ে এসে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্য দিয়ে আত্মার তুরীয় স্তরে শান্তির রাজ্য বোধিলোকে প্রবেশ করতে হয়। এ রাজ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় একাকার হয়ে আছে। ইহাই অদ্বৈতের দেশ। তাই এ দেশে জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব বা কর্তৃত্ব বোধ আর থাকে না। মনে হয় যেন বাণী নিষ্ক্রিয়ভাবে না থেকে নিজে নিজেই বেরিয়ে আসছে। তাই কবিগুরু কবিতা সম্বন্ধ বলেছেন, 'কিছু একটি বুঝাইবার জন্য তো কেহ কবিতা লেখে না, হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিবার চেষ্টা করে। কবিতা চোখের জল ও মুখের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র।'

ব্রহ্মাস্বাদস্বরূপ অদ্বৈতের তুরীর স্বরটিকে ভালো করে চেনার জন্য তার পূর্ববর্তী সাহিত্যের 'পরব্রহ্মস্বাদসচিব' সুষুপ্তির রাজ্যটি আরেকটু স্পষ্ট করা

দরকার। চিত্রা কারো বোধিলোকের দ্বারদেশে সুষুপ্তিস্থানে উপবিষ্ট এই দেশকালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন অনিমেষমূর্তি কাব্যলক্ষ্মীয় বর্ণনায় কবি বলেছেন,

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি-
তুমি অচপল দামিনী। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[২২]

সাহিত্য দ্বৈতের রাজ্য। 'একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি' বলে কবি সেই সুষুপ্তিস্থ দ্বৈতের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই স্তর পেরিয়ে অদ্বৈতের রাজ্যে অধ্যাত্মসাধনার তুরীয় লোকে রসের ঘনীভূত স্তর ব্রহ্মাস্বাদ বা আনন্দলোক। এ আনন্দলোকে সত্যসুন্দরের রাজ্যে কি করে প্রবেশ করতে হয় এখন তাই বিবেচ্য। সুতরাং এ বারের সাক্ষাৎ মাণ্ডূক্য শ্রুত্যুক্ত আত্মতত্ত্বে প্রবেশ করা যাক।

আত্মতত্ত্ব বিচার:

মাণ্ডূক্য ঋষি বলেছেন 'ওম্' এই অক্ষরটিই এ জগতের সব কিছু। তার ব্যাখ্যা হচ্ছে- অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই ওঙ্কার, অন্য যা কিছু ত্রিকালাতীত তাও ওঙ্কারই। ইহাই মাণ্ডূক্য শ্রুতির ভাষায়-

ওমিত্যেতক্ষরমিদং সর্বং, তস্যোপব্যাখ্যানম- ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এর যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।।১।।[২৩]

ওম্ ব্রহ্মস্বরূপ। ওমের প্রকাশ এই চরাচর জগৎ। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ ওঙ্কারই জগতের সব। ওঙ্কার ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অদ্বৈত বেদান্ত মতে জগৎ ব্রহ্মে বিবর্তিত বা অধ্যস্ত। তুরীর ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, প্রপঞ্চোপশম। ইহা আত্মার চতুর্থ পাদ। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম বা শরীর। ব্রহ্মের এই শরীর মায়াময়। অতএব ইনি সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। মাণ্ডূক্য মতে ইহা আত্মার তৃতীয় পাদ। তুরীয় ব্রহ্ম মায়াঅনুপহিত শুদ্ধ চৈতন্য। ঈশ্বর সমষ্টি মায়া-উপহিত শুদ্ধ (সত্ত্বপ্রধান) চৈতন্য। ত্রিকালে

CamScanner

যা আছে তা ওঙ্কার, যা ত্রিকালাতীত তাও ওঙ্কার। সুতরাং ওঙ্কার সর্বব্যাপক। কারণ, কালে স্থিতই হোক, আর কালজয়ীই হোক, ওমের বাইরে আর কিছুই নেই। সবই ওঙ্কার।

কোনো কোনো মতে, ওম্ এই অক্ষরটি ব্রহ্মের বাচক শব্দ বা নাম এবং ব্রহ্ম ওমের বাচ্য বা নামী। 'ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোহভিধানাং নেদিষ্ঠম্'। কিন্তু মাণ্ডূক্য মতে, যেহেতু সবই ওঙ্কার, সুতরাং বাচক ও বাচ্য বা নাম ও নামী অভিন্ন। যেমন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে বাক্ ও ব্রহ্ম অভিন্ন। 'বাগ বৈ ব্রহ্ম' (৪।১।২)।[২৪] ভক্তি শাস্ত্রে 'দেহ দেহী, নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ' চৈ. চ. (২।১৭।৫)। আচার্য শঙ্করের মতে, সত্তা ও বোধ একার্থক। 'সত্তা এব বোধঃ, বোধ চ সত্ত্বা'। পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল বলেন, যা বাস্তব তা বৌদ্ধক, যা বৌদ্ধিক তা বাস্তব। 'Whatcver is real is rational and whatever is rational is real'[২৫] 'অথবা নাম নামীয় অভিন্নতা হেতু নামচিন্তামনি এবং চিন্ময়রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ উভয়ই পূর্ণ, অবিকারী ও নিত্য মায়ামুক্ত বা উভয়ই এক ও অভিন্ন। ইহাই বিষ্ণুধর্মোত্তরের ২৬৯ অঙ্কধৃত শ্রুতিসুখকর ভাষায়:

> নামচিন্তামনিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ
> পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো' ভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।[২৬]

জগৎ মায়াময়। কারণ, জগতের রূপটি মায়িক। প্রতি মুহূর্তে গতিশীল বা বিবর্তিত হচ্ছে বলে এর নাম জগৎ। কিন্তু রূপত মায়িক হলেও স্বরূপত জগৎ ও ব্রহ্ম একই। 'আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব' (১।৪।১৭ বৃউ.)। মায়িক জগৎ সৃষ্টি করে তার ভিতরে তিনিই প্রবিষ্ট আছেন। 'তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। ব্রহ্ম জগতে এমনভাবে প্রবিষ্ট যে, রূপত জগদভ্রম হলেও স্বরূপত তা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেছে 'সর্বং খল্বিদং তজ্জলানিতি' (৩।১৪।১)।[২৭] ঠিক অনুরূপ কথাই রয়েছে আমাদের মাণ্ডূক্য উপনিষদে। মাণ্ডূক্য ঋষি বলেছেন, এই সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। 'সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম'। বাইরের মায়িক রূপের ভিতরে যা আছে, তা আত্মা এবং তাও

CamScanner

ব্রহ্ম। মায়ার আবরণে আবৃত যে আত্মা, তার নাম আমি বা প্রত্যগাত্মা। আত্মার চারটি পাদ বা স্তর আছে। এ কথাগুলোই মাণ্ডুক্য শ্রুতির ভাষায়ঃ

সর্বং হ্যেতদব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সো'য়মাত্মা চতুষ্পাৎ।[২৮]২

আত্মার চারটি পাদ বা স্তর হচ্ছে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। এদের মধ্যে প্রথম তিন স্তরে আত্মা মায়াযুক্ত, চতুর্থ স্তরে আত্মা মায়ামুক্ত। ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে মায়া দ্বিবিধ। ব্যষ্টি মায়াযুক্ত আত্মা জীব এবং সমষ্টি মায়াযুক্ত আত্মা ঈশ্বর। আর মায়ামুক্ত আত্মা তুরীয় বা নির্গুণ ব্রহ্ম। বস্তুর ব্যস্ত, সমস্ত এবং মুক্ত আত্মায় আর ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। যা, ব্যষ্টি মায়াযুক্ত আত্মা বা জীবকে যথাক্রমে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞা বলা হয়। পক্ষান্তরে, সমষ্টি মায়াযুক্ত আত্ম বা ঈশ্বরকে বিরাট বা বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা এবং কারণ বা ঈশ্বর বলা হয়। এই মায়া হচ্ছে আত্মা বা ব্রহ্মের উপাধি। উপাধি বিহীন আত্মাকে বলা হয় তুরীয় বা নির্গুণ ব্রহ্ম। এ সম্বন্ধে সমষ্টি পক্ষে ভাগবতের (১২।২৫।১৬) টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেছেনঃ

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ
ঈশস্য যৎ ত্রিভিহীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে।।[২৯]

আত্মার জাগ্রদবস্থায় প্রধানত অন্নময় কোষ বা পাঞ্চ ভৌতিক স্থুল শরীর, স্বপ্নাবস্থায় প্রধানত জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়ারূপ বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষত্রয় বা একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, বুদ্ধি ও অহংকারযুক্ত সূক্ষ্ম শরীর এবং সুষুপ্ত অবস্থায় আনন্দময় কোষ বা প্রকৃতিযুক্ত কারণ শরীর- এ তিনটি শরীর বা উপাধি রয়েছে। আর তুরীয় অবস্থায় আত্মা শরীর শূন্য বা উপাধিহীনভাবে বর্তমান। অত্মা উপাধিযুক্ত হলেও উপাধি বা মায়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তাই ভাগবত (১।১১।৩৪) বলেছেনঃ

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদগুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।[৩০]

অর্থাৎ ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বত্ব যে, প্রকৃতিতে থেকেও ঈশ্বর কখনো প্রকৃতির গুণে যুক্ত হন না। ঈশ্বরাশ্রিত বুদ্ধিও তেমনি শরীরস্থ হয়েও শরীরের

CamScanner

গুণ বা মনের ধর্ম ইচ্ছাদ্বেষ, সুখদুঃখাদিতে জড়িত হয় না। এ বুদ্ধি পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, অথচ গায় পাঁক বা কাদা লাগে না। অর্থাৎ ঈশ্বরাশ্রিত বুদ্ধিতে মানুষ কর্ম করেও সুখদুঃখ বিজড়িত কর্মের ফলে আবদ্ধ হয় না। সে সর্বত্র ঈশ্বরের মঙ্গলময়, কল্যাণকর রূপরসাদি অনুভব করে, সম্ভোগ করে, আস্বাদন করে। সে দেখে, যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সবই আনন্দময়। 'আনন্দরূপমমৃতং যুদ্বিভাতি'। কি উপায়ে এ বুদ্ধিযোগ লাভ করা যায়, মাণ্ডূক্যশ্রুতি আত্মার স্তর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সে পথের নির্দেশ দিচ্ছে।

আত্মার জাগৎ অবস্থা

এবারে মাণ্ডূক্যের সেই উপদেশ শ্রবণ করা যাক। আত্মার চারটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তরে অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় আত্মা পঞ্চ কোষের আবরণে আবৃত বা ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে অবস্থিত। জীবাত্মার এ স্তরের নাম 'জাগরিত স্থান'। জাগরিত বা জাগরণ যার স্থান বা বিচরণ ক্ষেত্র, তাকেই জাগরিত স্থান বলা হয়। এ অবস্থাকেই আমরা চেতন বা জাগ্রৎ অবস্থা বলি। নিদ্রার প্রাচীর দ্বারা জাগরিত স্থান সম্পূর্ণ পৃথককৃত। অর্থাৎ আমরা যখন জেগে থাকি তখন জেগেই থাকি, ঘুমাই না। আবার যখন ঘুমাই, তখন আর জেগে থাকি না। তাই নিদ্রার স্তর আর জাগরণের স্থার জীবাত্মার সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থা।

জাগ্রদবস্থায় জীবকূল দেহসর্বস্ব। কিন্তু নিদ্রায় জীবকূলের দেহবোধ থাকে না। তখন সে মনোরাজ্যে, কল্পলোকে বাস করে। স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মার যে শরীর, তা সূক্ষ্ম শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের অভ্যন্তরে সুষুপ্তির স্তরে রয়েছে কারণ শরীর। অনুরূপভাবে ধ্যানের দ্বারা সাধকের এক একটি শরীর অপসৃত হয়। স্বপ্নাবস্থা এমন যে ইহাতে এক ব্যক্তি দেখতে দেখতে অন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়। আমরা স্বপ্নের উড়ে বেড়াই। মন অনিয়ন্ত্রিতভাবে যা কল্পনা করে, তাই ঘটতে থাকে। কিন্তু জাগরণে এসব অলৌকিক কাজ কর্ম বা অঘটন ঘটন অসম্ভব। জীবকূল নিদ্রায় নিষ্ক্রিয় বা Passive, কিন্তু জাগরণে জীবের

ইচ্ছাশক্তিটি প্রকট থাকে বলেই অহংবোধ বা আমিত্বের বিকাশ ঘটে। এই অংহবোধই জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব (personality)। কিন্তু নিদ্রায় কর্তৃত্বাদি অপসৃত হয়। তখন জীবের উপরে কর্তৃত্ব করে নিদ্রাদেবী, মায়া বা যোগমায়া।

বিজলির সুইচ অন করলে যেমন বাল্বগুলো জ্বলে ওঠে, পাখা ঘোরে, মেশিন চলে, তেমনি জাগরণে জীবের মস্তিষ্কস্থ, স্নায়বিক ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দর্শন শ্রবণাদি নিজ নিজ ক্রিয়া ব্যক্ত করে। তাই জীব এই জাগ্রদবস্থার গৌরবেই গৌরবান্বিত। জীবের আহার বিহার, লম্ফঝম্প, শিক্ষাদীক্ষা, চলাবলা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ-কর্ম এই জাগ্রদবস্থায়ই সম্পন্ন হয়। তাই জীবকে বলা চলে জাগরণসর্বস্ব।

জীবের ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব এই দেহযন্ত্রের সাথেই সম্পৃক্ত। নিদ্রায় দেহবোধ থাকে না বলে ব্যক্তিত্বও থাকে না। তখন সে নিদ্রাদেবীর হাতের পুতুল। জীবের ইন্দ্রিয়গুলো বর্হিমুখ করেই সৃষ্ট। তাই জাগরণে সে বহির্জগৎই দেখে, অন্তরাত্মা বা অন্তর রাজ্য দেখে না। এ জন্য জাগ্রতবস্থায় জীবকূল বহিঃপ্রজ্ঞ। জীবের প্রজ্ঞা হচ্ছে একটি সন্ধানী আলো বা Search light। এটিকে অন্তর্মুখী করতে না পারলে আত্মদর্শন অসম্ভব। আত্মদর্শনের জন্য ধ্যান জাগরণের মধ্যে দিয়েই স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়। স্বপ্নের রাজ্য অতিক্রম করলে দেখা যায় সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে আত্মা সুষুপ্তির দেশে চুপচাপ বসে আছে। কিন্তু এখানেও তার দ্বৈত ভাব লোপ পায়নি। এর পরবর্তী তুরীয় স্তরে আত্মা একাকী অদ্বয়ের জগতে অবস্থান করছে।

জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা 'স্থুলভুক'। অর্থাৎ এ অবস্থায় জীবকূল ইন্দ্রিয় দিয়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধময় বহির্জগৎ বা জাগতিক বিষয় ভোগ করে। আত্মা সর্বদা অসঙ্গ বা নির্লিপ্ত। তাই শ্রুতি বলেছে, 'অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ'।[৩১] তথাপি সান্নিধ্যবশত প্রকৃতির গুণ আত্মায় উপচরিত হয়। অর্থাৎ স্বচ্ছ কাচের কাছে জবাফুল রাখলে যেমন স্বচ্ছ কাচটিই ফুলের সান্নিধ্যে লাল হয়ে ওঠে, তেমনি নির্লিপ্ত বা অকর্তা, অভোক্তা আত্মাও প্রকৃতির সান্নিধ্যে

কর্তা ও ভোক্তা হয়ে পড়ে। তাই কঠোপণিষদ (১।৩।৪) বলেছে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা বলা হয়। 'আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ'।[৩২]

মাণ্ডূক্য শ্রুতি জাগ্রদাত্মাকে বলেছে 'বৈশ্বানের'। বিশ্ব বা সমগ্র নরে অর্থাৎ নরোপলক্ষিত সমষ্টি জীবে যে আত্মা বিরাজমান, তিনি বৈশ্বানর। তৈজস ও প্রাজ্ঞের উল্লেখে বোঝা যায় মাণ্ডূক্য ঋষি ব্যষ্টি জীবাত্মা বিশ্বের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বর পক্ষীয় সমষ্টি জীবাত্মা বৈশ্বানরের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কারণ, এখানে এই স্থুল ব্যষ্টি-সমষ্টি ও তদুপহিত বিশ্ববৈশ্বানরের বনবৃক্ষবৎ এবং তদুপহিত আকাশবৎ অথবা জল জলাশয়বৎ ও তদ্গত প্রতিবিম্বাকাশবৎ অভিন্নতা প্রতিপাদিত হচ্ছে। ইহাই সদানন্দকৃত বেদান্তসারের ভাষায়ঃ

অত্রাপ্যনেয়োঃস্থুলব্যষ্টি সমষ্টোস্তদুপহিতয়োঃ বিশ্ববৈশ্বানরয়োশ্চ বনবৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ, জলজলাশয়বৎ তদ্গত প্রতি বিম্বাকাশবচ্চ বা পূর্ববদভেদঃ।[৩৩] বেদান্তসার, পৃষ্ঠা ১২৩।

এই বৈশ্বানর আত্মার সাতটি অঙ্গ। সুতেজা বা দ্যুলোক হচ্ছে বৈশ্বানরের মস্তক, বিশ্বরূপ বা সূর্য অর্থাৎ অগ্নি ইহার চক্ষু, পৃথসবর্ত্মাত্মা বা বায়ু ইহার প্রাণ, বহুল বা আকাশ ইহার উর্ধ্ব দেহকাণ্ড, রয়ি বা জল হচ্ছে নিম্ন দেহকাণ্ড, পৃথিবী হচ্ছে পদদ্বয় এবং অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অঙ্গসমূহ বৈশ্বানর আত্মার বক্ষমুখাদি প্রতঙ্গ। ইহাই ছান্দোগ্য (৫।১৮।২) মন্ত্রের ভাষায়:

তস্য হ বা এতস্য আত্মানো বৈশ্বানরস্য মূর্ধের সুতেজা, শ্চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ, প্রাণঃ পৃথগবর্ত্মাত্মা, সন্দেহো বহুলো, বস্তিরের রয়িঃ, পৃথিব্যের পাদাবুর এব বেদিঃ, লোমানি বহিঃ হৃদয় গার্হপত্যো, মনোন্বাহার্যপাচনঃ, আস্যমাহবনীয়ঃ।[৩৪]

এখানে লক্ষণীয় এই যে, পঞ্চ মহাভূত দ্যুলোক এবং যজ্ঞ ইহারা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টি স্থূল শরীর-উপহিত চৈতন্যরূপী বৈশ্বানরের সাতটি অঙ্গ।

CamScanner

একটি মাত্র অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অঙ্গ হেতু শেষোক্ত পাঁচটিকে বৈশ্বানরের সপ্তম অঙ্গ হিসেবে নির্ণয় করা হয়েছে। এই যজ্ঞই বিষ্ণু বা ঈশ্বর। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' 'ইতি শ্রুতে র্যজ্ঞ ইশ্বরঃ'। --শঙ্কর। এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে পঞ্চ মহাভূত মায়িক এবং দ্যুলোক ও যজ্ঞ চিন্ময়। অতএব, মায়িক ও চিন্ময় উভয়ই বৈশ্বানরের অঙ্গ। অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মা সগুণ বা মায়োপহিত চৈতন্য।

সমষ্টি শরীরোপহিত চৈতন্য বৈশ্বানরের বা ব্যষ্টি শরীর-উপহিত চৈতন্য বিশ্বের উনিশটি মুখ আছে। ইহারা হচ্ছে চতুর্দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বায়ু। চতুর্দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক; পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়- বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং চারটি অন্তরেন্দ্রিয়- মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। আর বায়ু পঞ্চক হচ্ছে- নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। জাগ্রদবস্থায় পত্যগাত্মা এই উনিশ মুখে বিষয় ভোগ করে এবং স্বরূপত নিরাসক্ত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব আত্মা প্রকৃতির সান্নিধ্য হেতু কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বে জড়িত হয়ে বদ্ধ হয়ে পড়ে। সমষ্টি স্থুল ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টি স্থূল শরীর উপহিত বৈশ্বানর বা ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি স্থুল শরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্ব বা জীব যে অভিন্ন, অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর যে একই, ঈশ্বর ও জীবের উপাধি যে কল্পিত সে সম্বন্ধে পঞ্চদশী বলেছে, 'ঈশ্বরত্বঞ্চজীবত্বম্ উপাধিদ্বয় কল্পিতম্'।[৩৫] মাণ্ডূক্যশ্রুতি তার তৃতীয় মন্ত্রে অতি সংক্ষেপে এই অভিন্ন জীবশ্বরস্বরূপ জাগ্রদত্মার পরিচয় দিয়েছে।

জাগিরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থুলভূগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ।[৩৬] ।।৩।।

পোস্টডকটোরাল থিসিসের জন্য পরিকল্পিত সমগ্র প্রবন্ধের ইহা একটি অংশবিশেষ। উপোদঘাত বা ভূমিকা অংশটিকে পৃথক করে দেখায় তা অনেকটা বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। সমগ্র প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে আত্মতত্ত্ব। কিন্তু দ্বাদশ মন্ত্রাত্মিকা খর্বকায়া মাণ্ডূক্য শ্রুতিকে কেন্দ্র করেই বিষয়টি আলোচিত হবে। কারণ, উচ্চতর গবেষণার বিষয়বস্তুটি গভীর নলকূপের ন্যায় অতলস্পর্শী হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

CamScanner

মাণ্ডূক্য শ্রুতির সাথে প্রাচীন দ্বাদশ উপনিষদ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আর সেই উপনিষদসমূহকে সমন্বিত করেই ভারতমনীষার প্রাণপ্রদীপ 'ব্রহ্মসূত্র' রচিত হয়েছে। উপনিষদের আর একটি সমন্বিত রূপ রয়েছে। সেটি হচ্ছে প্রাচ্য প্রজ্ঞার নির্যাস ভগবদ্‌ গীতা।

আমার আলোচনাটি প্রধানত মাণ্ডূক্য উপনিষদকে কেন্দ্র করে করার ইচ্ছা থাকলেও আত্মতত্ত্বের ব্যাপ্তি ও সুপরিস্ফুটতার জন্য প্রাচীন ঋষিদের অনুবর্তনে মাণ্ডূক্যের সাথে জড়িত দ্বাদশ উপনিষদ তথা তাদের দার্শনিক রূপ 'ব্রহ্মসূত্র' এবং দর্শনগত সাহিত্যিক রূপ 'ভগবদ্‌ গীতা'র কিঞ্চিৎ পরিচয় উপোদঘাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচনার প্রাণকেন্দ্র মাণ্ডূক্য শ্রুতিই বিরাজ করবে।

আলোচনার প্রধান চারটি স্তর হবে (১) জাগ্রৎ, (২) স্বপ্ন, (৩) সুষুপ্তি এবং (৪) তুরীয় স্তর। এ প্রবন্ধে উল্লেখিত 'আত্মার জাগ্রত অবস্থা' হেডলাইনটি উক্ত (১) স্তরের আরম্ভ মাত্র।

CamScanner

তথ্য নির্দেশ

১. "পরিকর শ্লোক", *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস*, গুরুপদ হালদার, কালীঘাট, কলিকাতা।

২. "সায়নাদিধৃত মীমাংসা প্রমাণ", *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস*, গুরুপদ হাদলাদর, কালীঘা, কলিকাতা।

৩. *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, অতুলচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

৪. W. Wallace, Life and Writings of Schopenhaur. *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, অতুলচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, এ ২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

৫. "মুক্তিকোপনিষদ", *ঈশাদি বিংশোত্তরশতকোপনিষদঃ* নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই।

৬. "*পাশ্চাত্য দর্শনতত্ত্ব*', প্রতীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ৮, রমনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা- ৯।

৭. "কঠোপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, অতুলচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

৮. "বৃহদারণ্যক উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

৯. "ন্যায় বার্তিক", *ভাষাপরিচ্ছেদ,* শ্রীনাথ ভবন, আঠিলাগড়ি, কাঁথি, মেদিনীপুর।

১০. "কঠোপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, প্রথম খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

১১. "মুন্ডকোপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, প্রথম খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

১২. "বৃহদারণ্যক উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. "উদয়নাচার্য কিরণাবলী, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, শ্রীনাথ ভবন, আঠিলাগড়ি, কাঁথি, মেদিনীপুর।

১৫. শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা, বিংশ সংস্করণ, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, প্রকাশক স্বামী সত্যব্রতানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা- ১২।

CamScanner

১৬. "মুণ্ডক উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

১৭. "গুরুস্তুতি" উপাসনা পদ্ধতি, অদ্বৈতানন্দপুর সম্পাদিত, শ্রী ঋষিধাম সংসদ, ঋষিধাম, চট্টগ্রাম।

১৮. "মুণ্ডক্য উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

১৯. *পঞ্চদশী মাধবাচার্য*, সপ্তম সংস্করণ, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বাই।

২০. *ঋগ্বেদ সংহিতা*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

২১. "গীতাঞ্জলি', *রবীন্দ্ররচনাবলী* দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম বাংলাদেশ সুলভ সংস্করণ, ঝিনুক পুস্তিকা, ১৬৫ বিপনী বিতান, চট্টগ্রাম।

২২. "চিত্রা", *রবীন্দ্ররচনাবলী* প্রথম খণ্ড, প্রথম বাংলাদেশ সুলভ সংস্কারণ, ঝিনুক পুস্তিকা, ১৬৫ বিপনী বিতান, চট্টগ্রাম।

২৩. "মাণ্ডুক্য উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

২৪. "বৃহদারণ্যক উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

২৫. হেগেলের উক্তি, *পাশ্চাত্য দর্শন*, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, ৫/এ কলেজ রোড, কলিকাতা-৯।

২৬. "বিষ্ণুধর্মোত্তর", ২৬৯ অঙ্ক, *চৈতন চরিতামৃত*, মধ্যলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯।

২৭. "ছান্দোগ্য উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

২৮. "মাণ্ডুক্য উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

২৯. "শ্রীমদভাগবতম", *চৈতন্য চরিতামৃত*, ২ আদিলীলা, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯।

৩০. "শ্রীমদ্‌ভাগবত", *চৈতন্য চরিতামৃত*, ৫ আদিলীলা, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটীর, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯।

৩১. "সাংখ্যদর্শন, প্রথম অধ্যায়, *দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা*, প্রথম খণ্ড, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

CamScanner

৩২. "কঠোপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

৩৩. বেদান্তসার, কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, বুক এজেন্সী, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা- ১২।

৩৪. "ছান্দোগ্য উপনিষদ", *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

৩৫. *শ্রীগীতা*, তৃতীয় অধ্যায়, জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পদিত, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

৩৬. "মাণ্ডূক্য উপনিষদ" *উপনিষদ গ্রন্থাবলী*, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা- ১২।

CamScanner

পরিশিষ্ট: ৩

জ্ঞান ও প্রকৃতির প্রতি হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি

ড. আর বালাশুব্রমণিয়ান

সাবেক চেয়ারম্যান, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর ফিলোসফিক্যাল রিচার্স; সাবেক পরিচালক, রাধাকৃষ্ণনন ইনস্টিটিউট ফর এডভান্স স্টাডি ইন ফিলোসফি, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ভূমিকা

জ্ঞান ও প্রকৃতির প্রতি হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি (The Hindu Attitude to knowledge and Nature) শিরোনামে রচিত প্রফেসর ড. আর বালাশুব্রমণিয়ান (১৯২৯-২০১৭) এর এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি আকারে ছোট হলেও, কল্পনায় বিশালত্বের দাবীদার। প্রফেসর বালাশুব্রমণিয়ান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাচীন ও নবীন জ্ঞানগর্ভ ঐতিহ্য থেকে যেরূপ দক্ষতার সাথে প্রজ্ঞা আহরণ করেছেন, তেমনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় আর্য দর্শনের খ্রিস্টিয় বিংশ শতাব্দীর পথকৃৎ প্রয়াত প্রফেসর ড. রাধাকৃষ্ণনন (১৯০৪ - ১৯৫৬) এর নামে প্রতিষ্ঠিত এডভান্স স্টাডি ইন ফিলোসফি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রূপে নিযুক্ত হয়ে তিনি ভারতীয় আর্য ঐতিহ্যবাহী বেদ-উপনিষদের ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করেও অনন্য মেধার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রবন্ধের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর প্রচুর স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়।

খ্রিষ্টিয় আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারত অধিকার দক্ষিণ এশিয়ার বা ভারত উপমহাদেশের হিন্দু ও মুসলিম দুটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে প্রথমে আতংকিত করে এবং পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের দৃশ্যত উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা, প্রযুক্তিগত মহাশক্তি ও অধিকতর প্রগতিশীল দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার মুখোমুখি হয়ে নিজেদের সভ্যতা , ধর্ম ও ঐতিহ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিয়ে তোলে।

CamScanner

এরি পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে, ইংরেজ আমলের শেষ যুগের মহান দার্শনিক ব্যক্তিত্ব প্রয়াত প্রফেসর ড. রাধাকৃষ্ণনন যিনি এককালে ভারতের প্রসিডেন্টের পদ অলংকৃত করেন- প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের দর্শনের ইতিহাস রচনায় প্রবিষ্ট হয়ে ভারতীয় আর্যদের প্রাচীন দার্শনিক ঐতিহ্য জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াস পান এবং অন্য দিকে, সৈয়দ আমীর আলী ইসলামের ধর্মীয় ও নৈতিক সারবত্তা বা স্পিরিটকে আধুনিক সাজসজ্জায় জনসমক্ষে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টায় নিরত হন। উভয়ের ভাবধারা ছিল রক্ষণশীল ও অন্তর্মুখি এবং উভয়ের সম্মুখে জীবন-মরণ প্রশ্ন ছিলঃ আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের দর্শন কি পাশ্চাত্যের আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হবে? আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে আমাদের ধর্মদর্শন কি সঙ্গতিপূর্ণ? ভবিষ্যতের উন্নত প্রযুক্তির মুখোমুখি আমাদের ঐতিহ্য কি টিকে থাকতে সক্ষম হবে? আমাদের জনগোষ্ঠী কি আধুনিক ও ঐতিহ্যের উভয় কুল বজায় রাখতে পারবে?

এ সব প্রশ্নের উত্তরে প্রখ্যাত মুসলিম কবি-দার্শনিক স্যার মুহাম্মদ ইকবাল (১৮৭৭ - ১৯৩৮) উনিশ'শ ত্রিশ এর দশকে *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন* (The Reconstruction of Religious Thought in Islam) গ্রন্থ রচনা করে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক নব জাগরণের সাড়া জাগান। প্রফেসর বালাশুব্রমণিয়ান বিরচিত বর্তমান প্রবন্ধটি একই উদ্দেশ্য ও একই আদর্শভুক্ত। তবে সার্বিক ম্যাক্রো বিবেচনায়, এ প্রবন্ধটিকে এর অনুরূপ ধারায় একটি সোনালি সূচনা বলা বাঞ্চনীয়। আশা করা যায়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞানীয় ঐতিহ্যে কৃতবিদ্যী, সংস্কৃত ভাষায় ও বৈদিক-উপনিষদিক জ্ঞানতত্ত্বে দক্ষ বালাশুব্রমণিয়ান, তাঁর বর্তমান অবস্থান থেকে একটি পরিসমাপ্ত গ্রন্থ রচনা করে মহান ভারতীয় হিন্দু সমাজকে উপরোক্ত কঠিন প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর খুঁজে পেতে আশানুরূপ সহায়তা করতে সমর্থ হবেন। আশা করা যায়, বর্তমান প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদটি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবার নিকট সুখপাঠ্য, উপাদেয় ও শিক্ষানীয় হবে।

ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খাঁন

CS CamScanner

১. হিন্দু দৃষ্টিকোণ: দর্শন ও ধর্মের উভয় দিক

ভারতীয় ঐতিহ্যে দর্শন ও ধর্মকে পৃথকভাবে দেখা হয়, যদিও এতে কখনো দু'টিকে নিরেট ভাবে বিভক্ত করা হয় না। এমন কি, যেকোন সচরাচর জ্ঞানীয় অনুসন্ধানে বৈশিষ্ট্যটি প্রতিয়মান হবে। অতএব হিন্দুত্বের চত্বরে, দর্শন কোথায় শেষ হয় ও ধর্ম কোথায় আরম্ভ হয়, তা বলা কঠিন বৈকি। যদি তাই সত্যি হয়, তবে 'হিন্দুত্ব'কে দর্শন ও ধর্মরূপে আলাদা করে দেখা যথার্থ নয়। জৈনবাদ ও বৌদ্ধবাদ এর বেলায়ও একই কথা খাটে, যেগুলি অন্য দু'টি ভারতীয় ঐতিহ্যভূক্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

১.১ *হিন্দুত্ব বা হিন্দুবাদ (Hinduism) ও দর্শন*

ভারতীয় ঐতিহ্যে দর্শনের ধারণায়, দর্শন ও ধর্মকে একই সূত্রে দেখার মত যথেষ্ট প্রশস্ত বললে অত্যুক্তি হয় না। দর্শন শব্দটি, শব্দগত ভাবে জ্ঞান-প্রীতি বুঝায়। যে জ্ঞানকে ভালোবাসে অথবা জ্ঞানের জন্যে লালায়িত বোধ করে, সে অনুসন্ধানের মাধ্যমে জ্ঞানের অন্বেষণ করতে বাধ্য এবং জ্ঞানের অনুসন্ধান তাকে সত্য দর্শনের মুখোমুখি করবে।

ভারতীয় ঐতিহ্যে অনুসন্ধানকে বিচার (বিচার-বিবেচনা) বলা হয় এবং দেখাকে বলা হয় দর্শন; আর উভয়ই মাধ্যম ও গন্তব্যের ন্যায় এবং মাধ্যম ও গন্তব্যস্থল (Means and end) এর মত পরস্পর সম্পর্কিত। এতে যখন বিভিন্ন প্রকার তার্কিক পদ্ধতিতে সত্যের প্রকৃতি উৎঘাটনের উপায় অনুসন্ধানে জোর পড়ে, তখন ইহাকে তত্ত্ববিচার বলা হয় এবং যদি অন্তর্দৃষ্টি বা সত্য-দর্শনের উপর জোর পড়ে, তখন ইহাকে তত্ত্বদর্শন বলা হয়। সুতরাং ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে বিচার এবং দর্শন এমনিভাবে ব্যবহার করা হয়, যাতে প্রথমটি দ্বিতীয়টির পথকে সুগম করে। কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, জৈনবাদ সম্যকদর্শন (Right seeing), সম্যক জ্ঞান (Right Knowledge) এবং সম্যক চরিত্র (Right Conduct) এর কথা বলে, যা ত্রি-রত্ন (Three Jewels) রূপে আখ্যায়িত হয়, যাতে শেষোক্তটি দ্বিতীয়টির মাধ্যমে প্রথমটিতে নিয়ে যায়। এ স্থলে, নৈতিক

আচরণ আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে সম্যক জ্ঞানে উপনীত করে; এবং সম্যক জ্ঞান সম্যক দৃষ্টিতে (সম্যক দর্শন) নিয়ে যায়।

বৌদ্ধবাদের বেলায়, যা সম্যক সমাধী বলে পরিচিত তা অষ্টাঙ্গিকা মার্গ (Eightfold noble path)- যা অষ্ঠাঙ্গিকা মার্গের শেষ পদক্ষেপ, তা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিতর্ক ও বিচার বিবেচনা সম্বলিত করে- যা বিশুদ্ধ চিন্তার আনন্দ উৎপাদন করে। একি ঘটনা হিন্দু ঐতিহ্যের বেলায়ও সত্য, যা বৈদিক সময় থেকে চলে আসছে। উদাহরণস্বরূপ *তৈত্তিয় উপনিষদ* বলে, ভৃগু পরম সত্তাকে জানার জন্য বিচার-বিবেচনা (অনুসন্ধান) করে, যিনি সর্বসত্তার উৎস, সহায় এবং গন্তব্য স্থল।

শঙ্কর যুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধানের বা বিচার-বিবেচনার গুরুত্বের উপর জোর দেন, যা পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের মর্ম-উপলব্ধি করার উপলক্ষ্য। তিনি বলেন, ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান অনুভবে উপনীত করে এবং যা কিছু অনুসন্ধান ছাড়া গ্রহণ করা হয়, তা কোন রূপ কল্যাণ সাধন করবেনা।

রমন মহর্ষী অদ্বৈত ঐতিহ্যের সমসাময়িক একজন আদর্শিক ব্যক্তিত্ব, যিনি বিচার-মার্গ (মারণ) তথ্য অনুসন্ধানের পথ নির্দেশ করেন, যদ্বারা পরম সত্য উপলব্ধি করা যায়। অতএব, জ্ঞান ও সত্য উভয়ের বেলায় অনুসন্ধান বা বিচার বিবেচনার অপরিহার্য প্রয়োজন, একমাত্র যার মাধ্যমে সত্বাকে দর্শন বা উপলব্ধি করা যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, দুই প্রকার অনুসন্ধানঃ জ্ঞানের অনুসন্ধান ও সত্যের অনুসন্ধান; প্রথমটি ভারতীয় ঐতিহ্যে দ্বিতীয়টির পূর্বসূরী; প্রথমটির অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রমাণ-বিচার রূপে পরিচিত; পক্ষান্তরে, সত্যের অনুসন্ধান, যা জ্ঞানের উদ্দেশ্য পরমেয়-বিচার রূপে পরিচিত। হিন্দুত্বের যেমন জৈনবাদ, বৌদ্ধবাদের মর্যাদা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শব্দতত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ হয়ে অধিবিদ্যায় উপনীত হয়, এতে শব্দগত তত্ত্ব ও অধিবিদ্যা একই সূত্র গ্রথিত বলে ইহাকে দর্শন বলা হয়।

CamScanner

১.২ *হিন্দুত্বের ধর্মরূপ*

হিন্দুত্ব দর্শন থেকেও অধিক, ইহা ধর্মও বটে। পল টিলিচ্ (Paul Tillich) এর মতে, ধর্ম মানুষের পরম লক্ষ্য, যা চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করা হয়, এটি সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে যথা মানবজাতি, জগত এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ এর থেকে মানব জাতির কোন দিকই বাদ পড়েনা। বিশ্ব জগতের কোন অংশকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না এবং ব্রহ্মের কোন প্রস্থকে অস্বীকার করা যায় না, এটাই আমাদের পরম এর ধারণা। এই অনুসারে, ব্রহ্ম, মানব এবং বিশ্ব যেমন দর্শনে বিবেচ্য, তেমনি ধর্মেও বিবেচ্য। তবে দর্শন থেকে যা ধর্মের পার্থক্য নিরূপন করে তা হল ব্যবহারিক দিক; মানুষের পরম বিচার-বিবেচনা, যা সকল শর্তের অতীত, তা একটি প্রত্যয় (Commitment), ইহা একটি জীবন পথ, দর্শনের বিপরীতে। দর্শনকে সাধারণভাবে সুত্রগতরূপে বিবেচনা করা হয়। ধর্ম-মানুষের পরিপূর্ণ সত্তা, স্বীকৃতি, অনুভূতি: জ্ঞানের দাবিদার হিসেবে ধর্ম-মানুষের পূর্নাঙ্গ ব্যক্তিত্বকে পরম সত্মার মুখোমুখি করে। ভারতে দর্শনকে সচরাচর ঐতিহ্যগতভাবে যেমন চিন্তা করা হয়,তাতে ব্যবহারিক দিকও অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই হিন্দুত্বকে এইদিক থেকে ধর্মও বলা যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধান স্থলে সত্য জানার জন্য পরম মননশক্তির প্রয়োজনবোধ করা হয় এবং যথাযথ মনের অবস্থা যাকে যথাযথ মনোভাব বলা যায়; তার সাথে দর্শন বিচারে, অপবিচার ও অপব্যবহার রোধ করার জন্য আধ্যাত্মিক উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিস্ময়ের কিছুই নাই যে, এ ব্যাপারে কিছু প্রারম্ভিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা অর্জনের উপর হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের চত্বরে অনুসন্ধান বা বিচার পূর্ব শর্তরূপে বিবেচনা করা হয়।এই শৃঙ্খলা ক্রমাগতভাবে গভীরতায় প্রবেশ করতে থাকে যাবৎ সত্যের দর্শন অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত। অতএব ভারতীয় ঐতিহ্যে দর্শনকে কেবল সূত্রগত বলা যথার্থ নয়; কেননা ইহা কেবল মাত্র জীবনের একটি দৃষ্টিভঙ্গি নয় বরং ব্যবহারও বটে। অন্য কথায়, দর্শন ও ধর্ম অবিচ্ছেদ্য নয়, যদিও উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বিদ্যমান। এরূপ সূত্র এবং ব্যবহারের সমন্বয় হিন্দুত্বকে ধর্ম-দার্শনিক চরিত্র প্রদান করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দুত্বের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ বিদ্যমান আছে, যাদের প্রত্যেকেই নিজস্ব শব্দতাত্ত্বিক ভাষ্য ও অধিবিদ্যায় বিশ্বাসী। এই মতাদর্শগুলি পরস্পরের উপর শব্দতত্ত্ব ও

CamScanner

অধিবিদ্যায় প্রভাব বিস্তার করে কোন কোন বিষয়ে পরস্পরের সাথে একমত পোষণ করে, আবার কোন কোন বিষয়ে দ্বি-মতপোষণ করে। এগুলি উভয় ক্ষেত্রে, সম্যক বিচার বিশ্লেষণে দর্শনের বিভিন্ন মতাদর্শের বিচার-বিশ্লেষণের সাথে তুলনীয়।

২. বাস্তবানুগ বা বাস্তববাদী জ্ঞানতত্ত্ব

২.১ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়এর সম্পর্ক

হিন্দুত্বে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অধিবিদ্যক ধারা বিদ্যমান- স্রষ্টাবাদ ও সৃষ্টি অতীতবাদ তথা দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদকে সর্বেশ্বরবাদ বা মনিজমও বলা হয়। এটাকে ট্রান্সথিইস্টিক বলা সহায়ক, কেননা এতে ঐ অধিবিদ্যাকে নির্দেশ করা হয়, যা থিইজমের রিরুদ্ধ নয় বরং থি-ইজমকে অতিক্রম করে যায়; তা অধিবিদ্যক ক্ষেত্রে থিইস্টিক হউক বা ট্রান্সথিইস্টিক হোক অথ্যাৎ স্রষ্টাবাদী হউক অথবা সৃষ্টি অতীতবাদী হউক হিন্দুত্বের বাস্তব সত্যের জ্ঞান-তত্ত্ব অনুসরণ করে। এর মধ্যে নূন্যতম দাবি হল, জ্ঞান-তত্ত্বের আওতায় স্বীকার করে নেয়া যে, জ্ঞান বলে একটি বিষয় আছে; জ্ঞানকে স্বীকার করলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়'কে স্বীকার করতে হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান বলে কোন কিছু নেই। সচরাসচরভাবে, জ্ঞানকে যুক্তির মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করলে এটা ধরে নিতে হয় যে, কেউ একজন আছে, যে জানে এবং কিছু বস্তু আছে, যা জানা হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেত'র পার্থক্য ব্যতীত কোন জ্ঞান-তত্ত্ব হতে পারেনা। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অর্থাৎ যে জানে এর সাথে যা জানা হয় তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার প্রয়োজন এখানে আপাতত নেই; তাই একদিকে জ্ঞেয়'র সাথে জানার সম্পর্ক, অন্যদিকে, জ্ঞাতার সাথে তার সম্পর্কের প্রশ্ন এখানে বিবেচনা করা যেতে পারে।

জ্ঞান প্রকৃতিগতভাবে জ্ঞেয়কে প্রতিভাত করে, অর্থাৎ ইহা জ্ঞেয়কে জ্ঞাতার নিকট প্রতিভাত অর্থাৎ জ্ঞাত করে। জ্ঞান অথবা ভাষা, যার মাধ্যমে জ্ঞান প্রকাশ করা হয়; তা হল বস্তুটির বা জ্ঞেয় এর একটি প্রতিচ্ছবি যেমন পূর্ববর্তীকে Wittgenstein বলেন, জ্ঞান যদি বস্তুটিকে স্বরূপে প্রকাশ করতে পারে, তা এই কারণে হতে পারে যে, ইহা বস্তুর উপর নির্ভরশীল। এটিকে বলে বস্ততন্ত্র। অর্থাৎ কিনা, বস্তুটি বর্তমান থাকায় যেমন আমাদের জ্ঞান হয়,

CamScanner

তেমন বস্তুর অবর্তমানে কোন জ্ঞান হয় না। যদিও ইহা জ্ঞানীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, তবুও ইহা নিজের অস্তিত্বের জন্য জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল নয়। সম্পৃক্ত ব্যক্তির এই ব্যাপারে কোন এক্তেয়ার নাই। কেননা যা হবার তা হবে। যদি বস্তুটি বিদ্যমান থাকে এবং জ্ঞান উৎপন্ন হবার প্রয়োজনীয় অবস্থা পাওয়া যায়; কেউ জ্ঞানকে কল্পনা করে না এবং যদি কল্পনা করেন তা জ্ঞান হয়না। যদি জ্ঞান কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে জানা সম্পর্কিত হয়, ইহা কোন ব্যক্তিগত বিষয়, যেমন কল্পনা, আশা পোষণ, ইচ্ছা ইত্যাদি- যা সম্পৃক্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য- সম্পৃক্ত ব্যক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হবার মধ্যে কোনো ভূমিকা রাখেনা। অথবা ইহা যেরূপ হয়ে থাকে তা পরিবর্তন করারও তার কোন ক্ষমতা নেই।

অতএব, জ্ঞান ব্যক্তি মূখাপেক্ষী নয়; যাকে পুরুষতন্ত্র বলা যায়- যেভাবেই জ্ঞাতার সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক করা যাক না কেন, ইহা জ্ঞাতার আত্ম-বৈশিষ্ট্য হউক অথবা আত্মতৎপরতা হউক অথবা আত্মসচেতন ও প্রকৃতিগত কোন আভ্যন্তরিন প্রবণতার আত্মপ্রকাশই হোক না কেন।

২.২ *জ্ঞানের আভ্যন্তরিন যথার্থতা বা Validity*

জ্ঞান যেভাবেই প্রতিভাত হোক না কেন, তা যথার্থ বিবেচিত হয়। একমাত্র যেখানে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের উদ্রেক করে, সেখানেই এর অস্বীকৃতি বা সন্দিহানের দাবী উঠে। যখন আমি একটি বস্তু অনুভব করি, যেমন: একটি বৃক্ষ এবং দাবী করি যে, ইহা একটি বৃক্ষ; আমার অনুভূতি জ্ঞানের ভিত্তিতে। আমি তাকে বিশ্বাস করি, যখনই জ্ঞান আমার মধ্যে উদিত হয়। এই জ্ঞানটি যে সাফল্যজনক তৎপরতায় আমাকে পরিচালিত করে, তাই প্রমাণ করে যে জ্ঞানটি যথার্থ। যখন আমি একটি বস্তু সম্বন্ধে কিছু দাবী করি যে, ইহা লম্বা, যার অনেক শাখা প্রশাখা আছে ইত্যাদি-তা আমার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই করি; এবং আমি বিশ্বাস করি যে, বস্তুটি সম্বন্ধে আমি যা কিছু বলি, তা আমার জ্ঞানের ভিত্তিতে বলি; এর ব্যতিক্রম হতে পারে, যদি কোন যুক্তি আমার দাবিকে ভুল প্রতিপন্ন করে। সচরাচরভাবে, আমরা আমাদের জীবনের দৈনন্দিন তৎপরতা এইরূপ বিশ্বাসের উপর পরিচালনা করি। আামাদের যেমন জ্ঞান, তেমনি বস্তু অর্থাৎ জ্ঞান আভ্যান্তরিনভাবে যথার্থ এবং

CamScanner

ইহাকে যথার্থ বলে বিশ্বাস করাও যায়। ইহার উৎস যে প্রকারেই হোকনা কেন, যথা-অনুভূতি, যুক্তি, কথাগত স্বাক্ষ্য- যার মাধ্যমে ইহা গ্রাহ্য হয়েছে।

২.৩ *জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রজ্ঞার দৃষ্টিকোণ*

যদিও জ্ঞানের যথার্থতা ব্যবহারিক উপকারিতার উপর নির্ভরশীল নয়, তবুও ভারতীয় চিন্তাবিদরা সাধারণভাবে জ্ঞানকে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। জ্ঞান হল জীবনের সর্বপ্রকার কর্মকান্ডের ভিত্তি। দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু একজন লোকে করে থাকে, তা জিনিস সম্বন্ধে তার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জ্ঞান যেসব বাস্তব কর্মকান্ডের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে, তা এরই ফলশ্রুতি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, জ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয় বাস্তব কর্মকান্ডের দিকে পরিচালিত করে। ইহা হতেও পারে, নাও হতে পারে। উদ্দেশ্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে যা জ্ঞান এবং বাস্তব কর্মকান্ডের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করে। জ্ঞান আপনিতেই বাস্তব কর্মকান্ডের দিকে পরিচালিত করে, যদি না তাতে একটি উদ্দেশ্যে বিদ্যমান থাকে। যে কোনো জিনিস জ্ঞানের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে। যদি কোনো ব্যক্তি কোন জিনিসকে জেনে শুনে তা উপকারী বলে চিন্তা করে, তখন সে এটি পেতে চায়। পক্ষান্তরে, যদি সে এই চিন্তা করে যে, জিনিসটি ক্ষতিকর, তখন সে ইহা পছন্দ করে কিংবা অপছন্দ করে এবং এটিকে এড়িয়ে চলে। ফলত, যথার্থ কর্মতৎপরতায় নিরত হওয়া তার ইচ্ছা ও অনিহার উপর বর্তাবে। অতএব, যা কেহ পছন্দ করে পেতে চায় এবং অপছন্দ করে এড়িয়ে চলে, সেদিকেই তার উদ্দেশ্যে কার্যকরী হয় এবং ভাল ও মন্দ বিবেচনা করার ব্যবহারিক প্রজ্ঞার ভিত্তি রচনা করে। এই প্রক্রিয়া, জ্ঞানের পরে উদিত হয়ে থাকে। এইরূপ উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতিতে কেবল জ্ঞান বাস্তব কর্মকান্ডের দিকে পরিচালিত করে।

২.৪ *মানব সত্ত্বার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকৃতি*

মানব জীবন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। হিন্দুর মনন কখনো জ্ঞানকে আপনিতেই উদ্দেশ্যে বলে মনে করে না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞানানুসন্ধান কখনো হিন্দুর আদর্শ ছিল না। একজন প্রখ্যাত বৈষ্ণব শিক্ষক বেদান্তদেশিকা বলেন:

CS CamScanner

মানুষেরা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তা জীবনের উদ্দেশ্য আহরণ করার জন্য এবং তারা গন্তব্য স্থানে পৌছুতে উপযুক্ত মাধ্যম গ্রহণ করেন।

মানুষ জীবনের যে উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করে, তা তার প্রকৃতিতে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। অন্যথায়, মানুষ এবং পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। মানুষের জীবনের তৎপরতা কেবল ইন্দ্রিয় সেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়, যা পশুত্বের স্তরে সাধারণভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে। মানুষকে মানবিক বিবেচনা করা যায় না, যদি না তার ইন্দ্রিয়গুলি মানবিক অথবা মার্জিত হয়ে থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি কেবল মৌলিক প্রয়োজনগুলির অধঃস্তন হওয়া উচিত নয়, যেমনঃ ক্ষুধার তাড়না, ঘুমের ঘোর এবং যৌন অভিলাষ। হিতোপদেশ গ্রন্থে বলা হয়, ক্ষুধা, ঘুম, ও যৌনতা ইত্যাদি মানুষ ও পশুর মধ্যে একই প্রকৃতির; জ্ঞানই (মননশীল সচেতনতা) একমাত্র মানুষকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। শংকরাচার্য বলেন, সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষ প্রমিনেন্ট বা প্রখ্যাত; কেননা একমাত্র মানুষই জ্ঞান-সন্ধানে অনন্য প্রভাবশালী ও পারঙ্গম এবং ধর্ম-কর্ম জ্ঞানের অধিকারী। মানুষের এই বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে উর্ধ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, তা তিনি তিন প্রকার যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার প্রয়াস পান।

প্রথমত, এই বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার সামর্থ্য আমাদের রয়েছে; তা কেবল পার্থিব জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তদুপরি সুপ্রিম রিয়েলিটি বা পরম সত্যের জ্ঞানের চত্বরেও আমাদের জ্ঞান সম্প্রসারিত হয়, যা প্রকৃতপক্ষে সবকিছু জ্ঞানের উৎস ও যুক্তির প্রমাণ। ইহা সম্ভবপর হয় এই কারণে যে, আমাদেরকে এমন একটি মন দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে, যা আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, যে আত্মা অর্থাৎ যে মানবত্মা সবকিছু এমন কি পরমসত্যকেও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। অন্যান্য সৃষ্টিজীবের ব্যতিক্রমে আমাদের পবিত্রগ্রন্থাদি (Scripture) পাঠ করে, বুঝে, তা অনুসরণ করে চলার সামর্থ্য রয়েছে। আর পবিত্রগ্রন্থ হল, ধর্মের কর্তব্য পালন করার নির্দেশক এবং সর্বোচ্চ সত্যকে জানার বাহন।

দ্বিতীয়ত, ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ, অনুধাবন এবং স্বকীয় স্বাধীন বিচার শক্তির মাধ্যমে ফলপ্রসূ কর্মধারা বেছে নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করার

CamScanner

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী আমাদের রয়েছে। মানুষ কোন জিনিসের চাহিদা অনুভব করে, তা পেতে ইচ্ছা করে এবং উক্ত ইচ্ছা পুরণ করার লক্ষ্যে কর্মতৎপরতা, একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চারিত্রিক গুণ।

তৃতীয়ত, যখন আমাদের সান্নিধ্যে উপস্থিত কোন বস্তুর জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা নিজেদের বিচার শক্তিকে ব্যবহার করি, তখন আমাদের বাছাইকৃত বস্তুটির প্রতি আমরা অমনযোগী হতে পারি না। পক্ষান্তরে, আমরা ইহার প্রতি আগ্রহান্বিত হই। আমরা যা বেছে নিয়েছি, তা বাস্তবায়িত করবার জন্য আমরা ন্যায়সঙ্গত মাধ্যমের অনুসন্ধান করি।

অতএব, মানুষের জীবনধারায়, যাতে জ্ঞান, ইচ্ছা, অনুধাবন ও বিচার শক্তি পরিপূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়, তা পার্থিব সমৃদ্ধি, সুখ এবং স্বাধীনতার প্রতি নিবেদিত হয়। অতএব, প্রশ্ন উঠে, জ্ঞান কিসের জন্য? ইহা মনোভাব এর Pragmatic বা কার্যকরী (হিন্দু মনোভাবের ব্যবহারিক) দিকের প্রতি নির্দেশ করে, যার উত্তর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানব জাতির একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকের বিবেচনা করতে হয়।

২.৫ *জ্ঞান এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা*

মানব জাতি দুই স্তরে জীবন যাপন করে-দৈহিক এবং দেহাতীত (organic and hyper-organic)। হিন্দুদের মূল্যবোধ ব্যবস্থা, যা দৈহিক ও দেহাতীত উভয় স্তরকে সম্বলিত করে, তা জ্ঞানের ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে সহায়ক। হিন্দু মনন, মূলবোধের দৈর্ঘ্য-প্রস্থকে চার ভাগে বিভক্ত করে। যথা: ১. অর্থ (সম্পদ), ২. কাম (তুষ্টি), ৩. ধর্ম (কর্তব্য) এবং ৪. মোক্ষ (পরিত্রাণ)। এগুলিকে ক্রমান্বয়ে বিবেচনা করা হয়। এর প্রথম দুটি মূল্যবোধের স্তর দৈহিক আবরণকে সূচিত করে ও পরবর্তী দুইটি স্তর দেহাতীত আবরণকে সুচিত করে। দৈহিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, যা মানুষের বস্তুগত কল্যাণ সাধন করে; বস্তুগত কল্যাণ ও সুখ সাধন করা বৈদিক যুগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রার্থনা ও যজ্ঞ (পূজা ও বলিদান), যা বেদের পাঠে আমরা দেখতে পাই, তা সুখ-স্বাস্থ্য ও পূর্ণ শত-বৎসরের জীবন কামনায় নিবেদিত।

CamScanner

মানুষের আধ্যাত্মিক দিক দর্শন, যা কেবল মাত্র বস্তুগত সমৃদ্ধি ও সুখের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকেনা, তা অন্যান্য মূল্যবোধের দিকেও আকৃষ্ট হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, শৈল্পিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ সমূহ- যেগুলি দৈহিক ও অর্থনৈতিক মুল্যবোধের তুলনায় উচ্চতর, তা দেহাতীত মুল্যভাবাপন্ন। মানবগণ মানসিক ও মানসিক-অতীত স্থরে পূর্ণতা অর্জন করতে তৎপর হয়। প্রণিধানযোগ্য যে, ধর্ম কেবল মাত্র মূল্যবোধ নয়, বরং এমন শাসননীতিও বটে, যা সম্পদ ও সুখের অনুসন্ধান-অনুসরণে অনুমতি প্রদান করে; তবে তা ব্যক্তিক ও সামাজিক কল্যাণকে ব্যাহত করে নয়। সুতরাং জ্ঞান যদি অনুসন্ধান করা হয়, তা হবে মানবজাতির আরাধ্য বিভিন্ন স্তরে মূল্যবোধের অনুসরণে, জ্ঞানের উপকারিতার জন্য।

২.৬ *আনন্দদায়ক ও উত্তম*

হিন্দু ধর্ম মতে, বাস্তব জীবনে দুঃখ-ভোগের সমস্যার প্রেক্ষাপটে, জ্ঞানের চরিত্রাদর্শ ব্যাখ্যা করতে হবে যে, বাস্তব জীবনের দুঃখময়তা বন্দীত্বের নিদর্শন। ভাসাভাসা দৃষ্টিতে প্রতিয়ামান হতে পারে যে, মানুষের কেবল দেহ নয় বরং তৎসঙ্গে প্রাণও বিদ্যমান। এইরূপ মনেও হতে পারে যে, উভয়ের দ্বারা মানুষের প্রকৃতি গঠিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ হল মূলত আত্মিক শক্তি, যার সাথে এই ধরাধামে বা পৃথিবীতে অবস্থান কালে একটি প্রাণময় শারীরিক দেহ সম্পৃক্ত থাকে, যা আত্মিক শক্তির বহির্ভূত অংশ এবং তা ঘটনাচক্রে সংযুক্ত। যদি দুঃখ ভোগের উৎসকে চিহ্নিত করতে হয়, তবে উক্ত প্রাণময় শারীরিক দেহকে আত্মা বা আত্মিক শক্তি থেকে পৃথক করা প্রয়োজন, যা আত্মার আবরণই বটে। আত্মা হল শব্দহীন, অনুভূতিহীন, বর্ণহীন, অক্ষয়, সাধহীন, চিরঞ্জীব, গন্ধহীন, আদ্যহীন, অন্তহীন,যেমন উপনিষদের বিবরণে দেখা যায়। তা নিজস্ব প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন এবং জ্ঞানীয় চিন্তানুভূতি বা কর্মের কোনো প্রকার অভিজ্ঞতা এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। যদি আত্মা নিজস্ব গুণে সর্বৈবভাবে স্বাধীন হয়, অর্থাৎ সব কিছু থেকে এমনকি দুঃখানুভূতি থেকেও মুক্ত হয়, তবে দৈহিক অস্থিত্বের দুঃখ অনুভূতির উৎস অবশ্যই প্রাণময় শারীরিক দেহের মধ্যে নিহিত থাকবে। কিন্তু আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে দেহের কোন দুঃখানুভূতি হতে

CamScanner

পারেনা; কেননা যখন আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দেহ একটি কাষ্ঠ খণ্ড বা পাথর খণ্ড থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

কেবল অনুভূতি সম্পন্ন দেহ দুঃখানুভূতির অভিজ্ঞাতা লাভ করতে পারে এবং দেহ অনুভূতিসম্পন্ন হয় কেবলমাত্র যখনই ইহা আত্মার সাথে সংযুক্ত হয়। দেহহীন আত্মা অথবা আত্মাহীন দেহ কোন প্রকার দুঃখানুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেনা। পক্ষান্তরে, কেবল দেহ বন্ধনের আত্মাই দুঃখানুভূতির আকর। অতএব, দুঃখানুভূতির প্রকৃত সমস্যা এমন এক ব্যক্তির সম্মুখে দেখা দেয়, যার আত্মা দেহের মধ্যে সমাহিত হয়। দৈহিক স্বাধীনতা অর্জন করা যথেষ্ট নয়, যেহেতু ইহা দুঃখানুভূতির সমস্যা সমাধান করতে পারে না। দৈহিক স্বাধীনতা হল, দেহ থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রকারের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হওয়া। ইহা বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু ইহা অর্জিত হলে দুঃখানুভূতির সমাপ্তি হওয়া অনিবার্য নয়। দেহের নানা প্রকার চাহিদা থেকে মুক্ত হওয়া, একজন লোকের আত্মিক উন্নয়নের পথে প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু আত্মিক স্বাধীনতা ভিন্ন, অর্থাৎ আত্মার স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া, কোনো ভালো মন্দের পার্থক্যকারী মননশীল ব্যক্তির জন্য অন্যকিছুতৃপ্তিযোগ্য হতে পারে না। হিন্দুধর্ম মতে, আত্মার মুক্তি, যাকে মোক্ষ বলা হয়, তাই হল স্বর্গের মূল্যবোধ। ভাল ও আনন্দদায়কের পার্থক্য বিবেচনা করে সর্বোচ্চ মূল্যবোধকে উত্তম বা শ্রেয় বলা হয়; পক্ষান্তরে, অন্যসব মূল্যবোধকে আনন্দদায়কের শ্রেণিভূক্ত করা হয়।

এইরূপ পার্থক্য নির্দেশ করে উপনিষদ বলেন, উত্তম ও আনন্দ দায়ক উভয়ই মানুষের দ্বারস্থ হয়, জ্ঞানালোক উভয়ের বিষয়ে ভেবেচিন্তে পার্থক্য নিরূপন করে। জ্ঞানীজন উত্তমকে বেছে নেয়, আনন্দদায়কের উপরে, সরলমনা লোক পার্থিব স্বাচ্ছন্দের জন্য আনন্দদায়ককে বেছে নেয়।

এর ভাষ্য রচনায় শংকরাচার্য বলেন যে, দুইটি গন্তব্য অর্থাৎ পরিত্রাণ ও পার্থিব সমৃদ্ধি তাদের প্রকৃতিগত স্বরূপ বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর, যেগুলির আহরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ে; যদিও উভয়দিকই আমাদের সম্মুখে খোলা থাকে। কিন্তু একই সাথে উভয়গন্তব্য স্থলের অনুসরণ করা অসম্ভব।

CamScanner

এই মাধ্যমগুলির একটিকে অবলম্বন করলে, অন্যটিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে, যদিও কোনটি গ্রহণ করবে এবং কোনটি বর্জন করবে, আমাদের সম্মুখে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অবশ্যই মানবজাতি এইরূপ মূল্যবোধের বিচার সংকট থেকে কখনও মুক্তি পায় না, যেহেতু আমাদের বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদেরকে এই দিক অথবা ওই দিক বেছে নিতে হবে।

৩. উচ্চতর প্রজ্ঞা এবং নিম্নতর জ্ঞান

৩.১ *জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি*

জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধতার বিবেচনার ভিত্তিতে, হিন্দুধর্ম জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তম এবং আনন্দদায়ক এর পার্থক্য, জ্ঞানকে সচরাচরভাবে উচ্চতর প্রজ্ঞা ও নিম্নতর জ্ঞান-এর দুই প্রকার শ্রেণিতে বিভক্ত করে। এর মধ্যে যা উত্তম, অর্থাৎ পরিত্রাণ লাভ করতে সহায়ক হয়, তা উচ্চতর প্রজ্ঞা বা পরাবিদ্যা নামে অভিহিত হয়। পক্ষান্তরে, যে জ্ঞান পার্থিব বস্তুর দিকে পরিচালিত করে, যা বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন ও সুখ অর্জনের মাধ্যম রূপে বিবেচিত হয়, তা নিম্নতর জ্ঞান বা অপরাবিদ্যা নামে পরিচিত। যে ব্যক্তি আনন্দদায়কের স্তরে নানা প্রকার মূল্যবোধের অনুসরণ করে, সে উর্ধ্বতন সত্যজ্ঞানের বিষয়ে অজ্ঞ। এরূপ ব্যক্তি তার অনুভূতিপ্রবণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্বেও, তাকে অজ্ঞরূপে গণ্য করা হয়। এই কারণে শংকরাচার্য অপরাবিদ্যার অধিকারীকে অজ্ঞ রূপে আখ্যায়িত করেন।

এক্ষেত্রে, অপরাবিদ্যা ও অজ্ঞতা কোন প্রকার অসম্মানজনক অর্থে ব্যবহার করা হয় না। উচ্চতর প্রজ্ঞার প্রেক্ষিতেই, ইহাকে নিম্নতর জ্ঞানবা 'বিদ্যা' রূপে চিহ্নিত করা হয়। যেহেতু নিম্নতর এই বিদ্যা উচ্চতম সত্যজ্ঞানে উপনীত হতে পারে না, সে কারণে ইহাকে অজ্ঞতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা ইহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যা ইহার দ্বারা প্রাপ্ত-হওয়া যায় না; তা বিশেষভাবে বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ যা কিছু ইহার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং যা কিছু ইহার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, সেই পার্থক্যের উপর জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

ভগবৎ গীতা এই পার্থক্যকরণের ভাবটি দিন এবং রাত্রির উপমা দিয়ে প্রকাশ করে। ইহা বলে, *একজন প্রাজ্ঞ যিনি সত্যের প্রতি সচেতন এবং অন্যরা যারা সত্যের বিষয়ে 'অজ্ঞ' তাদের পার্থক্য হল এই যে, যাহা তাদের নিকট দিন রূপে প্রতীয়মান হয়, তা প্রাজ্ঞজনের নিকট রাত্রি রূপে প্রতিভাত হয়, এবং প্রাজ্ঞজনের প্রতি যা দিন রূপে প্রতিভাত হয়, তা তাদের নিকট রাত্রি রূপে দেখা দেয়।*

মাণ্ডুক্য উপনিষদে দুই প্রকার জ্ঞানের প্রতি এই মর্মে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। যখন শংকরাচার্য অঙ্গিরাসকে এই প্রশ্ন করেন, *প্রভু 'উহা' কি? যাহা জানা গেলে সব কিছু জানা যায়। অঙ্গিরাস উত্তরে বলেন, "অর্জন করার ক্ষেত্রে দুই প্রকার জ্ঞান বিদ্যমান। উচ্চতর ও নিম্নতর, ইহাই, যা ঐতহ্যগতভাবে ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা।*

উচ্চতর ও নিম্নতর জ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করে উপনিষদ উচ্চতর বিদ্যার বিষয়বস্তুকে নিম্নতর বিদ্যার বিষয় বস্তুর মুখোমুখি করে বক্তব্য রাখে যে, এই দুই প্রকারের মধ্যে নিম্নতর জ্ঞানের মধ্যে ঋগবেদ, যজুরবেদ, শামবেদ, অথর্ববেদ, উচ্চারণবিজ্ঞান ইত্যাদি, ধর্ম উদযাপন নীতি, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র পদাদি অর্থাৎ পদবিন্যাস ও রাগ-রাগিনীর মাত্রা এবং যুক্তিবিদ্যা শাস্ত্রাদি বিদ্যমান। অতঃপর উচ্চতর জ্ঞান হল, যা দ্বারা অপরিবর্তনীয় জ্ঞান উপলব্দি করা যায়।

ছন্দর্য উপনিষদ-এর সপ্তম পরিচ্ছেদে, নারদের প্রাচীন কৃতি উপস্থাপন করা হয়, যিনি দুঃখে নিমগ্ন ছিলেন। যদিও তিনি তার অনুভূতি ও প্রবণ শাস্ত্রাদির বিবেচনায় সুদক্ষ ছিলেন; তিনি শাব্দিক জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন, আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন না। সুতরাং তিনি সনৎ কুমারের নিকট শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হন, যাতে তার দুঃখ নিবারণ হয়।

৩.২ *অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি*

জ্ঞানের দুই শ্রেণিবিভক্তি কেবল স্বতঃসিদ্ধ সত্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং অধিবিদ্যক বিবেচনায়ও তা পরিলক্ষিত হয়। উত্তম এবং আনন্দদায়কের মধ্যে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি আত্ম ও অনাত্মের মধ্যেও পার্থক্য

বিদ্যমান। প্রথমটির বিভক্তি স্বতঃসিদ্ধতার চত্বরে এবং দ্বিতীয়টির অধিবিদ্যার চত্বরে। পরম সত্ত্বা, উচ্চতম সত্য, অনুভূতি-অতীত সত্ত্বা ছাড়া অন্য সবকিছুই অনুভূতির চত্বরে অস্তিত্বশীল।

অতএব, যাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যতার মূল্যবোধের ধারক, তা অধিবিদ্যক দিক থেকেও সর্বোচ্চ সত্য। সুতরাং হিন্দু ঐতিহ্য উত্তমকে সত্যের সাথে চিহ্নিত করে। মূল্যবোধ ব্যবস্থার বেলায় যেরূপ, অধিবিদ্যক পরিকল্পনায়ও সেরূপ এক প্রকার ক্রমধারা বিদ্যমান, যা অনুভূতি পরায়ণ ও অনুভূতি অতীত উভয় জগতকে সামিল করে।

একটি নির্দিষ্ট ধারায় পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুসমূহ যেমন মন, বুদ্ধি ইত্যাদি, যা কিছু বস্তুগত এবং যাহা কিছু অনুভূত জগত তৈরি করে, সব গুলিকে একটি ক্রমধারায় যুক্ত করা হয় এবং অন্যদিকে আত্মা, পুরুষ হল অনুভূতি-অতীত, অনুভূতির জগতের উচ্চতম থেকে উচ্চতর। কঠোপোনিষদ উপনিষদ এর নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদটি বিবেচনা করা যাক:

ইন্দ্রিয় অনুভূত বস্তুগুলি ইন্দ্রিয়ের থেকে উচ্চতর, এবং মন ইন্দ্রিয়ানুভূত বস্তুগুলি থেকে উচ্চতর, কিন্তু বুদ্ধি বা যুক্তি মনের থেকেও উচ্চতর এবং মহৎ, বুদ্ধি থেকেও উচ্চতর। পুরুষ অব্যক্ত থেকে উচ্চতর। পুরুষের উপরে কিছুই উচ্চতর নাই, যা শেষ গন্তব্য ও শেষ সমাপ্তি; অর্থাৎ চরম ও পরম সত্য।

মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ কথা গুলি সাংখ্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। অব্যক্ত হল প্রকৃতি, পদার্থিক বিশ্বের আদি বস্তুগত উপাদান এবং পুরুষ বা পরম সত্ত্বা, যিনি বস্তুগত প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, তাকে প্রকৃতি থেকে উচ্চতর বিবেচনা করা হয়।

অতএব, অধিবিদ্যক ক্রমধারায় শেষ বিচারে, আত্মা ও অনাত্মের মধ্যকার পার্থক্যে, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার পার্থক্য হল অনুভূতি অতীত বনাম অনুভূতির জগৎ। এই পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানের দ্বি-শ্রেণিতে বিভক্তি, যথা-উচ্চতর ও নিম্নতর জ্ঞান, হিন্দু ঐতিহ্যে চিহ্নিত করা যায়। উচ্চতর জ্ঞান, যা আত্ম বা পুরুষকে উপলব্ধি করে এবং নিম্নতর জ্ঞান,

CamScanner

যা প্রকৃতি এবং এর উৎপন্ন বস্তু নিচয়কে হৃদয়াঙ্গম করে, যেগুলি বস্তুগত ও অনুভূতি পরায়ণ।

৩.৩ *উচ্চতর প্রজ্ঞা ও নিম্নতর জ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্ক*

এই স্তরে দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যকার সংযোগের প্রশ্নটি বিবেচনা করা যায় এবং এই দুইয়ের অবস্থান ও এক স্তর থেকে অন্য স্তরের দিকে গতিশীলতার বিষয় চিন্তা করে দেখা যায়। এ প্রশ্নটি জ্ঞানের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়, যেহেতু এটি জ্ঞানের আলোচনা, এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যায় যে, উপনিষদের মতে উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে হয় (দ্ব্য বিদ্বে ব্যেদিতব্যে)।

প্রথমত, ইহা বলে না যে, কেবল উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করতে হয় এবং নিম্নতর জ্ঞান অর্জন করতে হয় না। বস্তুত, উচ্চতর ও নিম্নতর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে বলা যায়, যে ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করেছে, সে উহার মত, যে ব্যক্তি একটি পাহাড় চূড়ায় আরোহন করেছে। সে তার অভিজ্ঞতামূলে অর্থপূর্ণভাবে কোনটি উচ্চতর থেকে নিম্নতর তা নির্দেশ করতে পারে (অর্থাৎ যেহেতু সে পর্বতচূড়ায় আরোহন করেছে, সেহেতু উপর দিক থেকে নিচের দিকে তার অভিজ্ঞতামূল্যে সে উঁচু-নিচু নির্দেশ করতে পারে, কিন্তু যে চূড়ায় আরোহন করেনি তার মধ্যে এরূপ তুলনামূলক জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়)। এই জন্য উপনিষদ বলেন, *ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে জ্ঞাত হয় (ব্রাহ্মবিদ্যায় পারদর্শী); অর্থাৎ যারা সত্য আত্মস্থ করেছে অথবা উচ্চতার সত্য জ্ঞান উপলব্দি করেছে, একমাত্র তারাই এইরূপ পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে।* আর্থাৎ কিনা, অন্যরা এইরুপ পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম নয়।

দ্বিতীয়ত, হিন্দু ঐতিহ্য কোথাও বলেনা যে, নিম্নতর জ্ঞান অথবা নিম্নতর জ্ঞানের স্তরে হৃদয়ঙ্গমকৃত বিদ্যা অকেজো। পূঁজা ও জ্ঞানের আদেশ দিয়ে এমন সব মন্ত্র আছে, যেগুলি দ্বারা বুদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা যায়; যেগুলি এই পৃথিবীতে সুখী জীবনের জন্য প্রয়োজন। শংকরাচার্য পর্যবেক্ষণ করেন যে, পবিত্র গ্রন্থে বুদ্ধি ও সমৃদ্ধির নির্দেশ করা বাছনী শক্তি দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা, অনাসক্তি গুণান্বিত হওয়া যায় এবং যার মধ্যে উচ্চতর জ্ঞানের জন্য প্রেরণা ও অভিলাষ বিদ্যমান। অন্য প্রেক্ষাপটে, শংকরাচার্য

CamScanner

নির্দেশ করেন যে, শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান, সামাজিক ভাল আচরণ, বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া ও সন্তান পালন করা, অতিথিপরায়ণতা ইত্যাদি, যা বেদ কর্তৃক নির্দেশিত, তা অবহেলা করা উচিত নয়। কেননা এগুলি মানবতার গন্তব্যে উপনীত হওয়ার সহায়ক।

অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ, পার্থিব ও ধর্মীয়, যেগুলি অনুভূতির ভুবনের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলিকে উপনিষদে সত্যমরূপে অর্থাৎ সত্যরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেহেতু এগুলি মানবিক গন্তব্যে উন্নীত হওয়ার পথ সুগম ও নিশ্চিত করে। শাস্ত্র অধ্যায়ন, রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কিত, অংক শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, প্রেম সম্পর্কিত ও নাচ-গান, শিল্পকলা ও ভাস্কর্য ইত্যাদি হিন্দু ঐতিহ্যে কোন স্থানই পেত না, যদি না নিম্নতর জ্ঞানকে উপকারী বিবেচনা করা হত। উদাহরণ স্বরূপ, নারদ যেই সব বিদ্যায় পারদর্শিতার দাবী করেন তা হৃদয়গ্রাহী, কেননা তা অনুভূতি-সম্পন্ন বিদ্যাদির সম্পূর্ণ স্তরকে নির্দেশ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন অসুখী, কেননা তিনি উচ্চতর জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নাই। মনে রাখা প্রয়োজন যে, দর্শনকে নিম্নতর জ্ঞানের স্তরে নিবিষ্ট করতে হয়, যদি না তা পরম সত্যকে উপলব্ধি করার উচ্চতর জ্ঞান উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়; কেননা, উপনিষদের মতে উচ্চতর জ্ঞান হল, যা জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বত্র উপলব্ধি করে, যদিও তা অনুভূতিতে ও মননশক্তিতে ধরা দেয় না, যাহা উৎস বিহীন, আকৃতি বিহীন, দৃষ্টি বর্হির্ভূত, শ্রুতি বহির্ভূত, যাহা হাতে পায়ে স্পর্শ করা যায় না, ধরা যায় না, অতিক্রম করা যায় না, যা চিরস্থায়ী, বহুগুণী, সর্বত্র বিরাজমান, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম এবং অক্ষয়, এবং সর্বোপরি যা সবকিছুর উৎস।

তৃতীয়ত, জ্ঞানের ক্রমগতি নিম্নতর জ্ঞানের স্তর থেকে উচ্চতর জ্ঞানের দিকে, এর বিপরীত নয় (অর্থাৎ জ্ঞানের ক্রমগতি উচ্চতর থেকে নিম্নতরের দিকে নয়)। নিম্নতর জ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিসর সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া উচিত; কেননা নিম্নতর জ্ঞানের বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্নতা উচ্চতর জ্ঞানে উপনীত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে...।

CamScanner

এই কারণে উপনিষদ বলে, কর্মের মাধ্যমে উপার্জিত পার্থিব সম্পদকে পরীক্ষা করার পরই একমাত্র কোন ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞান আহরনের অন্বেষায় বৈরাগ্য অবলম্বন করতে পারে। এর ভাষ্য রচনায় শংকরাচার্য মন্তব্য করেন যে, যে ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের উপসর্গ বা মাধ্যম ও গন্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে সেই-ই উচ্চতর জ্ঞান অন্বেষণের উপযুক্ত। এর জন্য অন্যান্য কারণও রয়েছে, যদ্বারা জ্ঞানের ক্রমগতি নিম্নতর থেকে উচ্চতরের দিকে প্রতীয়মান হয়। সর্বজন বিদিত যে, আমরা শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে 'জানা থেকে অজানার দিকে' অগ্রসর হই। সচরাচরভাবে, কোন ব্যক্তির পক্ষে উচ্চতম সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয় যাকে বলা হয় নিস:প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিশ্বশৃংঙ্খলহীন বা বিশ্বাতীত, (Acosmic), নিঃগুণ, নির্বিশেষ, একক, যার কোন দ্বিতীয় নেই, (একমেবা অদ্বিতিয়ম); বহুগুণী বিশ্ব, যা নিম্নতর জ্ঞানের পরিসরে নিবিষ্ট, তা থেকে মুক্ত। অতএব, সচরাচর ক্রমগতি নিম্নতর জ্ঞান থেকে উচ্চতর জ্ঞানের দিকে, যেমন, কোন বৃক্ষের ডালের দিকে নির্দেশ করে চাঁদ দেখানো যায়। অধিকন্তু, স্থুল বস্তুকে প্রথমে শিক্ষা দিয়ে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

অধিবিদ্যক ক্রমাগতিতে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি নিম্নে স্থাপিত হয় এবং পুরুষকে উচ্চে স্থাপন করা হয়, যা সূক্ষ্ম এবং স্থুলের স্তর থেকে উর্ধ্বে বিবেচ্য। পুরুষের পরমাত্মা শংকরাচার্যের মতে, সর্বোচ্চ স্তরের; কেননা ইহা সর্বাধিক সূক্ষ্ম, সর্বাধিক মহান এবং সবকিছু থেকে সর্বাধিক অন্তঃস্থিত।

ইহা স্বীকার করা হল যে, সত্যাসত্য বেছে নেয়ার স্বাধীনতা (axiological choice) অথবা শ্রেণীগত তারতম্যে এক শ্রেণীকে অন্য শ্রেণী থেকে অধিকতর গ্রহণীয় বিবেচনা করা (catagory preference) বিষয়ে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি রয়েছে। তবে ইহা মানতে হয় যে, কোন ব্যক্তিকে আনন্দদায়ক গ্রহণ করার পরিবর্তে উত্তম পন্থা অনুসরণ করতে অথবা অনুভূতি প্রবণ পন্থার পরিবর্তে অনুভূতি অতীত (সূক্ষ্ম) পন্থা অনুসরণ করতে বাধ্য করা যায় না। হতে পারে যে, এমন কোন ব্যক্তি যার মধ্যে সত্যাসত্য বা অধিবিদ্যক বিষয় এর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা নাই অথবা মূল্যবোধ বা শ্রেণিগত চিন্তার যোগ নাই, তার জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিক বেন্থাম (Benthan) এর কথায়, Push-pin is as good as poetry

CamScanner

পরিশিষ্ট: ১

Typology of Knowledge in the East and the West
প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান প্রকরণ
ক. জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়া

আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি। আমাদের চক্ষু, নাশিকা, শ্রবন, জিহবা ও ত্বক বস্তজগতের জানার সিংহ দ্বার এই ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীন এবং বহির্জগতের বস্তসমূহকে এক এক করে অথবা সামষ্টিকভাবে অনুভব করি। অতএব, মানুষের অনুভূতি অন্তরজগত এবং বহির্জগতকে জানার প্রাথমিক উৎস। জানার এই প্রাথমিক উৎসকে আমরা অনুভূতির জ্ঞান নামে অভিহিত করতে পারি।

অনুভূতিকে ইংরেজি ভাষায় বলে পারসেপশন (perception) এবং আরবীতে বলে ইহ্‌সাস্। আর অনুভূতিলধ্ব জ্ঞানকে ইংরেজিতে বলে পরসেপ্ট (percept) এবং আরবিতে বহুবচনে বলে মাহ্‌সুসাত। তাই আমরা বলতে পারি মানুষের মানুষের জ্ঞানের প্রস্ত অনুভুতির চত্বরে, পারসেপশনে বা মাহসসাতে নিহিত। কিন্তু অনুভূতির জ্ঞান অপূর্ণ। ইহা পূর্ণতা লাভ করে যখন ইহা মস্তিস্কের চত্বরে প্রবেশ করে একটি 'ধারণায়' পরিণত হয়। যেমন একটি চতুষ্পদ জন্তু দেখে, আমার মনে একটি গরুর ধারণা সৃষ্টি হয়। যখন হাতের ত্বকে গরম অনুভব করে আমার মনে আগুনের ধারণার উদ্ভব হয়। আযানের শব্দ শুনে সালাত বা নামাযের ধারণা, উলুধবনি শুনে পূজার ধারণা, খুশবু শুকে আতরের ধারণা ইত্যাদির উদ্ভব হয়। অতএব, অনুভূতি ধারণায় পূর্ণত্ব লাভ করে।

সুতরাং আমরা সাধারণ ভাবে বলতে পারিঃ অনুভূতি ধারণায় পূর্ণত্ব লাভ করে, perception, conception এ ও percept, concept-এ পূর্ণত্ব লাভ করে। অনুরুপভাবে ইহ্‌সাস মাহ্‌সুসে এবং বহুবচনে মাহ্‌সুসাতে পূর্ণত্ব লাভ করে। শরীরবৃত্ত (physiology) এবং মনোবিজ্ঞান (psychology)

CamScanner

জ্ঞান, এ্যারিস্টটল কর্তৃক তা বর্ণিত তা উপনিষদের পরাবিদ্যার সমতুল্য। ইহা অর্জন করা বিধেয়; কেননা ইহা পরিত্রাণের জ্ঞান। এখানে যে বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে, তা হলো একক সত্তার জ্ঞান, সবকিছুর প্রথম এবং শেষ কারণের জ্ঞান, যা গৌণ নয় বরং মূখ্য। এই মূখ্য জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান, যা মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করে (সা বিদ্যাযৎ বিমুক্তয়ে)।

৩.৪ স্বজ্ঞান, আত্মচেতনা : সকল জ্ঞানের পূর্বশর্ত

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকরা স্বজ্ঞান বা চৈত্য চেতনাকে কর্তৃবাচক বা কর্মবাচক - এই দুইভাগে বিভক্ত করে স্বজ্ঞান ও জ্ঞাত বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করেন। এই দ্বি-বিভক্তির চত্বরে তাঁরা বাহ্যিক বস্তু সমূহের জ্ঞান ও আত্মিক আভ্যন্তরীন জ্ঞানকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন হল মানসিক। মনের এবং আত্মার কর্মতৎপরতা ব্যতিরেকে কেবল ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের বাহ্যিক বস্তুসমূহের জ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম হয় না। মন অথবা বুদ্ধিসত্ত্বা আমাদেরকে আত্মার তৎপরতা ব্যতিরেকে কোন প্রকার জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। অদ্বৈতবাদীদের মতে, আত্মা হল স্বজ্ঞান এবং স্বজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে কোন জ্ঞান সম্ভব নয়।

শংকরাচার্য দুই প্রকার দৃষ্টির কথা বলেন: জ্ঞানের দৃষ্টি, বিশুদ্ধ সত্ত্বার দৃষ্টি বা দর্শন এবং জ্ঞান মনোবৃত্তির দর্শন (আর্থাৎ অনুভূতি পরায়ণ সত্ত্বার দর্শন)। শংকরাচার্যের কথায়, দেখা দুই প্রকারঃ সচরাচর দেখা, যা মনের দর্শন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যেমন, দৃষ্টির ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাথে সম্পৃক্ত, ইহা একটি কর্মতৎপরতা, অতএব, এর সূচনা ও পরিসমাপ্তি আছে; কিন্তু যা আত্মার মাধ্যমে দেখা যায়, তা আগুনের তাপ ও আলোর মত, যা প্রকৃতপক্ষে আত্মারই নিজস্ব গুনাগুণের স্বাক্ষ বহনকারী, ইহার কোন আদ্য নাই, ইহার অন্ত নাই। ...তবে সচরাচর দেখা, দৃষ্ট বস্তুর সাথে দর্শনকারী চোখের মাধ্যমে সম্পর্কিত হয়, অতএব, অবশ্যই ইহার প্রারম্ভ আছে। ...আত্মার চিরন্তন দেখার ব্যাপারটি উপমার মাধ্যমে দেখা বা দর্শন করা রূপে ব্যক্ত হয়।

যদিও চিরন্তন দর্শনকে কখনও কখনও দেখা বলে আখ্যায়িত করা হয়। হুসার্ল (Husserl)- এর মত অদ্বৈতবাদীরা বলে থাকেন যে, স্বজ্ঞান হল

সূত্রের সূত্র (Principle of Principles) এবং এই যে, স্বজ্ঞানের প্রমাণই হল একমাত্র নিশ্চয়তার স্বাক্ষ্য এবং আমাদের দাবীর একমাত্র নির্দেশক; আমাদের এই দাবী যে, আমরা কিছু জানি এবং আমরা কিছু জানি না। জ্ঞানের প্রত্যেক উৎস স্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, তা অনুভূতির মাধ্যমে হোক অথবা যুক্তির মাধ্যমে হোক অথবা ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে হোক। স্বজ্ঞান সকল প্রকার জ্ঞানের পূর্বশর্ত এবং জ্ঞানের কোন উৎসকে অন্য কোন সূত্রের দ্বারা বৈধ করা যায় না। যেহেতু ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও যুক্তিবোধ উভয়ই স্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু পাশ্চাত্যের জ্ঞানতত্ত্বের যুক্তি বনাম অনুভূতির বিতর্ক, যা ডেকার্ত (Descartes) এবং লক (Locke) এর সময় থেকে জোরদার হয়েছে, তা হিন্দু ঐতিহ্যে অনুপস্থিত। হিন্দু ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে এরূপ বিতর্কের মনোভাবের কোন চিন্তা করা যায় না যে, মানবিক জ্ঞান কেবল উপরোক্ত দুইটি স্তরে সীমাবদ্ধ, যথা, সম্পর্ক জনক ধারণা (আঙ্গিক জ্ঞান) এবং তথ্যগত জ্ঞান (অনুভূতি জ্ঞান)।

পরম সত্য, যা অনুভূতির অতীত, তা ইন্দ্রিয় এবং যুক্তির মাধ্যমে জানা যায় না। যদিও যুক্তি আমাদেরকে এ ক্ষেত্রে জানার প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে পারে যে, বিশ্ব চরাচরে এক পরম সত্য বিদ্যমান আছে, যা বিশ্বজগতের অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি বা কারণ। যুক্তি আমাদেরকে সত্যের গৌণ জ্ঞান প্রদান করতে পারে (অর্থাৎ অনুভূতি যেমন আমাদেরকে অনুভূত বস্তুর মূখ্য জ্ঞান প্রদান করতে পারে, তেমনি যুক্তি আমাদেরকে পরম সত্যের গৌণ জ্ঞান আহরণ করতে সহায়তা করে)। হিন্দু ঐতিহ্যের মতে, অনুভূতি অতীত সত্বা, একমাত্র ধর্ম গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় ও উপলব্ধি করা যায়। ইহা পবিত্র জ্ঞানের উৎস এর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে। এই যুক্তিতে যে, পবিত্র গ্রন্থ যা শিক্ষা প্রদান করে সেগুলোকে বুঝতে হবে যে, এগুলি উচ্চতর জ্ঞান আহরণ করারও সহায়ক।

এরূপ আভ্যন্তরিনমূল্য বা মূল্যবোধের বাছনীর বিবেচনায় উপনিষদ বলে-মানুষের পক্ষে আত্মাকে জানা উচিত শ্রবণের মাধ্যমে, যুক্তির মাধ্যমে ও অনুধাবনের মাধ্যমে। জ্ঞানের নিম্নতর থেকে উচ্চতরের দিকে ক্রমগতি এমনভাবে লোকের মধ্যে সংঘটিত হয় যে, যা জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের দ্বারা

CamScanner

বিরোধযোগ্য নয় এবং অন্যান্য জ্ঞানের উৎসগুলি যা ব্যক্ত করে, ইহা অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ তার নিরোক্তি নয়।

পবিত্র গ্রন্থ ও জ্ঞানের আন্যান্য উৎসের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। ধর্মগ্রন্থ যেখানে অনুভূতির অতীত সত্যের চত্বরে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে অন্যান্য জ্ঞানের উৎসগুলি অনুভূতির দ্বারা সীমিত। অতএব, উভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোন সুযোগ নেই অথবা একটির কাজ অন্যটির দ্বারা সম্পন্ন হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।

৪. পার্থিব বিশ্ব বা প্রকৃতি

৪.১ ক্ষেত্রের ধরণ

মানব সত্ত্বা একটি জটিল অস্তিত্ব, যা আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হল যুক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা। যুক্তি হল পূর্ণত্ব বা পরিত্রাণ বা মুক্তি উপলব্ধির সামর্থ্য এবং স্বাধীন ইচ্ছা হল পূর্ণত্ব অর্জনের কর্মতৎপরতার সামর্থ্য। শংকরাচার্য এই দুয়ের পার্থক্য নিরূপন করে বলেন: এর একটি হল জ্ঞানের একক এবং অন্যটি হল কর্মের প্রকরণ। যুক্তি ও স্বাধীন ইচ্ছা উভয়ের কর্মব্যস্ততা একটি দৈহিক মাধ্যমের পূর্বশর্ত পূরণ করে, যা মানুষের মন-অনুভূতি-দেহ এর সামগ্রিক রূপায়ন হিসাবে অধিকারভুক্ত রয়েছে। মন-অনুভূতি-দেহ হচ্ছে সমগ্রতা, যা বস্তুগত- তা মানুষকে জানার, অনুভব করা ও কার্যকর (cognitive-affective-conative) অভিজ্ঞতায় নিমগ্ন করে, তাকে অনুভূতিপ্রবন অস্তিত্বে বসবাসরত করে।

এখানে এই তিনটি উপাদানের কার্যক্রমের আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনার প্রয়োজন নাই। এই তিনটি উপাদান আলাদাভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে মানুষকে জীবনের নানা প্রকার কার্যক্রমে সহায়তা করে। আমাদের উপভোগের জন্য বাহ্যিক বস্তুগত বিশ্বও বিদ্যমান। হিন্দু মতে, মন-অনুভূতি-দেহ এর সামগ্রিকতা এক পার্থিব জগতের উপস্থিতি আমাদের পক্ষে আনন্দ উপভোগ করা এবং উত্তম কর্ম সাধনের জন্য প্রয়োজন। এ কথাটি বুঝাবার জন্য হিন্দু ধর্ম 'ক্ষেত্র' শব্দটির ব্যবহার করে। এর অর্থ হলো, উভয়বিদ মন-অনুভূতি-দেহ সামগ্রিকতা এবং পার্থিব জগতের অবস্থান

CS CamScanner

হেতু আত্মা বা আধ্যাত্মিকতার বিপরীতে অন্যান্য সব কিছুর, যেগুলি প্রকৃতির শ্রেণী ভুক্ত হয়, তা আত্মার জ্ঞানের বিষয়বস্তুতে পরিনত হয়, যাকে প্রকৃতির জ্ঞাতরূপেবিবেচনা করা হয়।

সংস্কৃত শব্দ 'ক্ষেত্র' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মন-অনুভূতি-দেহ এর সামগ্রিকতাসমূহকে ক্ষেত্র বলা হয়, কেননা ইহা সত্ত্বাকে মন্দ থেকে রক্ষা করে, রক্ষাকারী জ্ঞান উৎপন্ন করার দিকে মনকে অনুপ্রাণিত করে (জ্ঞানুৎপাদন দ্বারা ক্ষততে ত্রয়াতে ইতি ক্ষেত্রম) অথবা ইহা ধ্বংস করে বা পরিবর্তন সাধন করে (ক্ষিয়াতে ইতি ক্ষরতি ইতি বা ক্ষেত্রম) অথবা কারণ ইহা একটি ক্ষেত্র-কর্মের ফল আহরণের জন্য (কর্মপালনম আমিন নিপতে ক্ষেত্রম)। যেহেতু মন-অনুভূতি-দেহের সামগ্রিকতাকে ক্ষেত্র বলা হয়, এই কারনে যে, ইহা বাহ্যিক জগতের উপর প্রয়োগ করা হয়, সেই জন্য প্রয়োগস্থল হিসেবে ব্যহ্যিক জগতকে ক্ষেত্র বলা হয়। সুতরাং আত্ম বা আধ্যাত্মিক সত্তা ভিন্ন অন্য সব কিছু হিন্দুধর্ম মতে বস্তুগত।

৪.২ বিশ্বের উৎস : চিরঞ্জীব পরমাণু

প্রত্যেক বস্তু,যাহা সমন্বিত ও সীমাবদ্ধ, যেমন একটি পাত্র, একটি টেবিল কোন একটি বস্তুগত আরামের দ্বারা উৎপন্ন কার্য বা ফলশ্রুতিই বটে। তাই যদি হয়, বস্তুগত বিশ্বের কারণ কি হবে, কেননা এই পার্থিব বিশ্বজগতে বহুবিধ বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি বস্তু সীমায়িত। হিন্দু ধর্ম এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর প্রদান করে। আমরা প্রথমে, বৈশেষিকদের উত্তর বিবেচনা করতে পারি। বৈশেষিকদের মতে, এই বিশ্বের সব কিছু সৃষ্ট নয়, ইহা চিরন্তন চারটি পরমাণু (Enternal substances) তথা চার প্রকার পরমাণু: আকাশ, ক্ষেত্র, সময়, মন-আত্মা এবং সমন্বিত বস্তুসমূহের মধ্যে বিভেদ করে থাকে। তাঁদের মতে, বিশ্বজগতের সকল সমন্বিত বস্তুসমূহ চিরন্তন পরমাণু দ্বারা উৎপন্ন, পরমাণুগুলি আসলে অবিভাজ্য এবং অসীম। এই দর্শনের মতে, পদার্থিক পরমাণুগুলি চার প্রকার যথা বাতাসের পরমাণু, আগুনের পরমাণু, পানির পরমাণু ও মাটির পরমাণু এবং এই সবগুলি সমন্বিত বস্তু, সুতরাং এগুলি অচিরন্তন বস্তু, এবং সাধারণ পরমাণুর সমষ্টি।

বৈশেষিকদের 'পরমাণুবাদ' স্থান, কাল, আকাশ, ও মনের উপর প্রযোজ্য নয়। যেহেতু এই বস্তুগুলি চিরন্তন, এইগুলি সৃষ্টি হবে না, ধ্বংসও হবেনা। যেহেতু এই বিশ্ব জগতে সবকিছু পদার্থিক পরমাণুর উৎপন্ন না, তাই বৈশেষিক দর্শনকে বস্তুবাদী রূপে চিন্তা করা অবান্তর। বৈশেষিক পরমাণুর সংযুক্তি-বিযুক্তি বিবেচনা করে, এগুলিকে যথাক্রমে সৃষ্টি ও ধ্বংসরূপে বর্ণনা করা হলে-যা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, যিনি পরমাণুগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং একে বিশাল নৈতিক ব্যবস্থায় বিন্যস্ত করেন। ব্যক্তির আত্মসমূহের আদর্শ ও অনাদর্শের গুণাগুণের ভিত্তিতে ন্যায়বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং বিশ্বজগত বৈশেষিকদের বিবেচনায়, প্রাণীজগত ও পদার্থিক বস্তু দ্বারা গঠিত। এইগুলির একাংশ চিরন্তন এবং অন্য অংশ অচিরন্তন, শেষোক্ত গুলি সৃষ্টি ও ধ্বংস প্রক্রিয়ার অধীন।

৪.৩ বিশ্বের উৎস : আদি পদার্থ

শৈববাদী, বৈষ্ণববাদী ও ঈশ্বরবাদী দর্শন এবং অদ্বৈতবাদী ঈশ্বর-অতীত দর্শনের দ্বিতীয় প্রকারের উত্তর বিবেচনা করা যাক। এই গুলির মতে, আত্মার বিপরীতে বস্তুবাদী বিশ্বের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির উৎসমূল এক আদি পদার্থিক দ্রব্যের মধ্যে খুঁজতে হবে, যা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়, যেমন প্রকৃতি, মায়া, অব্যক্ত ইত্যাদি। বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও লয় একের পর অন্যটি সংঘটিত হতে থাকে, যেমন দিন ও রাত্রির পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষণীয়। যখন বিশ্ব জগৎ আদি পদার্থিক দ্রব্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ ব্যবস্থায় প্রতীয়মান হয়, ইহাকে স্থায়ী বলা হয়। যখন ইহা এর আদি উপাদানে প্রত্যাবর্তন করে এবং অপ্রতীয়মান অবস্থায় অবস্থান করে, ইহাকে ধ্বংস বা লয় বলা হয়। যেহেতু আত্মা, যা পুরুষ বা আত্মন নামে পরিচিত, তা চিরন্তন, সেহেতু ইহা সৃষ্টি ও লয়ের পরিক্রমাভূক্ত নয়; যদিও ইহার অনুভূতিতে বিচরণ কালীন সময়ে ইহা দেহ, মন, সত্ত্বার দ্বারা সজ্জিত ছিল। তা সে ক্ষেত্রে, স্থায়ী ও লয় পর্যায়ক্রমার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

বৈশেষিকার মতে, এই দর্শনগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যিনি অপ্রতীয়মানকে প্রতীয়মান করেন, প্রতীয়মানকে আবার অপ্রতীয়মান অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। যা পদার্থিক বিশ্ব, তা আদি পদার্থ দ্রব্য থেকে উৎপন্ন, তারই

উপর বর্তায়। ইহা অবশ্য নিজে নিজে এই পরিবর্তনের পরিক্রমা ঘটাতে পারে না।

অবশ্য উপরোক্ত ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরাতীত দর্শনের মধ্যে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ বিদ্যমান। যেখানে ঈশ্বরবাদী দর্শন মনে করে যে, আদি পদার্থিক দ্রব্য, যা বিশ্বের উপাদান, তা চিরন্তন ও ঈশ্বরের সাথে সমঅস্তিত্বশীল (Coeval); সেখানে ঈশ্বরাতীত দর্শন এর মতে, ইহা চিরন্তন নয়, এবং এই দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুই চিরন্তন নয়, একমাত্র অদ্বৈত ব্রাহ্মণ ছাড়া। যিনি একক সত্য। চিরন্তন হোক বা না হোক, মায়া/প্রকৃতি/অব্যক্ত, যা আদি উৎস, তা ঈশ্বর থেকে স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল অথবা কর্মতৎপর হতে পারে না।

৪.৪ হিন্দু বিশ্ব দর্শনের কয়েকটি তাৎপর্য

এই স্তরে পদার্থিক বিশ্ব দর্শনের কিছু তাৎপর্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। আমরা যেভাবে বস্তুর প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করি, তার একটি দিক হল পদার্থিক কারণ অনুসন্ধান করা। মাটির তৈরি একটি পাত্র মূলত মাটি, কাঠের তৈরী একটি টেবিল মূলত কাঠ। পদার্থিক জগত বা পার্থিব জগত যদি মায়া অথবা প্রকৃতি অথবা অব্যক্ত এর উৎপন্ন হয়, তাহলে ইহা মূলত বস্তু; কেননা ইহার কারণ বস্তুগত। কোন একটি বস্তু, যার সংস্কার করা যায়, তা যখন পরিবর্তিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাকে এক অবস্থায় কারণ বলে এবং অন্য অবস্থায় কার্য বলে (Cause and Effect), অর্থাৎ কিনা কারণ ও কার্যের মধ্যে পার্থক্য হল, একই বস্তুর এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা।

হিন্দু বা হিন্দুধর্ম কারণ ও কার্যকে দুইটি আলাদা সম্পর্কহীন বস্তু বা দ্রব্যের অস্তিত্ব বলে চিন্তা করে না। তাই যদি হত, তবে হিউম (Hume) যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার উত্তর প্রদান করা কষ্টসাধ্য হত। যদি কারণ ও কার্য ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সমস্ত হত, বা স্থান দ্বারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হত, তবে তাদের খণ্ডত্ব অতিক্রম করার কোন উপায় থাকত না এবং হিউম (Hume)-এর প্রশ্ন অনুত্তরযোগ্য থেকে যেত।

CamScanner

হিন্দুবাদ কারণ ও কার্যের আভ্যন্তরীন বন্ধন বা যোগসূত্রের উপর অত্যাধিক জোর দেয় এই বলে যে, কার্যটি তার বস্তুগত কারণ থেকে অভিন্ন (কার্যকারণ যোগ্র অনন্যত্বম)। কেবল প্রকাশ্য জগত এবং তার আদি উৎসের মধ্যে আভ্যন্তরীন যোগসূত্র বিদ্যমান নয়, বরং তদুপরি ঈশ্বর এবং আদি উপাদানের মধ্যেও অনুরূপ আভ্যন্তরীণ পরিবন্ধ বিদ্যমান। ঈশ্বর এবং প্রকৃতি/মায়া/অব্যক্ত এর মধ্যকার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সম্বন্ধে হিন্দু ঐতিহ্যে একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। কারও মতে, এই সম্পর্ক মায়া, যা প্রভুর শক্তি রূপে বিদ্যামান। অন্যদের মতে, ঈশ্বর উভয়বিদ পদার্থিক এবং চালিকা শক্তির মধ্যে একত্রিভূত, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের পদার্থিক কারণ ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

যেহেতু আত্মা বা আধ্যাত্মিক সত্ত্বা ছাড়া অন্য সব কিছু পদার্থিক, এক্ষেত্রে মন ও দেহ জনিত দ্বিত্ববাদ হিন্দু দর্শনে নাই। মন এবং পদার্থ একইভাবে ভিন্নতর বস্তু সত্ত্বা নয়, যে রূপে দেকার্তের সূত্রে (Cartesian Theory) ধারণা করা হয়। অতএব, হিন্দুবাদ রিডাকশনিজম (Reductionism) সমস্যা থেকে মুক্ত; অর্থাৎ পদার্থকে মনের মধ্যে বিলীন করা। অবশ্য হিন্দুবাদের মধ্যে অন্য এক প্রকার দ্বিত্বের উদ্ভব হয়; আত্মা ও পদার্থের দ্বিত্ব, পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বিত্ব। এই দ্বিত্ববোধ দুইটি সত্ত্বাকে পদার্থিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে না, যদিও একটা থেকে অন্যটাকে পার্থক্য করার প্রয়োজন হয়। এই দুই সত্ত্বার মধ্যকার সম্পর্ক স্থান ও স্থানীয় পরিশুদ্ধ দ্বারা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস অথবা আত্মা ও দেহের মধ্যকার আঙ্গিক সম্পর্ক দ্বারা ইহা বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে অন্তর্যামীর ধারণা, যা উপনিষদ গুলির একটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে বিবেচনা করা যায়। উপনিষদ বলেঃ আত্মা হল সব কিছুর অন্তর্নিহিত শাসনকর্তা। প্রথমত, ইহা বলেঃ যিনি পৃথিবীতে বাস করেন, যদিও পৃথিবীর মধ্যে থাকেন, তথাপি পৃথিবী তাকে জানেনা। যার দেহ পৃথিবী, যিনি আভ্যন্তর থেকে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই তোমার সত্ত্বা, অভ্যন্তরিণ নিয়ন্ত্রক ও অমর।

অতঃপর, ইহা অন্যান্য উপাদানগুলি সম্বন্ধে এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে বলে যে, সত্ত্বা হলেন সবকিছুর অভ্যন্তরীণ শাসক। অবশেষে উপসংহারে ইহা বলেঃ তিনি, যাঁকে কখনও দেখা যায় না, কিন্তু নিজে দ্রষ্টা;

CamScanner

তিনি, যাঁকে কখনো শুনা যায় না, কিন্তু তিনি নিজে শ্রবণকারী; তিনি যাঁকে কখনো অনুভব করা যায় না, কিন্তু তিনি নিজে অনুভবকারী; তিনি নিজে চিন্তাকারী। তিনি ছাড়া অন্য কোন স্রষ্টা নাই, তিনি ছাড়া অন্য কোন শ্রবণকারী নাই।

উপনিষদের অন্তর্যামী পরিচ্ছেদ এর একাধিক ব্যাখ্যা করা যায়। যেভাবে ব্যাখ্যা করা যাক না কেন এতে সর্বোচ্চ সত্য এই যে, হিন্দুবাদের দৃষ্টিতে, তিনি অধিবিদ্যকভাবে সব কিছুতে অন্তর্নিহিত (immanent), মানবজাতি এবং বিশ্বজগতের মধ্যে, কিন্তু একই সাথে সব কিছুর অভ্যন্তরীণ শাসক বা নিয়ন্ত্রক। সঠিক বিশ্লেষণ ও অনুবিশ্লেষণ পর্যায়ে,আধ্যাত্মিক ও পদার্থিক সত্ত্বার পার্থক্য স্বীকার করে, তাদের প্রতি হিন্দুবাদ ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধ এবং অধিবিদ্যক মর্যাদা আরোপ করে। সত্ত্বার উদ্দেশ্যের অধস্তন হবার জন্য, অর্থাৎ প্রভুর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য দেহের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

৫. আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় অনুভূতি

৫.১ আধ্যাত্মিক মনোভাব

আধ্যাত্মিকতা একটি মনোভাব, একটি শৃঙ্খলাযুক্ত জীবন পথ, যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক জাগরণ ঘটে। সাধারণত ইহাকে পদার্থিক জীবন পথের সাথে মুখোমুখি তুলনা করা হয়।

ভগবৎ গীতা, যা হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ গুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়, তা আধ্যাত্মিক মনোভাব ও পদার্থিক মনোভাবের মধ্যে প্রকৃষ্ট পার্থক্য নিরুপণ করে। ইহা উভয়কে যথাক্রমে *দৈত্বী সম্পদ* অর্থাৎ দৈব প্রকৃতি এবং অসুরি সম্পদ আর্থাৎ অসুর প্রকৃতি বলে আখ্যায়িত করে। ইহা দৈব গুণাবলী বা আধ্যাত্মিক পুণ্যগুলিকে নিম্ন রূপে বর্ণনা করে। যথা নির্ভয়, সততা, জ্ঞানের স্তিতিশীলতা ও একাগ্রতা, দানশীলতা, আত্ম সংযম, পূঁজা, পবিত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন, মিতব্যয়, উচ্চমনা, অহিংসা, সত্যাশ্রয়, ক্রোধহীনতা, বৈরাগ্য, প্রশস্তি, কুৎসা রটনা বিমূখতা, মহানুভবতা, নির্লোভ, ভদ্রতা, পবিত্র মনোভাব, নীচতা বিমুক্ততা, পৌরুষতা, ক্ষমাশীলতা, ধৈর্য্য, ঘৃণা বিরহীত, অহংকার বিবর্জিত ইত্যাদি গুণাবলী।

CamScanner

এর বিপরীতে, ইহা আরও একটি অসৎ গুণাবলীর তালিকা প্রদান করে। যথা লোভ, দেখানো আচরণ, ঔদ্ধত্য আত্ম-অহংকার, রাগ, অসহিষ্ণুতা, ভালমন্দের জ্ঞান বিগর্হিত ইত্যাদি, যেগুলি পদার্থিক বা (Demon বা like) প্রেতাত্মক মনোভঙ্গি।

ইহা ঘোষণা করে যে, একজন পদার্থিক মনোভঙ্গি সম্পন্ন লোক কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়, তা জানেনা। অতএব, সে নিজের সমৃদ্ধি এবং সামাজিক কল্যাণকর কোন কাজ করতে সমর্থ হয় না।

এই ব্যাপারে কতগুলি মন্তব্য রেলিভেন্ট বা উপাদেয়।

প্রথমত, এই দুই প্রকার জীবন পথের গুণাবলীর তালিকা প্রণয়ন করা ভগবৎ গীতার উদ্দেশ্য নয়। উভয়বিদ বিষয়গুলির তালিকা কেবল প্রস্তাবনা স্বরূপ। অবশ্য দুই প্রকার মনোবৃত্তির মুখামুখি তুলনা অবশ্যই এতে প্রণয়ন করা হয়েছে (অর্থাৎ এইগুলি অবশ্যই শিক্ষণীয় এবং অনুসরণীয়)।

দ্বিতীয়ত, এর দ্বারা বোধগম্য হয় যে, এই বিশ্বচরাচরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ধর্ম, দেশ, লিঙ্গ, বর্ণ নির্বিশেষে দুই শ্রেণীর একটিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, তা আধ্যাত্মিক হোক অথবা পদার্থিক হউক। অতএব, প্রাচ্যকে নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক বলে গণ্য করা এবং প্রতিচ্যকে নির্বিশেষে পদার্থিক বা বস্তুবাদী বলে গণ্য করা সঠিক নয়। তথা প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার উপর একচেটিয়া অধিকার নেই এবং প্রতিচ্য বস্তুবাদের মধ্যে একচেটিয়াভাবে নিমজ্জিত নয়। আধ্যাত্মিকতা একটি বিশ্বজনীন ব্যাপার, তেমনি বস্তুবাদিতাও একটি বিশ্বজনীন ব্যাপার। যেমন, একজন সমসাময়িক হিন্দু দার্শনিক বলেনঃ এ সব দেশ, যেগুলি সেইন্ট ফ্রান্সিস অব আসিসি (St. Francis of Asisi), সেইন্ট জন অব দি ক্রস (St. John of the Cross), ইখার্ট (Eckhart), বুয়েহম (Boehme), পাসকেল (Pascal), জন বুনিয়ান (John Bunyan) এবং আরও শত শত মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে, সেই সব দেশ হিন্দুবাদের জন্মভূমি থেকে কম আধ্যাত্মিক হবার কথা নয়।

তৃতীয়ত, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এখানে এরূপ কোন প্রস্তাব করা হচ্ছেনা যে, গীতার পাঠে কেবল কতেক ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ দার্শনিক বা ধর্মবিদই আধ্যাত্মিক মনোভাব অবলম্বন করতে সমর্থ এবং অন্যরা তা করতে অসমর্থ। যে কোন

ব্যক্তি ওই সব পুণ্যের প্রতি আগ্রহান্বিত হবে এবং চর্চা করবে যেগুলি আধ্যাত্মিক প্রকৃতির-এর মাধ্যমে সে ব্যক্তি দার্শনিক হোক বা বিজ্ঞানী হোক অথবা শাসক বা সমাজকর্মী হোক, এমন জীবন যাপন করতে সক্ষম হতে পারে, যা আধ্যাত্মিক রূপে পরিচিত। যদিও ইহা স্বীকার করা যেতে পারে যে, আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি যে কেহই নিজের মধ্যে উন্নয়ন করতে পারে, এর থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না যে, মানুষের মধ্যে এরূপ আধ্যাত্মিকতার মাত্রার বিভিন্নতা সত্য অন্বেষণকারীদের মধ্যেও অবশ্যই দেখা দেবে; তারা যেই হোন না কেন, কেননা মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত বিভিন্নতা বিদ্যমান; বিশেষত যেসব ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতা প্রবণ এবং যেসব আধ্যাত্মিকতা প্রবণ নয় তাদের মধ্যে। এই কারণে আমরা কারও সম্বন্ধে বলতে পারি যে, সে অধিকতর আধ্যাত্মিক বা অধিকতর উন্নত।

চতুর্থত, আধ্যাত্মিক মনোবৃত্তি মাত্রই আধ্যাত্মিক জাগরণ সূচিত করে না, ইহা একটি গন্তব্যে উপনীত হবার মাধ্যম মাত্র। কত শীঘ্র বা কত বিলম্বে ইহা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের গন্তব্যেস্থলে উপনীত করবে তা অন্যান্য বহুবিধ বিষয়াদি ও শক্তিমত্তা বা ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং ইহা চিন্তা করা উচিত নয় যে, যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্পন্ন, সে পরিত্রান প্রাপ্তও বটে।

৫.২ ধর্মীয় অনুভূতি

আধ্যাত্মিকতাকে ধর্মীয় অনুভূতির সাথে এক করে বিবেচনা করা উচিত নয়। যদিও কতেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা একটি জীবন পথ হিসেবে ধর্মীয় অনুভূতির অঙ্গ হতে পারে, ইহা সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি করে না।

ধর্মীয় অনুভূতির প্রকৃতি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করে দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা যায়। এমন মনস্তত্ত্ববিদ ও দার্শনিক আছেন যারা মনে করেন যে, ধর্মীয় অনুভূতি বলে তেমন কিছুই নাই এবং ধর্মীয় অনুভূতির নামে যাহা প্রচলন করা হয়, তা একটি বিভ্রান্তিও বটে। অন্যরা মনে করেন যে, ধর্মীয় অনুভূতিকে সাধারণ অনুভূতির থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আরও অনেকে আছেন যাঁরা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, তাঁরা মনে করেন যে ধর্মীয় অনুভূতি কতেক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও ধর্মের সাথে একত্ববোধক। যদি আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মীয় অনুভূতি একই হয়, তবে আধ্যাত্মিকতাকে

CamScanner

বিশ্বজনীন রূপে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না; কেননা উপরে আমরা তিন প্রকার মতামতের সাথে পরিচিত হয়েছি, যাদের একটি ইহার সঠিকতা অস্বীকার করে। অন্য মত ইহার স্বাতন্ত্র্যতা অস্বীকার করে এবং তৃতীয় মত ধর্মীয় অনুভূতির বিশ্বজনীনতা অস্বীকার করে। অবশ্য একটি চতুর্থ মতামতও বিদ্যমান রয়েছে; যার মতে, ধর্মীয় অনুভূতি কেবল সঠিকই নয় বরং তা অসীমতার মাত্রা দ্বারা সঠিকভাবে নিরূপণযোগ্যও বটে।

এই মত অনুযায়ী, ধর্মীয় অনুভূতি প্রথমত, পরম সত্যের আহবানের প্রতি সাড়া। কোনো কিছুর প্রতি সাড়া দেয়ার প্রকৃতি মূলে, ধর্মীয় অনুভূতি কেবল মাত্র আত্ম-অনুভূতি নয়; যে পরম সত্যের প্রতি আমরা সাড়া দেই, তা হুয়াইটহেড এর ভাষায় হলঃ বাস্তবতা, অতীত, বাস্তবতার পশ্চাৎ এবং বাস্তবতা-মধ্যস্থ বিদ্যমান বস্তু সমূহের চলতি প্রবাহ; এমন কিছু, যাহা সত্য, তথাপি উপলব্ধির জন্য অপেক্ষমান; এমন কিছু, যা সুদূর সম্ভাবনাময়, তথাপি বিদ্যমান তথ্যসমূহের মধ্যে মহত্তম।

এই যে পরম সত্য, যার প্রতি আমরা সাড়া দিই, তা উপনিষদের ভাষ্যে *পূর্ববর্তী বিহীন* এবং *পরবর্তীবিহীন*, *বহির্ভূত নয়*, *অন্তর্নিহিতও নয়* এবং *বহিরাবয়ব* বিগর্হিত।

ধর্মীয় অনুভূতির দ্বিতীয় মানদণ্ড হল এই যে, ইহা একটি পূর্ণমাণ সাড়া, সমগ্র সত্ত্বার পক্ষ থেকে, পরম সত্যের প্রতি। ধর্মীয় অনুভূতি হল পূর্ণমান, সম্পূর্ণ মানবিক জীবনের সাথে জড়িত ঘটনা।

ধর্মীয় অনুভূতির তৃতীয় মনদণ্ড হল, অভ্যন্তরীণ গভীরতা। ইহা যে, সর্বাধিক শক্তিমান অনুভূতি, তাই সূচিত করে, যা মানবিক সত্ত্বার সর্বোচ্চ স্তর অনুভব করতে সক্ষম। ধর্মীয় অনুভূতির অভ্যন্তরীণ গভীরতা, যা সকল ধর্মে সর্বজন বিদিত, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আধ্যাত্মিক নেতাগণের জীবনধারা থেকে প্রতিভাত হয়।

চতুর্থ মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে, মানুষের ঐসব কর্মতৎপরতায় ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশিত হয়, যা অন্যদের উন্নতি সাধন করে এবং সকল জিনিসের পূর্ণজীবনে ব্যাপৃত হয় (অর্থাৎ চতুর্থ মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে, তথা অলৌকিক, স্বর্গীয় জ্ঞানপ্রভার আলোকে মানুষের জীবন তৎপরতা সমুন্নত হয় এবং

বস্তুসমূহের স্থিতি ও লয়ের পরে, পূনর্জীবনের প্রক্রিয়ায় কর্মতৎপর হয়)। এরূপ কর্মতৎপরতা 'আমি' বা 'অহম' এবং 'আমার' ভাবানুভূতি থেকে বিমুক্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, হিন্দু ধর্মের *জীবন মুক্ত মহাজন*, বৌদ্ধ ধর্মের *বোধিসত্ত্বা* এর বিষয় উদ্ধৃত করা যায় (অর্থাৎ এই চতুর্থ মানদণ্ডে উপনীত হলে, ঐশী জ্যোতির প্রভাবে সাধক পুরুষ বা সাধনারত মানুষের জ্ঞানীয় উপলব্ধি ও ভাবগতিতে আমিত্বের ধারণা বিলুপ্ত হয়ে স্বয়ং প্রভুর উপলব্ধি জনিত ভাবগতি সংক্রমিত হয়ে যায়)।

এই চার জ্ঞানীয় মানদণ্ডে, ধর্মীয় অনুভূতি পরিচিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মীয় অনুভূতি, যা প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলির সীমাতিক্রম করে যায়, যা স্থান কালের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনা; যা লিঙ্গ, বর্ণ, জাতির প্রভেদ সমভাবে অতিক্রম করে যায়, তা অবশ্যই বিশ্বজনীন। অবশ্য ধর্মীয় অনুভূতির বিশ্বজনীনতা এই অর্থ করা উচিৎ নয় যে, ধর্মীয় অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য নাই। যেহেতু ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল এবং মানুষের সাধ্যের মাত্রানুযায়ী ধর্মীয় সাড়া জাগে, সেহেতু চিন্তা ও কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে বিভেদ দেখা দিতে বাধ্য, যদিও ধর্মীয় অনুভূতির কেন্দ্রবিন্দুতে অর্থাৎ অন্তরাত্মায় সবই সমপর্যায়ের হতে বাধ্য।

মহর্ষি রমন (হিন্দু ধর্মের একজন সমসাময়িক আধ্যাত্মিক গুরু) বলেন, *যদিও অনুভূতির বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে, তথাপি সত্য উপলব্ধির কোন পর্যায় বা মাত্রা নাই।*

আধ্যাত্মিকতা একটি মনোবৃত্তি হিসেবে কোন ধর্মবিশ্বাস সম্বলিত হতে পারে বা নাও হতে পারে। অনেক লোক এমন পূণ্য ধারা অনুসরণ করতে পারে, যা আধ্যাত্মিক বা দৈব, তথা আলৌকিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন এমনকি মানবজাতি সম্বন্ধে, বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে এবং পরম সত্য সম্বন্ধ্যে এক গুচ্ছ ধর্মীয় বিশ্বাসকে গ্রহণ না করেও, অথবা অনুসরণ না করেও হতে পারে। কিন্তু ধর্মীয় অনুভূতি এমন একটি বিশ্বাস ব্যবস্থার ভিত্তিতে অনুভূত হয়, যা নৃতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে। আধ্যাত্মিকতা একটি জীবন পথ হিসাবে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা সম্বলিত হয়। কিন্তু এই শৃঙ্খলা কেবল মাধ্যম হিসেবে এবং গন্তব্য হিসাবে নয়, যাকে নানাভাবে বিবৃত করা

CamScanner

হয়। যেমন, আধ্যাত্মিক জাগরণ, আলোকপ্রাপ্তি, পরিত্রাণ, আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় অনুভূতি, উচ্চতর প্রজ্ঞা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধর্মীয় অনুভূতি বা অন্তর্দৃষ্টি ব্যতিরেকে মানবজীবন, হুয়াইট হেড (White-head)-এর মতে, *কতেক সাময়িক উপভোগের প্রবাহ, যা একগুচ্ছ যন্ত্রণা ও দুঃখকে প্রতিভাত করে, যা একটি সাময়িক অনুভূতির তুচ্ছ ক্রীড়া সাদৃশ্য।*

৬. হিন্দু সংস্কৃতি এবং আধুনিক বিজ্ঞান

৬.১ *হিন্দু ঐতিহ্য : অবস্থিতি ও পরিবর্তন*

হিন্দু ধর্মের বৃহৎ ঐতিহ্য, যা উচ্চতর প্রজ্ঞা ও নিম্নতর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করে, মূল্যবোধের বিচার সমস্যাকে গুরুত্ব প্রদান করে এবং উভয়ের মধ্যে অধিবিদ্যক অগ্রগণ্যতা নিরূপন করে, তা আধুনিক বিজ্ঞানকে আপন করে নিতে পারঙ্গম কিনা? এই আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের ঐতিহ্যের অনুগামী এবং পাশ্চাত্যের বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেই বেঁচে থাকে? এই প্রশ্ন বিবেচনা করা ও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

হিন্দু ঐতিহ্য, যা বৈদিক যুগ থেকে আমাদের নিকট সমভাবে উপস্থিত হয়েছে, তা অতীব প্রাচীন, চার সহস্রাধিক বৎসরের পুরোনো। ইহা অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এর সম্মুখিন হয়েছে। হিন্দু ধর্ম ও দর্শন, জৈনবাদ ও বৌদ্ধবাদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়েছে; যেগুলি মানব জাতির ও বিশ্বজগতের ভিন্নতর চিত্র অংকন করে। বিশেষত: বৌদ্ধবাদের অনাত্মবাদ, হিন্দু ধর্মের আত্মবাদের একটি ভীষণ বিকল্প হিসেবে প্রতিভাত হয়। তবে হিন্দুবাদ, জৈনবাদ ও বৌদ্ধবাদের সম্মিলিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সফলভাবে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। পরবর্তী কালে, আরও দুইটি বিজাতীয় ধর্মের দ্বারা ইহা ভীষণ বিরোধের সম্মুখিন হয়।

প্রথমত, ইসলাম ধর্মের দ্বারা ও পরবর্তীতে খ্রিস্টান ধর্মের দ্বারা। হিন্দুবাদ নিজস্ব মহান-ঐতিহ্যের সারাংশ গুলি সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়, যদিও হিন্দু ধর্মের বিপরীতে এর প্রতিদ্বন্দ্বিগুলি সমসাময়িক শাসনকর্তাদের পৃষ্টপোষকতা এবং সমর্থন লাভ করেছিল।

CamScanner

অবশ্য এই কথা বলা যায় না যে, হিন্দুধর্মের মহান ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে একই প্রকার বা অপরিবর্তনশীল ছিল। অথবা জৈনধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই বলেও বলা যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা, এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারাও ইহা প্রভাবিত হয়েছে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজ এর হিন্দু সংস্কারকগণের কর্মতৎপরতা এবং রেনেসাঁ-যুগের আধ্যাত্মিক নেতাগণের, যথা রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমূখের আধুনিক যুগের কর্মতৎপরতাও মহান হিন্দু ঐতিহ্যের উপরে লক্ষ্যনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। আসলে কোন ঐতিহ্যই পরিবর্তনহীনভাবে অবস্থিতি বজায় রাখতে পারে না। অপরিবর্তনীয় হলে তা কাষ্ঠবত শুকিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। একই সময়ে ইহা মনে রাখা দরকার যে, ঐতিহ্যের মধ্যে পরিবর্তন সামগ্রিক হয় না, সামগ্রিক পরিবর্তনের অর্থ হবে ধ্বংস। পরিবর্তন অর্থবহ হতে হলে, তা স্বকীয় পরিচিতি বজায় রাখার প্রেক্ষিতে হতে হবে। ভারতীয় সংস্কৃতি নামে আজকাল যা পরিচিত, তা হল একটি মহান ঐতিহ্য, যা প্রধানত হিন্দুবাদ, জৈনবাদ, বৌদ্ধবাদ, ইসলাম এবং খ্রিস্টবাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জনিত প্রভাব ও সমন্বয়ের বিভিন্ন দিকের দ্বারা উৎপন্ন।

তথাপি হিন্দুবাদ স্বকীয় পরিচয় বজায় রেখেছে। হিন্দু ঐতিহ্যকে যদি একটি বাস্তব সত্য রূপে গ্রহণ করা হয়, তা এই জন্য যে, যেমন (Whitehead) হুয়াইট হেডের ভাষায়ঃ পরিবর্তনের ধারা ও সংরক্ষণের ধারা, এর মধ্যে মুদ্রাগত ছিল। Whitehead (হুয়াইটহেড) বলেনঃ এই উভয়বিধগুণ ব্যতিরেকে কোন কিছুই বাস্তবতা অর্জন করতে পারে না। সংরক্ষণ ছাড়া কেবল পরিবর্তন হল, নেতিবাচক থেকে নেতিবাচকের দিকে অতিক্রম মাত্র। ইহার পরিসমাপ্তি সামগ্রিকতায় কেবল চলমান অনস্তিত্ব প্রতীয়মান করে। পরিবর্তন ছাড়া কেবল সংরক্ষণও হয় না, কেননা পরিস্থিতি হল চলমানতায় পর্যবসিত, যাতে কোন সত্তার আত্ম-পরিচিতি কেবল পুনরাবৃত্তির তোড়ে উবে যায়।

রাধাকৃষ্ণননে চেয়ে হিন্দু ঐতিহ্যের অবস্থিতি ও পরিবর্তনের ব্যাপারে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ও উত্তম বক্তব্য কেউ রাখতে পারবে না। তিনি বলেনঃ হিন্দু-চিন্তা আমরা বিশ্বাস করি আর নাই করি, বিগত তিন হাজার

CS CamScanner

বছর ধরে বিশ্ব জগতের বন্যার স্রোত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে। ইহা বহু সাম্রাজ্য আসতে ও যেতে দেখেছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বহুব্যবস্থাকে সমৃদ্ধশীল হতে ও বিলয়প্রাপ্ত হতে লক্ষ্য করেছে, ইহা এইসব ঘটনাবলী একাধিকবার সংঘটিত হতে দেখেছে। সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ ইহাকে বিশৃঙ্খলতায় নিক্ষেপ করেছে; কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের ধারা থেকে ইহাকে বিচ্যুত করতে পারে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি বহুল পরিমাপে পরিবর্তিত হয়েছে, তথাপি বিগত তিন হাজার বছর ধরে ইহা নিজস্ব রূপে বিদ্যমান রয়েছে। নতুন বুদবুদ উত্থিত হয়, নতুন স্রোতগুলি নিজেদের ধারায় বয়ে চলে, ভূমিতে নিজেদের নব-নতুন পথ করে নেয়। কিন্তু মূখ্য বা গৌণ-এর প্রত্যকটি স্রোতধারা পরস্পর সম্বলিত হয়ে একটি মহা নদ-নদীর সৃষ্টি করে, যা ভারতীয় ভূমিকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উর্বর করে চলে।

৬.২ *হিন্দুবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না*

পাশ্চাত্য জগতে আধুনিকতার উন্মেষের পশ্চাতে রেনেসাঁ সংস্কার জ্ঞানের আলোক, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি বিভিন্ন মনোবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অবদান রয়েছে। তন্মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিকাশ রূপে প্রতিভাত হয়। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্যে বিকাশ লাভ করে, ইহা বর্তমানে একটি বিশ্বব্যাপৃত তৎপরতায় সমন্বিত হয়েছে, যা ভৌগোলিক সীমা রেখা অতিক্রম করে যায়। ধর্ম যেমন উৎপত্তি স্থান নির্বিশেষে বিশ্বজনীন হয়ে থাকে, তদনুরূপ আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। বেশ কিছু লোকের মনে প্রশ্ন জেগেছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিপ্লবকে মহান ভারতীয় ঐতিহ্য কিরূপে আত্মস্থ করতে অথবা বরদাশত করতে পারে? এ থেকে তাঁদের মনে বিস্ময় ও কৌতুহল জেগেছেও বটে। এই সমস্যাটি একটি মূল্যবোধের সংঘাতরূপে প্রতীয়মান হয়, যথা- ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ বনাম আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজাত মুল্যবোধ এর মধ্যে, যেমন আর্ল ম্যাক-কর্মাক, (Earl Mac Cormac) বলেন: যদি কেহ হিন্দুবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাতের চিন্তা করে, তবে তা হবে বিষয়বস্তু বা পদ্ধতির দিক দিয়ে। তা হবে আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য নিরূপনের ভিত্তিতে, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার, অনুভূতি-অতীত ও অনুভূতির মধ্যেকার। হিন্দুবাদ একটি দর্শন হিসাবে ও ধর্ম হিসাবে মূখ্যতঃ

আত্মা বা পুরুষ এর-জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত, যা অনুভূতি অতিক্রম করে যায় এবং এতদসঙ্গে আবার অনুভূতিকেও বহন করে। একটি দর্শন ও একটি ধর্ম হিসেবে উভয়বিদ ক্ষেত্রে আত্মা বা পুরুষ এ জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত, যা অনুভূতির ভূবন অতিক্রম করে। অনুভূতির ভূবন সঠিকভাবে ব্যবহারিক নামে পরিচিত, যা বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। অনুভূতির ভূবন সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন যে, ইহা গুরত্বহীন নয়, অকেজোও নয়; এবং হিন্দুবাদে ইহকালীনতা বা পার্থিব আগ্রহকে অবহেলা করা যায় না। সুতরাং হিন্দুবাদের দৃষ্টিতে এই উভয়বিদ ক্ষেত্রের মধ্যে বিষয়বস্তুর পার্থক্য বিদ্যমান।

যদিও হিন্দুবাদ জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস ও বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ বা স্বীকার করে, যেমন- অনুভূতি, যুক্তি ও পবিত্রগ্রন্থ; তবে ইহা মনে করে যে, আত্মা বা পুরুষকে একমাত্র পবিত্রগ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়। অনুভূতির বিষয় পবিত্র গ্রন্থের আওতাভূক্ত নয়; অনুভূতির বিষয় একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও যুক্তির মাধ্যমে জানতে হয়।

আগুন গরম ও বরফ ঠাণ্ডা, একথা বুঝবার জন্য পবিত্র গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না, কেননা ইহা অনুভূতির মাধ্যমে সহজেই জানা যায়। পবিত্র গ্রন্থ এর বিপরীতে আমাদের নতুন কোন তথ্য জানাতে বা বলতে পারে না। যেমন- শংকরাচার্য বলেন : *এমনকি একশত পবিত্র গ্রন্থের উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণ করা যাবেনা যে, আগুন ঠান্ডা অথবা যা অনুজ্জল তা গ্রহণযোগ্য নয়।*

একই প্রকারে অনুভূতি ও যুক্তি, যা আমাদেরকে কোন বস্তুর জ্ঞান প্রদান করতে পারে যেমন বৃক্ষ সম্বন্ধে, টেবিল, পাহাড়, মহাসাগর এবং গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে, যা এগুলির সাহায্যে জানা যায়, কখনও আমাদেরকে চৈতন্যের উৎস, আত্মা সম্বন্ধে, কোন জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। একমাত্র পবিত্র গ্রন্থই আত্মাকে জানতে আমাদেরকে সহায়তা করে; যদিও আত্মার জ্ঞান লাঠি বা পাথরের জ্ঞানের মত নয়।

পবিত্র গ্রন্থ কিভাবে আত্মাকে দৃশ্যমান করে, তার বিস্তারিত বিবরণের অবতারণা করা এখানে নিঃস্প্রয়োজন, যা অক্ষর ও শব্দের মাধ্যমে বিবৃতও করা যাবে না এবং মনের নিকট বোধগম্যও হবে না।

CS CamScanner

বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল, সূত্রায়ণ করা বা হাইপোথিসিস (Hypothesis) প্রতিষ্ঠা করা। এই হাইপোথসিস বা সূত্র ধরে যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, যদ্বারা পর্যবেক্ষণ উপযোগী তথ্য আহরণ করা যায় এবং এক্সপেরিমেন্ট বা ব্যবহারিক পরিক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই পর্যবেক্ষণ-উপযোগী তথ্যগুলিকে সঠিক বলে প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিজ্ঞান যে পদ্ধতি অনুসরণ করে, হিন্দুবাদ আত্মাকে জানার উদ্দেশ্যে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে, তার সাথে সংঘাতে আসে না।

এতদুভয় পদ্ধতির পার্থক্য (Thomas Aquinas) টমাস একুইনাস অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করেছেন। তিনি বলেন: *একটি বক্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করার জন্য দুইটি পন্থা অবলম্বন করা যায়। একটি হলো, বক্তব্যকে সঠিক বলে বিশ্বাস করার যুক্তি এই হতে পারে যে, ইহা পর্যবেক্ষণের দ্বারা পরীক্ষণযোগ্য। ইহাই বিজ্ঞান করে থাকে। অথবা, আমরা একটি বক্তব্য সঠিক বলে বিশ্বাস করতে পারি, যদি ইহা কোন বুদ্ধিগত স্বয়ং প্রতিভাত সূত্র থেকে নির্ণয় করা যায়।* আত্মা বা চৈতন্য হল পরম স্বয়ং প্রতিভাত সূত্র, যার মাধ্যমে অন্যান্য সূত্রগুলি ও বক্তব্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

হিন্দুবাদ পরম সত্যের সন্ধান করে, যা সমস্ত সূত্রগুলির সূত্র, যা সত্যনিষ্ঠা উৎকৃষ্টতা ও অধিবিদ্যক প্রকৃষ্টতার ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং হিন্দুদের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগতভাবে কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই, যেমন বিষয়বস্তুর ব্যাপারে কোন অসঙ্গতি প্রতীয়মান হয় না। ইহা সত্য যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি হিন্দুবাদের মহান ঐতিহ্যের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। এই নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য সৃজনশীল সত্ত্বার প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্ট সমাজের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি রূপে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সংগঠিত হতে বাধ্য। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সৃজনশীল হওয়ার জন্য মহান ঐতিহ্যের রূপরেখার অনুগামী হতে হবে। যদি খ্রিস্ট ধর্ম ইউরোপের মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি থিওলজি বা ধর্মশাস্ত্র এবং দর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সহ অবস্থান করতে সক্ষম হয় এবং নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতা অর্জন করতে পারে; (একজন সম-সাময়িক হিন্দু দার্শনিক জিজ্ঞাসা করেন) তবে কেন (ইন্ডিয়া) ভারত তাই করতে পারবে না?

CamScanner

লেখক পরিচিতি

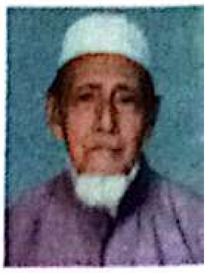

ড. মুঈন উদ্দীন আহমাদ খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রথম মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অ ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি) এর প্রতিষ্ঠাত সদস্য এবং সাউদার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এ প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাউদার্ণ বিশ্ববিদ্যাল সামাজিক বিজ্ঞান, কলা ও আইন অনুষদের ডী এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রধান হিসে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বিআইআইটি' সিনিয়র একাডেমিক ফেলো হিসেবে গবেষণাক যুক্ত ছিলেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন তার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছে- Origir and Development of Experimental Science A Challenging Encounter With The West (2020); Islamic Revivalism: During the 18th 19th & amp; 20th Centuries (C.E)- In North frica, Saudi Arabia, Pakistan, India anc Bangladesh (2010); Muslim Struggle fo Freedom in Bengal (1960), Islam in Bangla-desh through Ages (1995), Memories of a Lacerated Heart: A War Memoir From Eas Pakistan to Bangladesh (1971), Muslin Communities is Southeast Asia (1980 Titumir and His Followers in British India Records (1980), The Great Revolt of 1867 i India and the Muslims of Bengal (1983 History of the Faraidi Movement (1984 Social History of the Muslim of Banglades (1992), ফরায়েজী আন্দোলন (১৯৮০), ইসলা দর্শন চিন্তার পটভূমি (১৯৮০)।

CamScanner

গ্রন্থ পরিচিতি

খ্রিস্টধর্মের প্রচারকগণ মূলতঃ 'স্রষ্টার নিদর্শন (Aayatullah)' বুঝাতে ইংরেজি শব্দ 'সায়েন্স (বিজ্ঞান)' এর প্রচলন শুরু করেন। কবি ও ধর্মপ্রচারকগণ ১৩৪০ সাল থেকে এই শব্দটিকে 'স্রষ্টার বিজ্ঞান (Science of God)' অর্থে ব্যবহার করতে থাকেন; যেমন, শেক্সপিয়ার 'প্রকৃতির রহস্য' তথা 'সৃষ্টির রহস্য' হিসেবে শব্দটিকে ব্যবহার করেন। বর্তমানে ব্যবহৃত 'পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental Science)' ১৮৩০ সাল পর্যন্ত 'প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy)' হিসেবে অভিহিত ছিলো। ল্যাটিন 'Scientiis কিংবা Scientiae experimentalis' শব্দদ্বয় যদিও প্রকৃতঅর্থে 'পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান' কে-ই বুঝায়, তবুও ইউরোপিয়ান স্কলারগণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ভয়ে এই পরিভাষাগুলো ব্যবহারে বিরত থাকেন। এতদ্বসত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে গ্রীকদের উদ্ভাবিত 'প্রাকৃতিক দর্শন (Natural Philosophy)' পরিভাষাটি 'পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental Science)' পরিভাষায় প্রতিস্থাপিত হয়। অর্থাৎ, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান বলতে বাস্তবিকভাবে *আল 'উলুম আল তাজরিবীয়াহ'* এবং 'Scientiae experimentalis' কে-ই নির্দেশ করে।

আরবী শব্দ *ইল্ম* হলো *উলুম* এর বহুবচন- যা বিজ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনেই সর্বপ্রথম *'ইলম'* শব্দটির ব্যবহার হয় যা বর্তমানে শিখন (learning) হিসেবে বহুল পরিচিত। নবী মুহাম্মদ (সা.) এ পরিভাষাটিকে সুবিন্যস্তরূপে সজ্জিত করেন এবং প্রাথমিক যুগের মুসলিম স্কলারদের লেখনীর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এটি 'বিজ্ঞান' অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জাবির ইবন হাইয়ান- যিনি রসায়ন বা আলকেমী'র জনক, তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূলভিত্তি হিসেবে *'তাজরীব'* কে নির্ধারণ করেন যা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি হিসেবে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীতে নবম শতাব্দীতে আল-খাওয়ারিজমী বীজগণিত-পাটিগণিত উদ্ভাবন করেন এবং আল্-কিন্দী এটিকে চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার গবেষনার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করেন।

সবশেষে, আল-ফারাবী, ইবন সিনা, ইবন হাইথাম ও আল-বিরুনী *'আল-উলুম আল-তাজরিবীয়াহ'*-কে অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে যান- যার ফলে বারো শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পাশ্চাত্যের স্কলারগণও মুসলিম মনিষীদের গবেষনাকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন।

সুতরাং বিজ্ঞান গ্রীক কিংবা রোমান কিংবা হেলেনিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত ছিলো না, বরং এটি মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন, নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং ক্লাসিকেল মুসলিম চিন্তাবিদদের একটি বিস্ময়কর উপহার।

Academia Publishing House Ltd.

ISBN 978-984-35-0770-9

9 789843 507709